

মা
সি
ক
প
ত্রি
কা

ত্রিবিংশতি
বর্ষ



শা
র
দী
য়া
সং
খ্যা

১৪০১

আজ

সম্পাদিকা—রেখা চট্টোপাধ্যায়

ফাটা ছাদ ?
জল পাড়ে ?
ফাটা ছাদের সমস্যায় হতাশ ?

মূল্যবান পরামর্শ ও দশ বৎসরের গ্যারান্টিসহ

ঘেরামতের জন্য যোগাযোগ করুন :—



কুমার ব্রাদার্স এণ্ড কোং

২, চার্চ লেন, কলিকাতা-৭০০ ০০১

ফোন : ২৪৮-৮৫৫৫



আবার এসেছে শারদীয়া পূজার সময়। প্রতি বছরের মত এবারও সকলে আনন্দে মেতে উঠেছেন। পাড়ার পাড়ার মণ্ডপ সাজানোর নতুন নতুন পরিকল্পনা চলেছে। পাড়ার চাঁদা আদায়ের নামে নানা ধরনের প্রচেষ্টা এবং কোথাও বা অত্যাচারের ছবি প্রতি বছরের মত এবারও চলেছে। যারা স্ব-ইচ্ছায় চাঁদা দেন তাদের কথা বাদ দিলে জোর করে সামর্থ্যের অতিরিক্ত চাঁদা যে কোন প্রকারে আদায়ের প্রচেষ্টা অব্যাহত। পুলিশি আশ্বাস ও নিরপেক্ষ মানুষকে রক্ষা করার কথা ঘোষণা হলেও সব সময় তা কার্যকর হয় না। তাই পূজার আনন্দের সঙ্গে জড়িয়ে থাকে কিছুটা আতঙ্ক, কিছুটা ভয়। এবার আবার সমগ্র দেশ জুড়ে প্লেগের আতঙ্ক। অনেকে ঘরবাড়ী ছেড়ে অন্ত্র চলে যাচ্ছেন। যারা দেশ ভ্রমণের আয়োজন করেছেন তারাও শঙ্কিত। মহামারীর কাছে প্রার্থনা তিনি যেন সমস্ত রকম দুর্ঘটনার হাত থেকে মানুষকে রক্ষা করেন। তাঁর আগমনে যেন মানুষ নিশ্চিন্ত ভাবে আনন্দে কটা দিন কাটাতে পারেন।

আজ পত্রিকার অগতম স্মৃতি ও শুভামুখ্যায়ী ডঃ হরপ্রসাদ মিত্রের প্রস্থানে আমরা সকলেই মর্মাহত। সেই সঙ্গে বন্ধুবর রমেন মল্লিকের কথাও মনে পড়ছে। তাঁদের অভাব কোনদিনই পূর্ণ হবে না।

এবার যে সব লেখক, লেখিকা ও বিজ্ঞাপন দাতারা স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করেছেন তাঁদের অকুণ্ঠভাবে কৃতজ্ঞতা জানাই।

পরিশেষে সকলকে ৬বিজয়ার যথাযোগ্য প্রীতি ভালবাসা ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।



কবি ও সাহিত্যিক শোভনা সেন
স্মরণ—

সাব ভবন্তু সঙ্গলময়

সার্ব সন্তু নিরাশ্রয় ॥

M/s. A. K. SEN & CO.

M/s. I. T. T. PVT. LTD.

M/s. ALLIED CHROMES &

CHEMICALS PVT. LTD.

M/s. ANALYTIQUE

ভদ্রায়ের পূজায় আরদ অভিনন্দন

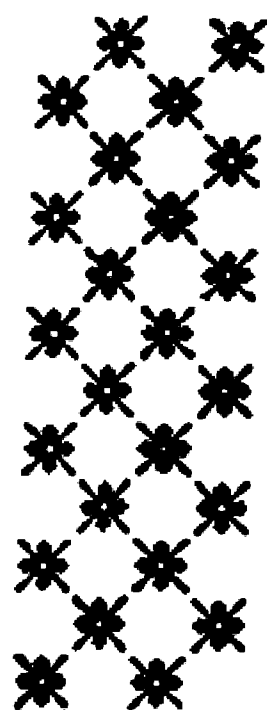


শতরূপা

(আধুনিক ডিজাইনের তাঁতের শাড়ী ও ধুতি বিক্রেতা)

৬২/৪, সূর্য্য সেন স্ট্রীট, (ইঞ্জিয়া হোটেলের নীচের তলায়)
কলিকাতা-৭০০ ০০১

*With best
Compliments of*



SUNNY INDUSTRIES PRIVATE LIMITED

13N, DHIRENDRA NATH GHOSH ROAD,

CALCUTTA-700 025

With best compliments from :



S. K. HAZRA & CO. PVT. LTD.

Manufacturers of :

S. K. H. Pumps, Submercible Pumps & Motors

167, NETAJI SUBHAS ROAD,

CALCUTTA-700 001

With best compliments from :-



FLOW MORE CORPORATION

C. M. C. AUTHORISED
SANITARY ENGINEERS & CONTRACTORS

87/12/12A, RAJA S. C. MULLICK ROAD,
CALCUTTA-700 047

Phone : 72-2409

With best compliments of :



THE CITY EXCHANGE HOUSE

6, BRABOURNE ROAD, CALCUTTA-700 001

PHONES : 26-3029 / 26-0915



With compliments from :

BENGAL TAXI SERVICE

15, LOWER RANGE (GR. FLOOR)

CALCUTTA-700 017

PHONE : 40-2134

OFFICE HOURS : 8 A.M To 9-30 P.M.

SK. KALIM

A/C. AMBASSADAR	}	ON CAR HIRE
NON A/C. AMBASSADAR		
A/C. CONTESSA		

With best compliments from :



WELL WISHER

*With best
Compliments of*



B. E. PUMPS PRIVATE LIMITED

**4, B. B. D. BAG, EAST
CALCUTTA-700 001**

**Grams :
BHOWMKAL**

**Telex :
021-2426**

**Fax :
248-4862**

**Phones :
248/7746/7747/7837/8714**



With best compliments from :

SELVEL

THE RIGHT choice FOR OUTDOOR ADVERTISING

'SELVEL HOUSE'
10/1B, Diamond Harbour Road
CALCUTTA-700 027.

Phones : 479-7075, 479-6795, 479-9734
479-5342, 479-9492

FAX NO. 4795365
TELEX NO. 0218107

710, Meghdoot
94, Nehru Place
NEW DELHI-110 019

Phones : 643-1853 & 643-1369

FAX NO. 0116463776
TELEX NO. 03171308

BRANCHES ALL OVER INDIA

With best compliments of

A well wisher



With best compliments from :

Phone : 48-4004

KAMAL OPTICAL

General Ophthalmic Services & Sight Testing by Highly Qualified
and Experienced Eye-Specialists.

114A, ASHUTOSH MUKHERJEE ROAD, 1st Floor, CALCUTTA-25

EYE SPECIALISTS :

Dr. M. K. GHOSE, M.B.B.S., D.B.M.S., D.H.S.,
D.O., M.D., M.S., (OPHTH),
5 to 6 p.m.—Mon, Wed, Friday.

Dr. (Mrs) M. SENGUPTA, M.B.B.S., D.O.,
Daily—6-30 p.m. to 8-30 p.m.
Morning—11 a.m. to 12 noon
Mon. Wed. Friday.

Dr. S. C. BOSE, D.O.G.S.
Refractionist & Ophthalmist
Tues Thurs & Saturday 5 to 6 p.m.

With best compliments of

A. SIRKAR

JEWELLERS

THE FUTURE OF GOLD

A SIRKAR & CO. (Jewellers) PVT. LTD.

Son & Grandson of Late M. B. Sirkar

171/1A & 171/1/1A, R. B. AVENUE,
Calcutta-700 019

Phone : 440-5821/6258/7948

Fax : 91-33-440-5772

কবি ও প্রাবন্ধিক ডঃ হরপ্রসাদ মিত্রের গ্রন্থাকারে প্রকাশিত রচনাবলী

কাব্য গ্রন্থ :—

চলার গান (১৯৩৩) ; চন্দ্রমল্লিকা (১৯৩৫) ; চুনি পান্নার কান্না (১৯৩৬) ; পৌত্তলিক (১৯৪১) ;
ভ্রমণ (১৯৪৩) ; তিমিরাভিসার (১৯৫৪) ; সাম্প্রতিক স্বনির্বাচিত কবিতা (১৯৫৯) ; আশ্বিনের ফেরিওয়ালা
(১৯৬৩) ; সাঁকো থেকে দেখা (১৯৬৮) ; ঝাউয়ের শব্দ (১৯৭৩) ; হৃদয়ে চকিত কে সে (১৯৭৪) ;
ইদানিং আমি (১৯৮০) ; যা আছে যা নেই (১৯৮৪) ; ছবি ফিরে দেখা (১৯৮৪) ; ইয়াক (১৯৮৮) ; কুশী
কবিতা (অনুবাদ, ১৯৭৪) ; প্রেমকে, মৃত্যুকে চিনে (১৯৯৩) ; ইত্যাদি।

প্রবন্ধ গ্রন্থ :—

সাহিত্য-পরিচয় (১৯৪৬) ; বাংলা কাব্যে প্রাক-রবীন্দ্র (১৯৪৮ ; দ্বিতীয় পরিমার্জিত সংস্করণ
১৯৮১) ; সাহিত্য পাঠকের ডায়রী ১ম খণ্ড (১৯৫১) ; সাহিত্য পাঠকের ডায়রী ২য় খণ্ড (১৯৫৩) ;
সাহিত্যের নানা কথা (১৯৬৩ ; দ্বিতীয় পরিমার্জিত পরিবর্ধিত সংস্করণ ১৩৯০) ; সাহিত্য বিচিন্তা
(১৯৬১) ; তারা শব্দর (১৯৬১) ; কবিতার বিচিত্র কথা (১৯৬১ ; দ্বিতীয় পরিমার্জিত সংস্করণ ১৯৬৪)
রবীন্দ্র-সাহিত্য পাঠ (১৯৬৩) ; বক্তব্য সাহিত্য পাঠ (১৯৬৩) ; সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কবিতা ও কাব্যরূপ
১৩৬১ ; দ্বিতীয় সংস্করণ ১৩৬৬ ; তৃতীয় সংস্করণ ১৯৬৪) ; বিবেকানন্দের সাহিত্য ও সমাজ চিন্তা
(১৯৬৮) ; দেবতার দীপ হস্তে যে আসিল ভবে (১ম খণ্ড ১৯৭৯ ; ২য় খণ্ড ১৯৮১) ইত্যাদি।

সম্পাদিত গ্রন্থ (দীর্ঘ ভূমিকা সহ) :—

- ১। কিরণধন চট্টোপাধ্যায়ের নতুন খাতা ও অন্ত্যস্ত কবিতা (১৯৫২)।
- ২। সেক্সপীয়ার রচনাবলী (বঙ্গানুবাদ : পর পর ৩ খণ্ড ১৯৭৪-৭৬)।
- ৩। মোনাসাঁ রচনাবলী (বঙ্গানুবাদ : ১৯৭৫)।
- ৪। জোলা রচনাবলী (বঙ্গানুবাদ : ১৯৭৫)।
- ৫। টলস্টয় রচনাবলী (বঙ্গানুবাদ : ১৯৭৪)।
- ৬। শব্দ-চর্চা (১৯৭৪)।
- ৭। রবীন্দ্র-চর্চা (১৯৬৯) ইত্যাদি।

পুঁজিপত্র

শারদীয়া ১৪০১ (ইং ১৯৯৪)

মাতৃরূপেণ সংস্থিনি—দিব্যেন্দু হালদার

প্রবন্ধ

কল্পতরু শ্রীরামকৃষ্ণ—ব্রহ্মচারী অনিরুদ্ধ চৈতন্য

P 29184

...

৮৫

বন্দে মহামাতৃকাম—ডাঃ বিপিন বন্দ্যোপাধ্যায়

...

৮৯

প্রসঙ্গ : সঙ্গীত ভঙ্গ—রঞ্জিত কুমার সেন

...

৯২

কবি বঙ্কিমচন্দ্র—বসুমিত্র মজুমদার

...

১০৭

স্বামী-শিষ্য সংবাদ—সন্তোষ কুমার দে

....

১২১

গ্রাম্য জীবনে সিনেমার প্রভাব—সুনীল কুমার দে

...

১২৩

বিজ্ঞান ও সভ্যতার অবদান—মণিকা ঘোষাল

...

১৩৬

যত্র নার্যস্ত পুণ্যস্তে—কৌশিক ভট্টাচার্য্য

...

১৯৮

রম্যরচনা

মডার্ন যুগের কড়চা—হরিপদ নন্দী

...

১৩৯

উপন্যাস

'মা'—জগন্নাথ মিশ্র

....

১৪৫

গল্প

চিকাপ্রাণ—বেতুইন

...

৯৮

যেতে যেতে ফিরে চাই—চিত্রিতা দেবী

...

১০১

নিশ্চিন্ত—কুমারেশ ঘোষ

...

১১৪

তিনটি টিল ও ভালবাসা—এ. মাম্বাক

...

১১৭

চার বন্ধু—ডাঃ রামচন্দ্র গুপ্ত

...

১২৭

স্মৃতি ভর্ণন—সুনীল কুমার মণ্ডল

...

১৩০

বি. বি. কেন্দ্র—ঋতা বন্দ্যোপাধ্যায়

...

১৮৫



কি জানি কি হয়—শৈলজা চৌধুরী	...	১৮৯
লাল জরির ঘাঘরা—অনিমা মুখোপাধ্যায়	...	১৯৩
থিয়েটার—তপতী দেবী	...	২০৮
কাব্য		
অর্জুন ও উলুপী—কালীশঙ্কর মল্লিক		১৪২
কবিতা		
আমার ভারত জাগ্রত—রমা গুপ্ত		৯১
ভবিতব্য—নিখিল ঘোষ	...	৯৬
আমার মায়ের মিষ্টি মুখে—নচিকেতা ভরদ্বাজ	...	৯৭
শ্রীমা সঙ্গীত—গৌর গোপাল পাল		১০০
সভাতার পরিহাস—সুখাংশু ঘোষ	...	১১৩
পরিমণ্ডল—শচীন দত্ত	...	১০৫
বিশ্রাম—হরিচরণ দাস	...	১৩৮
ক্রাচ্—ব্রেটোন্ট ব্রেখট—অনুবাদ : দিগন্তর দাশগুপ্ত		১৮৪
অপূর্ণতা—রমেন্দ্র নাথ মল্লিক		১৮৮
Life and Death—A. K. Sen		২০৩
Smile—A. K. Sen	...	২০৪
পদধ্বনী—এ. কে. সেন	...	২০৫
বইমেলা শেষ—অমলেন্দু ঘোষ	...	২১৩
গ্রন্থ সমালোচনা—দিগন্তর দাশগুপ্ত	...	২১২

সম্পাদিকা : রেখা চট্টোপাধ্যায়

সহযোগী সম্পাদক : ডাঃ গোবিন্দ দাস চট্টোপাধ্যায়

মুদ্রণ : কৃষ্ণা আর্ট প্রেস

প্রচার সম্পাদক : জ্যোতির্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রাপ্তিস্থান : আভা কার্যালয়—৭৩সি, শরৎ বসু রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬। ফোন : ৪৭৫-৮১৭২

মূল্য—১২ টাকা



॥ মাতৃরূপেত সংস্থিতি ॥

শারদীয়ে শারদে ! শস্বরাসুরনিহিতে ! ।
 যুগেজ্ঞ-সংস্থিতে ! শানিতাজ্ঞশাসিতে ! ।
 মস্ত-মহিষ-মদির্নি ! মহামায়া রূপিনি ! ।
 মঙ্গল-কারিনি ! মহামেধ ধারিনি ! ॥

ভূগী-ভূমিতানি ! ভূধোগজয়িনি ! ।
 ভূমদনাশিনি ! দমুজ-দলনি ! ॥
 সস্তাপহারিনি ! সাধুনাদায়িনি ! ।
 সৃষ্টি-স্থিতিলায়িনি ! শুভাশীষ অর্পিনি ! ॥

সর্বসিদ্ধকারিনি ! সতী-সাধবী-ধারিনি ! ।
শ্রুতমা-প্রসারিনি ! সত্যসংস্থিনি ! ॥
করাল-বদনিকালি ! কোলিকি কোমারি । কুমারীবলি ।
মহামারালংকরি ! কৈলাস স্তম্বরী ! ॥

দশভুজাপ্রসারিনি ! দারুণা-দাক্ষিণি ! ।
মহাবিন্ধ্যা বিধারিনি ! দণ্ডকালিকারিনি ! ॥
বামে বানি ! সরস্বতি ! দক্ষিণে লক্ষ্মীবতি ! ।
নিরিত্যাক্ষ-গজানন ! মন্থরস্থিত-কার্ত্তিকসেনা ! ॥

বাসাবৃত্তবিনায়ক বামে ! বীরেন্দ্রবিহারিনি উমে ! ।
ত্রিশূলবিষ্ণুমহেশ্বর জাতে ! ভেজময়ি জগজ্জননীসহিতো ! ॥
সদৈব তুমসি মহাজননী ! মাতৃরূপেণ-সংস্থিনি ! ।
গৃহাণাপ্ত-অশ্বাকম-পূজাপাড়া-অর্থ্যম ! ॥

দিব্যানু হালদার

ত্রয়োবিংশতি বর্ষ

পঞ্চম, ষষ্ঠ 3
সপ্তম সংখ্যা



শ্রাবণ, ভাদ্র 3
আশ্বিন ১৪০১

June, July &
August 1994

তমসো মা জ্যোতির্গময়ম

॥ কল্পতরু শ্রীরামকৃষ্ণ ॥

ব্রহ্মচারী অনিরুদ্ধচন্দ্রনা

কল্পতরু শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনেতিহাসে ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারী একটি বিশেষ তাৎপর্য-পূর্ণ দিন। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ তখন অসুস্থ অবস্থায় পুণাভূমি কাশীপুর উত্তানবাটিতে অবস্থান করতেন। লীলাময় শ্রীরামকৃষ্ণের অন্ত্যলীলার ১ম পর্ব সমাপন হতে চলেছে। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের দিব্যভাবধন মূর্তি দিনে দিনে আরো পরিস্ফুট হয়ে উঠছে। কৃপাময় শ্রীরামকৃষ্ণের করুণামাখা হৃদয় ভক্তদের জন্য উদ্বেলিত হচ্ছে—প্রেমানন্দে পুলকিত হচ্ছে তাঁর মুখমণ্ডল। অথচ তাঁর রোহিণী রোগাক্রান্ত শরীর; সে অসুখে তাঁর কোনো ভ্রক্ষেপ নেই। তিনি ভক্তদের ব্যাথায় সমব্যাখী হয়ে উঠছেন। তাঁর জীবের প্রতি দয়াভাব ক্রমশই নিবিড়তর হয়ে উঠছে। কৃপাসিন্ধু শ্রীরামকৃষ্ণের দৃষ্টি থেকে যেন কৃপাধারা অঝরে ঝড়ে পড়ছে। ভক্তেরা তাঁর দূরারোগ্য ব্যাধির জন্য চিন্তিত সদাই; আর সদানন্দময় প্রভু ভক্তানুকম্পার জন্য বাস্তব। কি ক’রে ভক্তদের চৈতন্য লাভ হয়—এই যেন তাঁর অভিপ্সা।

অপরাহ্ন ৪ ঘটিকা। প্রেমময় প্রভু শ্রীরামকৃষ্ণ প্রেমবারি সিক্ত করতে দৃঢ় পদে উত্তান পথ মধ্যে নেমে এলেন। উত্তানে উপবিষ্ট ভক্তরা শ্রীপ্রভুর সহসা আগমনে চিন্তিত! বুঝিবা, কৃপাকর শ্রীপ্রভু কৃপাবিতরণার্থে আসলেন! দর্শন মাত্র কৃপাকান্ধী ভক্তরা তাঁর শ্রীচরণ কমলে কৃপাভিক্ষার্থে লুটিয়ে পড়লো। ভক্তমধ্যে শ্রীপ্রভু চিহ্নিত ভক্তভৈরব গিরীশচন্দ্র ঘোষ ও তথায় উপস্থিত ছিলেন। আর অমনি শ্রীশ্রীঠাকুরের ভাব-বিহ্বল দৃষ্টি পড়লো তাঁর উপর; এবং প্রভু শ্রীরামকৃষ্ণ হঠাৎ দণ্ডায়মান গিরীশকে নির্দিষ্ট ক’রে দৃঢ়কণ্ঠে বলে উঠলেন: “গিরীশ তুমি যে সকলকে আমার সহস্কে (অবতারজ) ব’লে বেড়াও, তুমি আমার সহস্কে কি দেখেছ, কি বুঝেছ?” ভক্তি-আপ্নুত চিন্তে গিরীশ নতজানু হয়ে শ্রীচরণতলে বসে পড়লেন এবং করজোড়ে ভাবাবেগ ভরে কনুকে গদগদ স্বরে ব’লে উঠলেন; “বাস, বান্ধিকী যাঁর ইয়ত্তা করতে পারেন নি, আমি তাঁকে কি

ক'রে বর্ণনা করবো।” ভক্তভূষণ শ্রীপ্রভু গিরীশের অচলা-ভক্তিতে আগ্রুত হয়ে ভক্তগণকে বললেন, “তোমাদের কি আর বলিব—আশীর্বাদ করি, ‘তোমাদের চৈতন্য হোক’।” ভক্তেরা শ্রীপ্রভুর শুভাশিসে পরিতুষ্ট হয়ে একে একে ত্রিপাদ-পদে প্রণাম করতে লাগলো। শ্রীশ্রীঠাকুর অমনি তাদের একে একে স্পর্শ ক'রে চৈতন্য ক'রে দিলেন। তখন তারা দিব্যানন্দে মাতালের মতো হয়ে সর্বত্র শ্রীরামকৃষ্ণময়-রূপ দেখতে লাগলো এবং তাদের হৃদয়ে এক অসীম অপার প্রেমানন্দের উদ্ভেক হলো। ক্ষণেকের সে আনন্দ নয়, সে এক অনির্বচনীয় আনন্দ এবং সেই সঙ্গে অপরূপ দিব্যদর্শন। তিন দিন ধরে চললো সেই দিব্যভাবাবেগের উন্মাদনা। সে এক অচিস্তনীয়, অত্যাশ্চর্য, আধ্যাত্মিক ভাব-প্রাবনের নবচেতনা। অপরিকল্পনীয় সে ঐশ্বরিক পুলক, যার না অনুভব হয়েছে তার কাছে সে আনন্দ অবাঙমনোসোগোচরম্।

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ সেদিন ‘কল্লতরু’ হয়ে ভক্তমনোবাহুপূর্ণ করেছিলেন। কল্লতরুর কাছে যা চাওয়া যায় তা-ই নাকি পাওয়া যায়। কিন্তু মানুষ তাঁর কাছে কি চাইবে! তিনি (শ্রীরামকৃষ্ণ) তো কাম-কাঞ্চনাদি সর্বভাগী সন্ন্যাসী! আর মানুষেরই বা চাওয়ার কি আছে! এখন জানা দরকার মানুষের জীবনের উদ্দেশ্য কি? কারণ মানুষের উদ্দেশ্যের সঙ্গে তো চাওয়া-পাওয়া ষানিকটা নির্ভর করে। শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন, ‘মানুষের জীবনের উদ্দেশ্য ঈশ্বর লাভ’। সুতরাং মানুষের যদি ভগবানের কাছে কিন্তু চাওয়ার সুষোগ হয়ে থাকে, তাহলে অবশ্যই চাওয়া উচিত তাঁকে (ঈশ্বরকে)। ঈশ্বরই কল্লতরু এবং তাঁর সাক্ষাতে তাঁকেই চাওয়া এই সৌভাগ্য বা সদ্‌বুদ্ধি সকলের হয় না। ‘কশ্চিদ্‌ যততি সিদ্ধয়ে’। পুণ্যাত্মারাই কেবলমাত্র এই মহৎ-জ্ঞানের অধিকারী হন এবং এই সুষোগ পেয়ে থাকেন। এখানে কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে কাউকে চাইতে হয়নি। তিনি অযাচিতভাবেই তাঁর কৃপাবারি সিঞ্চন করলেন। এই প্রসঙ্গে পাশ্চাত্য দার্শনিক মনীষী ম্যাক্স মুলার কতৃক সংকলিত ‘শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী’তে বলা হয়েছে, “কল্লতরুর নিচে বসে একজনের ইচ্ছে হ’ল রাজা হই, অমনি সে রাজা হ’ল। পরমুহূর্তে ইচ্ছে হ’ল, যেন সুন্দরী স্ত্রী পাই, সঙ্গে সঙ্গে তাই পেল। তারপর তার মনে হ’ল যদি বাঘ এসে তাকে খেয়ে ফেলে, অমনি বাঘ এসে খেয়ে ফেললে। ভগবান সেই রকম কল্লতরু। যে তাঁর সামনে নিজেকে অভাগা বা গরিবভাবে সে সেই রকম থাকে। কিন্তু যে ভাবে ও বিশ্বাস করে ভগবান তাঁর ইচ্ছা পূর্ণ করবেন, তাঁর ইচ্ছাও সত্যি সত্যি পূর্ণ হয়।” তাঁর কাছে চাইতে হয় না। তাঁর স্মরণাপন্ন হলে, তিনি না চাইতে প্রদান ক’রে থাকেন। তাই অপর ককণাসাগর শ্রীরামকৃষ্ণ অন্তরঙ্গ-বহিরঙ্গ, জ্ঞানী-অজ্ঞানী, শিষ্য, ভক্ত নির্বিচারেই সকলকে তাঁর কৃপাশিস্‌ বিতরণ করলেন—‘তোমাদের চৈতন্য হোক’। আশ্চর্য! সেই সময় কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের গুটিকয়েক গৃহী-ভক্ত ছাড়া কোনো ভাগী-সন্তানই কাছাকাছি ছিলেন না। তাঁর সন্ন্যাসী সন্তানরা তখন তপস্‌ভাৱে ক্রান্ত হয়ে বিশ্রামরত এবং শ্রীরামকৃষ্ণও যেন নাটকীয়ভাবে আলাদা ক’রে গৃহীভক্তদের চৈতন্য ক’রে দিলেন। বলা বাহুল্য, তিনি ইতিপূর্বেই তাঁর অন্তরঙ্গ ভাগী-পার্বদদের চৈতন্য প্রদান করেছিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবনীকার স্বামী সারদানন্দজীর স্মৃতি থেকে জানা যায় যে, “কল্লতরু

হওয়ার সময় ছাড়াও ঠাকুর অনেক সময়ে অনেকের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেছিলেন। ঐক্লপ একদিন আমি কাছে দাঁড়িয়ে আছি দেখে ঠাকুর বললেন, কিরে, তুই যে কিছু চাইলি না ?' সে সময় আমি তাঁকে বলেছিলাম, 'কি আর চাইব ? আমি যেন সর্বভূতে ব্রহ্মদর্শন করি—এই ক'রে দিন।' উত্তরে ঠাকুর বলেছিলেন, 'ও যে শেষকালের কথা রে।' আমি বললাম, 'তা আমি জানি না, মশায় !' তখন ঠাকুর বললেন, 'তা তোর হবে।'.....তিনি যা বলেছিলেন, এখন তাঁর কৃপায় সেটা বেশ অনুভব করছি।" (শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তমালিকা : ১ম ভাগ, পৃ: ৩০৬) আবার অনুসন্ধান জানা যায়, শ্রীরামকৃষ্ণ ঠিক এই ঘটনার (কল্লতরু) কয়েকদিন পরে স্বামিজী তথা নরেন্দ্রনাথের মনের সংশয় নিবারণার্থে বলেছিলেন, "এই ঘাখ ! যেই রাম, যেই কৃষ্ণ, সেই একাধারে রামকৃষ্ণ"।—স্বামীজী তাঁর এই বিশ্বপ্রেমময়রূপ দর্শন করেছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর ভাগী-পার্সদদের দর্শন দিয়ে, স্পর্শ ক'রে, নানাভাবে প্রেমময়রূপ প্রদর্শন করিয়েছিলেন এবং তাঁদের চৈতন্য ও সমাধিস্থ করেছিলেন। বোধ করি, সেইজন্যই ভক্তবাঞ্ছা কল্লতরু শ্রীরামকৃষ্ণ এইভাবে আলাদা ক'রে উত্তান-মঞ্চ যেন লীলা-অভিনয়ের মাধ্যমে অবশিষ্ট গৃহীভক্তদের চৈতন্য প্রদান করলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীসারদাদেবী ও শ্রীবিবেকানন্দ এঁরা অভিন্ন ; এবং তাঁরা পরস্পরের লীলা পরিপূরক। মানুষের মুক্তির জন্ত, জগতবাসীর কল্যাণের জন্ত তাঁদের এই মনুষ্য জীবন ধারণ করা ; যেন তিনজনে একই সস্তায় বৃক্ষ, ফুল ও ফল-রূপে উদ্ভাসিত হয়েছিলেন এবং একই ছিল তাঁদের উদ্দেশ্য। স্বভাবতঃই তাঁদের একজনের কথা প্রসঙ্গে অপরজনের কথা এসে যায়। কল্লতরু শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে যে ভক্তিরূপ মহাবৃক্ষের প্রকাশ হয়েছিল তা থেকে আমরা শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীকে কর্মরূপ একটি প্রস্ফুটিত কুসুম হিসাবে পেয়ে থাকি। বৃক্ষ ও ফুল একই সস্তায় গঠিত এবং তারা অভেদ। শ্রীশ্রীমা ও এই অভেদাত্ম বোধ ক'রে বলছেন : 'যেই ঠাকুর সেই আমি।' আবার শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন : "ও সারদা—স্বরস্বতী ; জ্ঞান দিতে এসেছে। ও জ্ঞানদায়িনী ! মহাবুদ্ধিমতী। ও কি যে-সে। ও আমার শক্তি।" কর্ম-পুষ্পরূপ সারদাদেবী শ্রীরামকৃষ্ণের অনু-বর্তিনী ; এবং তিনি ঠিক একইভাবে কল্লতরু শ্রীরামকৃষ্ণ মহাবৃক্ষের পত্রছায়ায় লালিত-পালিত হয়ে তাঁর সন্তানদের অকাতরে স্নেহশিসু সম্প্রদান করলেন। শ্রীশ্রীমা যেন স্বীয়গুরু শ্রীরামকৃষ্ণোক্ত আশীর্বাদী 'তোমাদের চৈতন্য হোক'—ঘটনাকে ভাঙ ক'রে বললেন : "আমি তাদের (সন্তানদের / ভক্তদের) মা, আমি তাদের ভালোমন্দ সবকিছুর ভার নিয়েছি। সেজন্য তাদের হবে আমি জপ করি, আর ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা ক'রে বলি যেন তাদের চৈতন্য হয়, তাদের জ্ঞানলাভ হয়। কি জানো বাবা, এই হৃৎকণ্ঠের সংসারে আর যেন না আসতে হয়, তারা মুক্তি লাভ করুক এটাই আমার প্রার্থনা।" (শ্রীশ্রীমায়ের কথা)

কল্লতরু শ্রীরামকৃষ্ণবৃক্ষের পরিচর্যা ও মাতা সারদাপুষ্পের স্নেহছায়ায় অন্তরালে যে জ্ঞান রূপ ফলটি উৎপন্ন হয়েছিল,—তিনি হলেন স্বামী বিবেকানন্দ। ফল যেমন বৃক্ষের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ,

এবং বৃক্ষও যেমন ফলকে অভিন্নত্ব বোধ করে ; ঠিক তেমনি শ্রীরামকৃষ্ণও বিবেকানন্দতে একাত্ম অনুভব করে বলেছেন : ‘তোরা (বিবেকানন্দর) তো ভারি হীনবুদ্ধি, —তুই আমি কি আলাদা’ ? আরো বলেছেন, ‘দেখছি কি এটা (নিজ শরীর দেখাইয়া) আমি, আবার এটাও (নরেন্দ্রকে দেখিয়ে) আমি’ । অনুরূপভাবে বিবেকানন্দ ও শ্রীরামকৃষ্ণ থেকে অভিন্নত্ব বোধ ক’রে লিখছেন :

“প্রভু তুমি, প্রাণসখা তুমি মোর,
কভু দেখি আমি তুমি, তুমি আমি ।
বাণী তুমি, বীণাপানি কণ্ঠে মোর,
তরঙ্গে তোমার ভেসে যায় নরনারী ॥”

জীবনশিল্পীকার শ্রীরামকৃষ্ণর হৃদয় থেকে উদ্গীত হয়েছিল, ‘নরেন লোকশিক্ষে দিবে ... ।’ তিনি আরো বলেছিলেন, ‘নরেন্দ্র বিশাল বটবৃক্ষের মতো হবে, আর তার ছায়ায় হাজার হাজার লোক আশ্রয় পাবে।’ তাই নরেন্দ্র তথা যুগনায়ক স্বামী বিবেকানন্দ জীবের কল্যাণার্থে নিজ জীবন উৎসর্গীকৃত করলেন,—শিবজ্ঞানে জীব সেবার, মহানাদর্শের মাধ্যমে। শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছিলেন, ‘নরেন্দ্র লক্ষ লক্ষ মানুষকে মুক্তি দিতে পারে।’ শ্রীরামকৃষ্ণের এই অনুপ্রেরণাদায়ী মহাতাব—সমুদ্রের তরঙ্গে অভিযাত হয়ে স্বামীজী জগৎবাসীকে মুক্তির পথ দেখালেন এবং সারাবিশ্বের মানুষকে শোনালেন মৃতসঞ্জীবনী-বাণী। আর ভবিষ্যতে যারা আসবে তাদের জন্তু রেখে গেলেন জীবনী শক্তিদায়ক অমৃতবর্ষী ‘বাণী ও রচনা’। তাই স্বামীজী তাঁর বক্তৃতার মধ্য দিয়ে মনের অভিপ্রায় ব্যক্ত ক’রে বিশ্ববাসীর জন্তু উদাও আহ্বানে জানিয়েছিলেন যে,—“আমি তোমাদের সঙ্গে রয়েছি। আমার শরীর চলে গেলেও আমার শক্তি তোমাদের সঙ্গে কাজ করবে। ... যে আমার কথা পড়বে সে শক্তি পাবে।” যা আজ সমগ্র পৃথিবীতে দৃষ্টির অন্তরাল থেকে সূক্ষ্মাতি-সূক্ষ্মভাবে মানুষের মনে অনুপ্রেরণা যুগিয়ে চলেছে।

চৈতন্যদায়ক ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ কানীপুর উত্তানবাড়ীতে তাঁর ইহলৌকিক মহালীলার পরিসমাপ্তি ঘটিয়েছিলেন ; এবং এই উত্তানবাড়ীতেই তাঁর লীলাসারাহে ভক্তদের মধ্যে পরিচিতি ঘটেছিল ‘কল্পতরু শ্রীরামকৃষ্ণরূপে, চৈতন্যময় শ্রীরামকৃষ্ণের স্নেহছায়ায় যারা এসেছিল তাদের প্রত্যেকের উপর বর্ষিত হয়েছিল তাঁর সেই অমোঘ বাণী ‘চৈতন্য হোক’। মানুষ তো চৈতন্য স্বরূপই ! শুধু আবরণ উন্মোচনের অপেক্ষায় ! মানুষকে মান-হীন করা ; এবং সেইজন্যই শ্রীরামকৃষ্ণের আগমন। স্বামীজী বলেছেন : “অহেতুকী কৃপাসিদ্ধির অপার কৃপা, পতিত পাবনের অপার দয়া—সেইজন্য আমার আশ্রয় দিয়েছেন। আমি পতিত, কিন্তু ভগবানের অপার করুণা, আমার কোন চিন্তার কারণ নাই। জয় রামকৃষ্ণ !” আজও সেই মৃদু-মন্দ কল্পতরু সমীরণ-ধারা সমান তালে তাল মিলিয়ে তাঁর সন্তান—সন্ততিদের মাধ্যমে প্রবাহিত হয়ে চলেছে ;—শুধু জীবন খেয়ায় পাল তুলে দেওয়ার অপেক্ষায়।

শ্রীরামকৃষ্ণার্চনামস্ত ।

বন্দে মহামাতৃকাম্

ডাক্তার বিপিন বন্দ্যোপাধ্যায়

পূজো কথাটার সংজ্ঞা এখন সুদূর প্রসারী। আগে ছিল ঘরোয়া পূজো। এই ঘরোয়া পূজোর ভক্তি ও শ্রদ্ধার চেয়ে বেশী প্রকাশ পেত মেনকা কন্যা উমা তথা মা দুর্গার প্রতি কন্যা সুলভ অপত্য স্নেহ ও ভালবাসা। এখন ব্যাপ্তি ঘটেছে। ঘরোয়া থেকে বারোয়ারী, বারোয়ারী থেকে সার্বজনীন। সার্বজনীন পূজো ভাগের মা। নেই কোন ঘরোয়া পরিবেশ। বাঙ্গালী প্রধানত মাতৃভক্ত। তাই নাই বা থাকল ঘরোয়া পরিবেশ, ভক্তের ভক্তির ঘটিতি না থাকলেই হল। সর্বজনের কল্যাণে, সর্বজনের মিলনে সম্মিলিত ভক্তি প্রবণতায় এই সার্বজনীন পূজো। অতীতে প্রতিমা ছাড়াই ঘটে ও পটে দুর্গা পূজো হত। তখন এত বাহ্যিক আড়ম্বর বা জাঁকজমক ছিল না। প্রতিমা পূজোতেও জলপূর্ণ ঘট স্থাপনা করে পূজো করা শাস্ত্রীয় বিধি। কেন না জলপূর্ণ ঘটই দেবীর আসল প্রতীক। দেবী দুর্গা ঘটাই প্রতিষ্ঠিত থাকেন। মার্কণ্ডেয় পুরাণে চণ্ডীর একটি শ্লোকে পরোক্ষভাবে বলা হয়েছে জলপূর্ণ ঘটই মহামায়া দেবীর পরিপূর্ণ প্রতীক। শ্লোকটি দেবতাদের স্তুতি।

“আধারভূতা জগতস্ তুম একা
মহীশ্বরূপেণ যতসুস্থিতাসি।
অপাং স্বরূপস্থিতয়া তুম এতদ্
আপামাতে কৃৎসন্ম্ অলজ্জাবীর্যে ॥”

ভাবার্থ = ওগো পরমশক্তি, তুমি একলা এই জগৎকে কোলে ধারণ করে আছ, কেন না তুমি পৃথিবীরূপ ধারণ করে রয়েছ। সলিলরূপে তুমি সমস্ত জগৎকে স্তম্ভপানে তৃপ্ত করছ। এই হচ্ছে আমাদের কল্যাণময়ী মহামায়া দেবী দুর্গার প্রকৃত স্বরূপ।

এই ধর্মীয় অনুষ্ঠানের তিনটে দিন বাঙ্গালীর কাছে অত্যাশ্চর্য রূপকথার রাজ্য। মাতৃ আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে মাতৃ চিন্তার বিভোর হয়ে সকলে অতীতকে ভোলে, জাতপাত ভোলে, নিজেদের মধ্যে রেষা-রেষি ভোলে। এই কটা দিন বাঙ্গালীর আত্মবিশ্মৃতির দিন।

পূজো ধর্মীয় অনুষ্ঠান হলেও, এখন এটা রূপান্তরিত হয়েছে সাংবাৎসরিক সাংস্কৃতিক উৎসবে। অনুদলনী মা দুর্গার আবির্ভাব বাঙ্গালীর আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতীক। পূজোর রূপান্তর ঘটায় অতীতের বহুকিছু হারিয়ে গেছে। সেই সঙ্গে নীলকণ্ঠও হারিয়ে গেছে। তার জায়গায় শোলাব

নীলকণ্ঠ সজীব হয়ে উঠেছে চালচিত্রে। এসব সম্বন্ধেও রিপুনালিনী, অসুরমর্দিনী, কৈবল্যদায়িনী, দেবী দুর্গা আজও ভক্তদের কামনা বাসনা সিদ্ধির কেন্দ্রবিন্দু। যাঁর ধ্যানে মনের চাঞ্চল্য বিদূরিত হয়, মন সমাহিত হয়, প্রাণস্পন্দন সজীব হয়ে ওঠে, সেই বরাভয়দায়িনী মা দুর্গা হয়ে ওঠেন আমাদের কাছে পারিবারিক কর্তা। আমরা তাঁর করুণাঘন রসাস্বাদনে এই কটা দিন ভুলে যাই সবকিছু।

শ্রুতি বলেছে—“রসো বৈ সঃ”। অর্থাৎ তিনি রস স্বরূপ। অনুভূতি গ্রাহ যা তাই রস। হৃদয়গত আসক্তির দ্বারা যা অনুভব যোগ্য তাই রস। স্নেহ-রসেই মাতৃভাবাসিক্ত সন্তান স্নেহ প্রবণতা অতি প্রবল। আর এই মাতৃস্নেহ প্রবণাতেই আমাদের কাছে মা দুর্গার রূপান্তর ঘটেছে নানা ভাবে। তিনি কখন মুগুমালিনী, কখন ভৈরবী, আবার কখন শ্যামা। আমাদের সাধনার ভাব ধারায় স্থান-কাল-পাত্র ভেদে সাধকের তথা ভক্তের সামর্থ্যে মহামাতৃকা তথা মহাশক্তি বিভিন্ন রূপে প্রকটিত হন।

সেই অদ্বৈত স্বরূপিনী মা (জীব ও ব্রহ্ম ভেদশূন্য), সেই ব্রহ্মময়ী মা, যিনি জীবাত্মা, তিনি অহংকে বিমর্দিত করে মোক্ষ প্রদানে স্মিত হাস্যে বলেন—“একৈবাহং জগত্যত্র ; দ্বিতীয়া কা সমাপরা।” অর্থাৎ আমি বহুরূপে সজ্জিতা, আমি জীবত্বের অহং প্রদান করি, আমি বহুত্বের মোহে মুগ্ধ করি, এবং আমিই বহুত্বকে একত্বে সংহরণ করি।

ভক্তের কল্যাণ সাধনে, জীবের প্রতি করুণা প্রদর্শনে অপকৃপের রূপ পরিগ্রহে তিনি ভক্তের কাছে নেমে আসেন। ভক্তির আতিথে, নিষ্ঠা ও একাগ্রতায়, মানুষ তাঁকে পায়। অবশ্যই এই পাওয়ার জন্য সাধকের অবিমিশ্র আত্মত্যাগ থাকা প্রয়োজন। জীব ও ব্রহ্মের, মানুষ ও মহামাতৃকার এই লীলা যুগ যুগান্তর ধরে চলছে। পুরাণ সাহিত্যে আমরা অনেকানেক শক্তির উল্লেখ দেখতে পাই। মার্কণ্ডেয় পুরাণে দেবী মাহাত্ম্যের দ্বিতীয় খণ্ডে আমাদের পূজিতা দেবী মহিষাসুরমর্দিনী রূপে বর্ণিতা।

মহাভারতের ভীষ্ম পর্বে দেখা যায় চর্যোদনের বিনাশ সাধনের সিদ্ধি কামণায় দেবী দুর্গার স্তুতি করার জন্য শ্রীকৃষ্ণ উপদেশ দিয়েছিলেন। “পরাজয়স্য শত্রুণাং দুর্গালোভো মুদ্রিয়ত।” আবার দেখা যায় অর্জুন এই বরাভয়দায়িনী দেবী দুর্গাকে কৃতাজলি পুটে ভক্তকালী চণ্ডী রূপে বন্দনা করেছিলেন।

“ভক্তকালী নমস্তভ্যঃ মহাকালী নমোস্তুতে।

চণ্ডী চণ্ডে নমস্তভ্যঃ তারিণি বরবর্ণিণি ॥”

রাবণ-বধার্থে রামচন্দ্র কর্তৃক দেবী দুর্গার আরাধনার উল্লেখ যেমন কৃতিবাস রামায়ণে পাওয়া যায়। তেমনই দেবী ভাগবতে ও কালিকা পুরাণেও পাওয়া যায়। বলা হয়েছে—

আভা / শারদীয়া সংখ্যা—৯০

“রাবণশ্য বধার্থায় রামশ্যানুগ্রহায় চ ।

অকালে ব্রাহ্মণা বোধো দেব্যাস্তস্মি কৃতঃপুৰা ॥”

এখানে লক্ষণীয় অতীতকাল হতেই সিদ্ধিলাভ কামণায় দেবী দুর্গার স্তুতি ও স্তবের প্রচলন ছিল। পরবর্তীকালে ক্রমবিকাশে মাতৃপূজা তথা শক্তি আরাধনার ধারা প্রবর্তিত হয়। যুগে যুগে যিনি আসেন, বর্ষে বর্ষে যিনি পূজিতা হন, পলে পলে যিনি যোগযুক্ত ভক্তের হৃদয়ে আবির্ভূতা হন, সেই মহামায়া শক্তিময়ী উপাসনায়, প্রার্থনায় এবং ব্যাকুলতার অগণিত ভক্তমণ্ডলী এই কদিন প্রত্যক্ষভাবে কৃপা লাভ করেন।

দশমীতে বিসর্জনের বাজনা বাজলে, মাকে বিসর্জন দিতে হবে এই কথা ভেবে অনেক ভক্তেরই চোখে অশ্রুধারা নেমে আসে। অনেকেই ভাবেন দশপ্রহরধারিণী জননীকে কেন বিসর্জন দেব? কিন্তু আমরা ভুলে যাই মায়ের মন্মথী মূর্তি বিসর্জন দেওয়া হলেও, চিন্ময়ীকৃপিনী মা সদাই আমাদের অন্তরে বিরাজিত। মা কি কখনও তাঁর সন্তানদের ছেড়ে থাকতে পারেন? তিনি সব সময়েই আমাদের অন্তরে অবস্থানে আমাদের পূজো গ্রহণে আশীর্বাদ করেন।

“আমার ভারত জাগ্রত”

রঘা গুপ্ত

আজকের যুব সমাজ আদর্শচ্যুত
বীর সন্ন্যাসী কবে এসে করবে আগ্রুত ?
বজ্রকণ্ঠে হাঁক দিয়ে ঘুম ভাঙিয়ে দাও
নেশায় বিভোর যুবকদের তুমি ডেকে নাও।
একশ বছর পালন হোল, কত না উৎসব !
সামনে যদি থাকতে তুমি করতে অনুভব !
শুধু কথাতে হয় না কার্য, মার তুমি ঘা,
ডুবে গেছে সমাজ তরী, তুফান ওঠে না।
অস্পৃশ্য মেথর চণ্ডালে তুমি বলেছিলে ‘ভাই’

আজ নিজের ভাইকে সরিয়ে রাখে দেয় নাক ঠাঁই।
ভালবাসা মনুষ্যধর্ম, জীব সেবা শিব জানে।
ভুলে গেছে তোমার বাণী, শুধু নিজেকেই জানে।
উদর পূর্তি হলেই হোল, পশুর অধম যেন
তোমার আদর্শ এমন করে হারিয়ে যাচ্ছে কেন ?
ডুবছে মানুষ, পচছে সমাজ, শুধু অবক্ষয়
বীর সন্ন্যাসী এসে দাঁড়াও, হব যে নির্ভয়
বিশ্ব ভুবন তোমার নামে হচ্ছে উদ্বেলিত
সগর্বে বল আবার, ‘আমার ভারত জাগ্রত’।

॥ প্রসঙ্গ : সঙ্গীত তত্ত্ব ॥

রঞ্জিত কুমার সেন

সৌন্দর্যতত্ত্বে সুন্দরের প্রকৃত রূপ কি এবং সঙ্গীতে ধ্বনি ও রসভাবনা এবং কাব্য, সাহিত্য ও অলঙ্কারের আন্তরযোগ কতখানি, তা যেমন উপলব্ধিসাপেক্ষ, তেমনি এই যাবতীয় বিষয় মিলিয়ে গীতশিল্পীর সঙ্গীত পরিবেশন শ্রোতার মনে কতটা রসমাধুর্য সৃষ্টি করতে পারলো, তার উপরেই মূল সঙ্গীতের মূল্যায়ণ নির্ভর করে। সম্প্রতি ভারতীয় সঙ্গীতবিদ্যারদ স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ ‘সঙ্গীতে সাহিত্য, রসভাবনা ও সুন্দর’ শীর্ষক একটি মূল্যবান গ্রন্থ প্রণয়ন করে এ সম্পর্কে বিশেষ আলোকপাত করেছেন। এতে তাত্ত্বিক, দার্শনিক ও নান্দনিক আলোচনা বিশেষ প্রাধান্য পেয়েছে। ফলে বিষয়গুলি অনুধাবন করতে আমাদের পক্ষে বিশেষ সহায়ক হয়েছে।

আলোচনা প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় যে, সঙ্গীতের যেমন ব্যাকরণ এবং দর্শন-মনোবিজ্ঞান-সাহিত্য ও ইতিহাস আছে, তেমনি আছে রসভাবের অভিব্যক্তি। প্রাচীন ভারতে সঙ্গীতের সাহিত্যকে সাধারণতঃ বলা হতো ‘পাঠ্য’। ‘পাঠ্য’ মানে ‘গেয় সাহিত্য’ বা ‘পদসাহিত্য’। ল্যাণ্ডার প্রমুখ অনেক বিশেষজ্ঞ ‘সঙ্গীতের সাহিত্য’ বলতে সঙ্গীতের ভাবপ্রকাশক ভাষা বলেছেন। অধ্যাপক রিচার্ডসের মতে ‘Word symbolizes feelings and ideas of a man’. তাই সঙ্গীতের সাহিত্য বলতে সঙ্গীতের শব্দের ও পাঠ্যের মর্মকথা—যা সঙ্গীতশিল্পীর মতো সুপ্ত থাকে, তাকে প্রকাশ করা বুঝায়। সেজন্য সঙ্গীতিক শব্দ ও শব্দের সমবায় সাহিত্যের অর্থ হলো সঙ্গীতশিল্পীর অন্তরের কথা ও অনুভূতি এবং তারই প্রকাশক ভাষা। রসসংকার সেই ভাব ও অনুভূতিকে আরও স্পষ্ট ও প্রদীপ্ত করে। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় : ‘রস সঙ্গীতের প্রাণ। তাই কথা ও সুর থাকলেও সঙ্গীতে যদি রসের সংকার না থাকে, তবে তাকে যথার্থ সঙ্গীত বলতে পারি না।’ ভারতীয় দার্শনিক ও ভাষাতত্ত্ব-বিদরা এ সম্বন্ধে বিশেষভাবে আলোচনা করেছেন। ভারতের মতে রস আটটি, যথা—শৃঙ্গার, হাস্য, করুণ, রোদ্র, বীর, ভয়ানক, বীভৎস ও অদ্ভুত। পরে শাস্ত্র, বাৎসল্য, মধুর প্রভৃতি রসের বিকাশ হয়। বৈষ্ণবশাস্ত্রে ভক্তি, ভগবান ও তাঁর লীলাকেও রস বলে। গোড়ীয় বৈষ্ণবগণ বিভিন্ন প্রকারের রসের ভাগ করেছেন। তাঁদের মতে মুখ্য রস পাঁচটি, যথা—শাস্ত্র, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর বা কান্তারস; এবং গৌণরস সাতটি : হাস্য, অদ্ভুত, বীর, করুণ প্রভৃতি। তাঁরা আনন্দকেও রস বলেন। ভারতীয় দর্শনের দৃষ্টিতে রস ও ভাবই সকল দেশের সঙ্গীতের চরমাদর্শ ও প্রাণশক্তিরূপ পরিগণিত। রবীন্দ্রনাথ সৌন্দর্য বা সুন্দরকে বলেছেন—‘Truth is Beauty’, ‘সত্যই সুন্দর ও

সৌন্দর্য।’ — হৃদয়স্থিত ভাবই রসের আকারে পরিণত হয়, আবার স্থাপত্যশিল্পের কারুসৌন্দর্যেও রূপ পায়, এবং বাইরের বিভাব, অনুভাব ও সঞ্চারী ভাবের সংযোগে কবির ও শিল্পীর হৃদয়স্থিত ভাব রসে পরিণত হয়। এর সমর্থন পাই ভরত, দণ্ডী, বামন, আনন্দবর্ধন, অভিনব গুপ্ত এবং অপরূপ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দার্শনিক ও আলঙ্কারিকদের রচনায়। রসকেই তাঁরা কাবোর প্রাণ ও আত্মা বলেছেন।

আলঙ্কারিকরা বলেন যে, ধ্বনিই কাব্য, সাহিত্যে ও সঙ্গীতে অলঙ্কার। যে বস্তু যথাযথস্থানে ও কর্মে থেকে সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে, তাকেই অলঙ্কার বলে। — বলেছেন অভিনব গুপ্ত ধ্বন্যালোকে লোচন টিকায়। আরও বলেছেন : ‘রসবৎ অলঙ্কারঃ।’ রসও একদিক থেকে বস্তুর ও ভাবের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে বলে অলঙ্কার নামে কথিত। অলঙ্কার রসের অনুসঙ্গী বা সহায়ক, অথবা বলা যায়— অলঙ্কার রসের অনুভূতিকে মূর্ত করে। ধ্বনি প্রাণবান হয় ভাষার সাহচর্যে। শব্দের অর্থ গুণালঙ্কারের অন্তর্ভুক্ত হলেও ভাষাই শব্দার্থকে মুখর ও প্রাণময় করে। অভিনব গুপ্ত এ সম্পর্কে বিশেষভাবে বিচার করেছেন। — ধ্বনি থেকে যে রসের সৃষ্টি হয়, তাকে রসধ্বনি বলে। সেই রসধ্বনির কাজ হচ্ছে কাব্যশ্রমীর সর্বশরীরকে রসে আপ্রাণত করা, আর আনন্দরসে শরীরকে পূর্ণ করা। এই আনন্দকে মুক্তির দ্বার রূপে চিন্তা করা যেতে পারে। আচার্য দণ্ডী ও কৃষাক্ ঈষৎ মতপার্থক্য থাকলেও বিভাব, অনুভাব ও সঞ্চারী—তিনটি ভাবের দ্বারা প্রভাবিত বিশেষ চিন্তাবৃত্তিকে ‘রস’ বলেছেন; আবার বিভাব ও অনুভাব দ্বারা সূচিত নির্বেদ ইত্যাদি তেত্রিশ রকম ভেদকে ভাব বলেছেন। আবার ভাব ও রস এবং ভাবের আভাসকে রসভাস ও ভাবভাস বলা হয়েছে। সাহিত্যের সহিতত্ত্ব বা সহযোগ ছাড়া সঙ্গীত সুরময়, সুবোধ্য ও প্রাণময় হয় না। মানুষের রসগ্রাহী চিত্ত বা মন যখন সংস্কৃতির আলোকে পরিপুষ্ট হয়, তখনই ‘সাহিত্য’ শব্দ বেশীরভাগ সময়ে সঙ্গীতের সঙ্গে ব্যবহৃত হতে থাকে।

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দের মতে—সঙ্গীতের স্বরসমন্বিত স্বরই কেবল তার মর্মকথার সন্ধান দেয় না, দেয় সঙ্গীতের সহচররূপে সাহিত্যও। একজ্ঞ আমরা সঙ্গীতের পরিচয় দেবার সময়ে বলি : ‘কথা ও সুর।’ অর্থাৎ—সঙ্গীতের অন্তস্থলে লুকানো যে তত্ত্ব ও বাণী—তার মর্মস্থল উন্মোচিত হয় সুর ও কথার স্বর সমাবেশ ও সাহিত্য সমাবেশের যুগ্মপ্রচেষ্টায়। একজ্ঞ এ দুটি শিব ও শক্তির সমন্বিত রূপ—যেমন সমন্বিত রূপ শব্দ ও অর্থের মিলন। আসলে সঙ্গীতের দু’টি রূপ : নাদময় ও ভাবময়। নাদ স্বরসমাবেশের রূপ, এবং ভাবময় নাদময়ে রস ও ভাবের সম্পৃক্তি। ভারতীয় সঙ্গীতে নাদময় (শব্দময়) ও ভাবময় রূপ দু’টির প্রকাশ সার্থকতার ধ্যানশ্লোক ও ধ্যান-কর্মের ভাবনা আছে। সঙ্গীতের সুন্দর সমগ্র প্রাণীর ও সমাজের ভুলের পথকে সংশোধন করে জীবনপ্রশান্তির পথকে উন্মুক্ত করে। একথা লাগার, এডম্যান, সোপেন হাওয়ার এবং হোয়াইট হেডও বিশ্বাস করেন।

বলা হয়েছে—সঙ্গীতের বা গানের সাহিত্য সাধারণতঃ ‘কথা’ নামে পরিচিত—যেমন সুর তথা রাগ ও কথা বা সাহিত্য। —রামায়ণ, মহাভারত, হরিবংশ ও অগ্নি পুরাণের যুগেও গান বা সঙ্গীত ছিল, এবং সেই গান বা সঙ্গীতকে সাধারণে প্রকাশ ও বোধগম্য করার জন্য বিচিত্র ছন্দে লীলায়িত কথা বা সাহিত্য থাকতো। রামায়ণ-মহাভারতাদির যুগ বা পৌরাণিক যুগের পূর্বে ক্লাসিকাল যুগ ; তারও পূর্বে গান্ধর্ব গানের যুগ। গান্ধর্ব গানের প্রায় সমসাময়িক বৈদিক সামগানের সময়েও গানের কথা বা সাহিত্য ছিল—যদিও সেই সব সাহিত্য মধ্যযুগের ও বর্তমান যুগের সাহিত্যের রূপ, গঠন ও প্রকাশ থেকে ছিল ভিন্ন ধরনের। মার্গ ও দেশীগান শ্রেণী দুটির অভিযাত্রির পূর্বে ‘বৈদিক’ ও ‘গান্ধর্ব গান’ শ্রেণী দুটির বিকাশ ছিল খ্রীষ্টপূর্ব সমাজে। বৈদিক গানের কিছু কিছু উপাদান পরবর্তী গান্ধর্ব গানের মধ্যে থাকলেও বৈদিক ও গান্ধর্বগানভিজ্ঞ ও গান্ধর্বশ্রেষ্ঠ নারদ, তস্কর, বিশ্বাবসু প্রভৃতি নূতন ও স্বতন্ত্র রূপ দিয়ে গান্ধর্ব গান সৃষ্টি করেছিলেন ভারতীয় সমাজে। গান্ধর্ব গানে জাতিরাগ ও গ্রামরাগগুলির সমাবেশ ছিল, আর ছিল ষড়্জ, মধ্যম ও গান্ধার—তিনগ্রামের প্রচলন। জাতিরাগ বৈদিকোক্তর গান্ধর্ব গানের বীজরাগ। জাতিরাগ থেকেই পরে সকল রাগের সৃষ্টি ও বিকাশ হয়েছিল।

‘আলঙ্কারিক ভামহ বলেছেন : ‘শব্দার্থৌ সাহিতৌ কাব্যম্’, অর্থাৎ—‘সাহিত্য’ শব্দ বিশেষ ভাবে সৌন্দর্যগত সমন্বয় সাধনের একটি সম্বন্ধ বা সম্পর্ক মাত্র, এবং ঐ সম্পর্ক সাধিত হয় শব্দের সঙ্গে অর্থের। শব্দ ও অর্থের মধ্যে নিবিড় সম্পর্ক কাব্যেরই একটি রহস্যময় ইঙ্গিত বা চিহ্ন। এ যেন সঞ্চারশীল বিহঙ্গের দুটি ডানা : রবীন্দ্রনাথ এরকম উদাহরণই ব্যবহার করেছেন সুর ও কথার বা সঙ্গীত ও সাহিত্যের যুগ্মরূপের বেলায়। কবি কালিদাস বাক ও অর্থকে শিব ও শক্তির মতো যুগলরূপ বলে উল্লেখ করেছেন এবং আলঙ্কারিক কুস্তক এ রহস্যটিকে সাহিত্যরসে সিদ্ধি করেছেন। ‘কাব্য-মীমাংসায় রাজশেখর উল্লেখ করেছেন : শব্দের ও অর্থের যে যথাবৎ সহভাব বা সহিতত্ত্ব, তার নাম সাহিত্য। সঙ্গীতে যে সাহিত্যের সহযোগ থাকে এবং সঙ্গীতের ভাব ও অর্থকে বোধগম্য ও সুসংযত করে, সে সম্পর্কেও রাজশেখর তাঁর গ্রন্থে আলোচনা করেছেন।

গানকর্মে সুর ও পদ প্রভৃতিকে যথাবিহিতভাবে বর্ণনা ও বিস্তার করার নাম বর্ণ। সেই বর্ণ চার প্রকার : ‘সা চতুর্ধা নিরূপিতঃ’, স্বাধী, আরোহী, অবরোহী ও সঞ্চারি। গানের বর্ণগুলিকে অবলম্বন করেই সঙ্গীতে অলঙ্কারের সৃষ্টি। এর সমর্থন পাই শার্ঙ্গদেব, কল্লিনাথ প্রভৃতির রচনায়। ‘সুধাকর’—টিকায় সিংহ-ভূপালও এরকম আলোচনা করেছেন।

এর পরেই আসে সুন্দরের প্রসঙ্গ। সুন্দর কি ও তার অনুভূতিই বা কি—এ সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ উল্লেখ করেছেন : পশ্চাত্য দর্শনের ভাষায় সুন্দর অর্থে The Beauty or the Beautiful. কিন্তু ভারতীয় দর্শনে সুন্দর রস—যা বিশ্বের সকল কিছুর সারবস্তু। ‘এষাং ভূতানাং পৃথিবী রসঃ’ (ছান্দোগ্য)—উপনিষদ সুন্দরকে সত্য ও কল্যাণময় শিবের

সঙ্গে এক ও অভিন্ন বলেছে। ভারতীয় দর্শনে তিনি অস্তিত্ব, তিনিই স্বতন্ত্র বা সত্যম, আবার তিনিই আনন্দ (Pure Existence, Pure and Transcendental Truth and Pure Bliss). এজন্য ভারতীয় দর্শনে পরম শান্তি, প্রশান্তি ও মুক্তি এক কথা। তৈত্তিরীয় উপনিষদ তাই বলেছে — বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যা কিছু, তা এই আনন্দ থেকেই সৃষ্টি হয়েছে। ‘আনন্দাঙ্কোঃ খল্লিমানি ভূতানি জায়ন্তে। আনন্দেন জাতানি জীবন্তি। আনন্দঃ প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি।’ সৃষ্টি-স্থিতি-লয় সবই আনন্দময় ব্রহ্ম থেকে। এ সম্পর্কে শ্রীকৃষ্ণ গোস্বামী, কবি কর্ণপুর, কৃষ্ণদাস গোস্বামী, মধুসূদন সরস্বতী, আনন্দ কুমার স্বামী, শ্রীঅরবিন্দ (গ্রন্থ : The National value of Art). ব্রাড্লে প্রভৃতির অভিমত পর্যালোচনা করে বলা যায়—সঙ্গীত হচ্ছে চাক্ষুশিল্পের চরম রূপ ও পরিণতি। তাই সার্থক শিল্পীমাত্রেরই সঙ্গীতশিল্পের সাধনায় সুন্দরতম ভগবানকেই প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করে জীবনকে কৃতকৃতার্থ করতে সক্ষম হন, (উদাহরণ : রবীন্দ্রনাথের ‘এই লভিলু সঙ্গ তব সুন্দর হে সুন্দর’)।

এতদ্ব্যতীত সৌন্দর্যের প্রকাশক বা স্রোতক চাক্ষুশ বা চমৎকারিতা সম্পর্কে সংস্কৃত সাহিত্যে ও অলঙ্কারশাস্ত্রে বিশেষভাবে আলোচনা করা হয়েছে। বৈদিক ও বৈদিকোত্তর যুগের সাহিত্য প্রধানতঃ সংস্কৃত ভাষাতেই রচিত। তার সঙ্গীতকলাও সেই ভাষাসম্বলিত। পরে বৌদ্ধ পালিভাষাতেও সঙ্গীতালোচনা যথেষ্টই স্থান পেয়েছে। বৈদিক সামগানের সমসাময়িককালেই গান্ধর্ব গানের প্রচলন হয় এবং বলা যায়—গান্ধর্ব গানই প্রকৃতপক্ষে ক্লাসিকাল যুগের মার্গ ও অভিজাত দেশী সঙ্গীতের উৎস। ক্লাসিকাল যুগে সংস্কৃত গানগুলি কিভাবে জাতিরাগ ও গ্রামরাগের সাহায্যে গাওয়া হতো, সে সম্পর্কে ভরত ‘নাট্যশাস্ত্রে’, শাঙ্গদেব ‘সঙ্গীতরত্নাকরে’ ও রাণা কুস্ত ‘সঙ্গীতরাজ’ গ্রন্থে আলোচনা করেছেন। নাট্যশাস্ত্রে চৌষটি রকম ধ্রুব গানের উল্লেখ পাওয়া যায়। নাগরাজ কন্বল প্রচলন করেন ‘কন্বলগীতি’; কন্বল সংস্কৃত প্রবন্ধ গান। অভিজ্ঞান শকুন্তলা, মৃচ্ছকটিক প্রভৃতি নাটকে এ সকল গানের প্রসঙ্গ আছে। এই সূত্রে উল্লেখযোগ্য যে বিভিন্ন রাগ-রাগিনীর উৎপত্তি, বিস্তার, তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক ও বাস্তবক্ষেত্রে তাদের ব্যবহারজনিত সমস্ত বিষয়গুলিই ধারাবাহিক পাঠ ও চর্চা-সাপেক্ষ। ধাররাজ ভোজ তাঁর ‘শৃঙ্গারপ্রকাশ’ গ্রন্থে রসধ্বনির প্রসঙ্গে সাহিত্য বিচারের প্রসঙ্গ ও উত্থাপন করেছেন। আলঙ্কারিক কুস্তক ‘বক্তোক্তিজীবিত’ গ্রন্থে চাক্ষুশ বা চমৎকারিত্বের আলোচনায় সাহিত্যের প্রসঙ্গ এনেছেন। সেখানে গুণ এবং শব্দালঙ্কার থেকে রস ও ধ্বনি পর্যন্ত বিষয়ের আলোচনা করেছেন কুস্তকও। অগ্নিপুত্রাণকারও আত্মচৈতন্যকে চমৎকার ও রসের পর্যায়ভুক্ত করেছেন।

ভারতীয় সঙ্গীত বিশেষভাবে রসভাব সম্বন্ধে পরিপূর্ণ এবং সঙ্গীতে যা কিছু সুন্দরের আবেশ, আবেগ, আবেদন ও মাধুর্য—সকল কিছু নির্ভর করে রসানুভূতির উপর। ডঃ স্যামুয়েল আলেকজান্ডার দর্শন নিয়ে তাঁর ‘Space, Time and Deity’ গ্রন্থে সুন্দর অসুন্দর এবং সুন্দরের বোধ ও অনুভূতি ব্যাখ্যা করেছেন। দার্শনিক ক্রোচে বলেছেন—‘Art and Beauty are identical. The esse of Beauty is its percipi. Beauty is not a quality of

things, but is the result of spiritual activity'. এজন্য ক্রোচের মতে সুন্দরের বা সৌন্দর্যের কোনো সমালোচনা বা তুলনা হতে পারে না। সৌন্দর্যবাদী মিঃ ক্যারিটও অনুরূপ কথাই বলেছেন। অধ্যাপক কলিংউডেরও একই মত। এ্যারিষ্টটেল সুন্দরকে বলেছেন সুমঞ্জস বা systematic কোনো নির্দিষ্ট রূপ বা রূপের বিকাশ। গ্রীক দার্শনিকদের অনেকের ধারণা—Beauty sleeps in matter and wakes up in the soul. কান্ট বলেছেন—সৌন্দর্য বা সুন্দরের অনুভূতি কেন্দ্রাঙ্কিত মনের বা ধ্যানের ফলশ্রুতিবিশেষ। সুন্দর ও সৌন্দর্যের আলোচনায় অনেকে 'Aesthetic' শব্দটি ব্যবহার করেন। ডঃ টি পি. রামচন্দ্রণের 'The Indian philosophy of Beauty' গ্রন্থটি এই সূত্রে উল্লেখযোগ্য। তবে ভারতীয় সৌন্দর্যবাদীদের সুন্দর বা সৌন্দর্য সম্পর্কে বিচার বিশ্লেষণ প্রণালী একটু বিশেষ বা স্বতন্ত্র রকমের। তাঁরা শিল্পের সঙ্গে সৌন্দর্যের মিতালী পাতান শিল্পের আদর্শকরণের বা idealization-এর ক্ষেত্রে এবং সেই আদর্শকরণ কর্মকে বলা যেতে পারে 'সাধারণীকরণ'। স্বামী প্রজ্ঞানানন্দের মতে এই সাধারণীকরণ প্রণালী আব্রহামাহিত শিল্পকে প্রতিষ্ঠিত করে তার অনুভূতির চরম ক্ষেত্রে সুন্দরকে সুন্দরতর ও সুন্দরতরকে সুন্দরতম করার জন্ম।

ভবিতব্য

নিখিল ঘোষ

বিকীর্ণ বিস্তারে বাঁচে
শাখার প্রসঙ্গ ;
অনুষঙ্গে আকৃতি থাকে
হিমশৈলী সত্যের।
পুষ্পে পুষ্পে
গোপন মধুর ব্যথা,
শতদলে সহস্র বাসনা।
ধরিণী বুকের ব্যথা
যতই গোপন করুক,

রাতের আকাশ তা
ঠিক বুঝে নেয় ;
বুকে তার ফুটে ওঠে
লক্ষ-লক্ষ ক্ষত—
অজস্র তারা ও নক্ষত্র।
সে সময়ে গানের ভূমি
পাললিক তট রচে।
তার পর সেই ক্ষেত্রে জন্মে
অজস্র ফাঁটাগুলোর ভীড়।



॥ আমার মায়ের মিষ্টি মুখে ॥

নচিকতা ভরদ্বাজ

আমার মায়ের মিষ্টি মুখে, আকাশ-আলোর স্বস্ত্যয়নী,
নিবিড় হুঁটি শুভ্র বৃকে চুলাংহল মাতৃ-মন্দাকিনী
খমকে আছে ! দীঘল হুঁটি কালো চোখের সন্ধ্যামণি
প্রদীপ হয়ে জ্বলছে যেন, রহস্যময় আলো ছায়ায় !
অনিন্দ্য সেই দৃষ্টিপাতে মর্ত্য-জীবন হয় সে ধনী ।
কোমল ঘাড়, মধুর ঐশ্বর্য—কী আছে যে—
আমি অবাক চেরে থাকি মোহন মায়ায় !
কালো চুলের নীল আকাশে সোনালী চাঁদ
মুখখানি তার কী অপকৃপ ! কোজাগরী জেগে আছে ।

অভিজাত চলার ছন্দে—প্রতি পদক্ষেপে
ফুল ফোটে, আর মুক্তধারার নদী কলস্বনা ।
স্পর্শে তার দিগদিগন্ত ব্যাপে
বাসন্তী দিন ফিরে আসে—বুলবুলি চন্দনা
গান গেয়ে যায় ! পদ্মা-জানুর রূপের বিচ্যাসে,
দৃপ্ত উরুর রূপকল্পে—দেবী দশভুজার
আনন্দরূপ দেখি আমি—কোমল কিশলয়ের
ছন্দে গড়া পাছটি তার—অনিন্দ্য উল্লাসে

ইচ্ছে করে বন্ধে রাখি, অশ্রুজলধার
উপচে পড়ে চোখে আমার —যেন জীবন জন্মের
অভিজ্ঞানটি ! আনত এই অধর-ওষ্ঠের
স্পর্শ-অর্থো পূজা করি তার !

মাগো ! তোর ঐ ভুবনবিমোহিনী
রূপ নিয়ে তুই কাছে এসে দাঁড়া একটি বার ।
তোকে আমি চিনি মাগো চিনি
—জন্ম-জন্মান্তরে তুই যে আমার
মা ছিলি ; তাই চিনতে ভুল হয়নি কো এবার ।
ঐ দেহের ঐ স্বর্গলোকে-জন্ম আমার
ঐ দেহেরই রক্ত মাংস মজ্জা নিয়ে—
আমার পুষ্টি । তাই তো তোকে এত আপন
আত্মজন বলে ভাবি—কাছে, ফিরে আসি
ছোট্ট একটি শিশুর মতন—হুঁহাত দিয়ে
আঁকড়ে ধরি ; —এমন সহজ শাস্ত সমর্পণ
তোর ঐ হুঁটি পাদ-পদ্মে,—অশ্রুজলে ভাসি ।



টিকাশ্রাশ

(গল্প)

বেদুইন

ছোটবেলা থেকেই গজানন ছিল বিশেষ করিতকর্মী। কিন্তু তার বিদ্যাবুদ্ধি নিয়ে সকলেই বিশেষ সন্দেহ প্রকাশ করত। যে গজানন বিনা আমন্ত্রণে ভোজবাড়ি গিয়ে পরিবেশন করত। প্রয়োজন ও অপ্রয়োজনে সহপাঠীদের সঙ্গে মারদাঙ্গা করত। শীতকালে স্কুলের টিফিন পিরিওডে বন্ধুবান্ধবদের নিয়ে নিকটবর্তী গেরস্তদের ফুলগাছের ফুল নির্মূল করত সেই গজানন অষ্টম শ্রেণী থেকে নবম শ্রেণীতে উন্নীত হতে না পেরে বিদ্যালয়ের সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করে হঠাৎ বেপাশ হইয়া গেল। গজাননের কাকা অভিরাম চক্রবর্তীর কাছে খোঁজ নিয়ে বিশেষ কোন লাভ না হলেও, অনেকের মুখেই শোনা গেল গজানন নবদ্বীপের কোন টোলে পড়তে গেছে।

বহর পাঁচেক পর গজাননকে আবার পল্লীতে দেখা গেল। কিন্তু তার চেহারা তখন আলাদা, পরিচয়ও ভিন্ন। গজাননকে তার গৃহের প্রবেশপথের পাশে একটি করগেট টিনের নতুন ঘর তৈরী করে তার দরজার উপর একটি সাইন বোর্ড টাঙ্গিয়ে ভেতরে দুটো তক্তাপোষের ওপর পাটি বিছিয়ে বসতে দেখা গেল। স্থানীয় সাইন বোর্ড লেখক নিরাপদ চিত্রকরকে দিয়ে যে সাইন বোর্ড লিখিয়ে ছিল তা বেশ প্রবিধানযোগ্য।

গজানন বিদ্যামন্দির—অধ্যাপক পণ্ডিত গজানন কাব্য ব্যাকরণতীর্থ ভিজরত। বিনা মূল্যে কাব্য ব্যাকরণ পঠন পাঠনের ব্যবস্থা আছে।

এই সাইন বোর্ডের পাশেই অপর একটি সাইন বোর্ডে লেখা ছিল, বিভিন্ন জটিল রোগের চিকিৎসা করা হয়। বিস্তৃত চ্যবনপ্রাশ, কামেশ্বর মাদক পাওয়া যায়।

অচিরেই গজাননের চিকিৎসালয় জমজমাট হয়ে উঠল। রোগীর সংখ্যা কম কিন্তু চ্যবনপ্রাশ ও কামেশ্বর মোদকের খন্দের দিন দিন বৃদ্ধি পেতে থাকে। টোলে দুইজন বিদ্যার্থী এর মধ্যেই জুটে গেছে। সকাল বেলায় বিদ্যার্থীরা মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ পাঠ করে, দ্বিপ্রহরে কোন কোন দিন পঞ্চতন্ত্র ও হিতোপদেশ পড়ান হয়। বিদ্যার্থীদের বৈকালিক কুটিন হল, প্রাশ ও মোদক বিক্রয়। অবশ্য চাহিদা মোদকেরই বেশি। বিশেষ করে এই মাদকে ভাংজাতীয় পদার্থের পরিমাণ সামান্য বেশি।

সন্ধ্যাবেলায় অথবা সকালে কোন রোগী এলে বিদ্যার্থী নরেন তলাপাত্র অন্দর মহলে খবর দেয়, গজানন খড়ম পায়ে দিয়ে খটাং খটাং শব্দ করতে করতে হাজির হয়। নাড়ী টিপে

রোগ স্থির করে ওষুধের ব্যবস্থা করে। বায়ু পিত্ত কফ কোনটা বৃদ্ধি পেয়েছে তা স্থির করতে চোখ বুঁজে কিছুক্ষণ নাড়ী পরীক্ষা করে, চিকিৎসকের কোন দর্শনী দিতে হয় না। ওষুধের দামও স্বহস্তে গ্রহণ করে না। সাধারণত বিদ্যার্থী নরেন তা গ্রহণ করে।

কিছুকালের মধ্যে গজানন কবিরাজের চ্যবন প্রাসের খ্যাতি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। তার ইতিহাসও বেশ উপভোগ্য। গজাননের গ্রামটি একটি নদীর ধারে। নদীর কিনারায় বহু বৎসর যাবত একটা বাজার গড়ে উঠেছিল। নদী পথে নানা মাল আনা নেওয়া হত। বিশেষ করে স্থানীয় পাট নৌকা বোঝাই হয়ে নিকটবর্তী রেল স্টেশনে যেত। পাটের কারবারীদের অধিকাংশই ছিল মাড়োয়ারী। এই রকম একজন ব্যবসায়ী হল ধূর্তলাল চোরপাটিয়া। ধূর্তলালের বাবা বজরংলাল সর্দি কাশিতে ভুগতে ভুগতে প্রায় অক্ষম হয়ে গিয়েছিল। মহকুমা শহরের ড্যালোপ্যাথ ও হোমিওপ্যাথরা জবাব দিয়ে বলেছিল, বজরংলালের বাঁচার কোন সম্ভাবনা নেই। বজরংলালকে জামুগা পরিবর্তন করিয়ে তার দেশ বিকানীয়ে পাঠিয়ে দেওয়া হোক। ধূর্তলাল শলাপরামর্শ করছিল তার আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে। এমন সময় পারঘাটার ঠিকাদার আবু হোসেন বলল, শেঠজি, এক দফা গজানন কবিরাজকে দেখাইয়ে।

ধূর্তলাল গজানন কবিরাজের নাম শুনেও তাকে চোখে দেখেনি। পাশ করা ডাক্তাররা যখন কৃতকার্য হয়নি তখন কবিরাজের ওপর ভরসা বুখা। তবুও আবু হোসেনকে দিয়ে খবর না দিয়ে স্বয়ং গেল গজাননের আয়ুর্বেদশালায়। হুটো রূপোর টাকা গজাননের পায়ের কাছে রেখে বজরংলালের রোগের বিবরণ দিয়ে চিকিৎসার জ্ঞাত আবেদন জানাল।

গজানন ধূর্তলালের সঙ্গে তার পিতার চিকিৎসার জ্ঞাত নদীর ঘাটে পাটের গুদামে হাজির হন। বজরংলাল একটা খাটিয়াতে শুয়ে কাশছে আর হাঁপাচ্ছে দেখে গজানন তার পাশে বসে ডান হাতটা নিজের হাতের মধ্যে তুলে নিল। বজরংলাল ভিজ্জেস করল, কোণ তুম্ ?

ধূর্তলাল বলল, বইদ, পিতাকী।

রোগী দেখে গজানন কিছু নির্দেশ দিয়ে চ্যবনপ্রাশের নিয়মিত গ্রহণের ব্যবস্থা করে ফিরে এসেছিল।

কয়েকমাস চ্যবনপ্রাশ সেবন করে বজরংলাল মোটামুটি সুস্থ হয়েছিল। এই খবর চারিদিক জানাজানি হতেই গজাননের চ্যবনপ্রাশের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ল সঙ্গে সঙ্গে তার হাত ঘণের খবরও।

কবিরাজ হিসাবে বিশেষ খ্যাতি হবার পর একা গজানন অধ্যাপনা ও চিকিৎসায় বিশেষ মনোযোগ দিয়েছে। কামেশ্বর মোদক আর তৈরী হয় না গজাননের আয়ুর্বেদশালায়।

ধূর্তলাল নিজেই চ্যবনপ্রাশ খেতে আরম্ভ করেছিল। প্রতি সপ্তাহে লোক পাঠিয়ে এক সপ্তাহের উপযোগী চ্যবনপ্রাশ নিয়ে যেত যথাযথ মূল্য দিয়ে।

হঠাৎ ধূর্তলাল একদিন সকালে এসে হাজির। গজাননকে ডেকে বলল। বইদ্জি ই প্রাশ কায়সা করুয়া মালুম হোতা হ্যায় ?

গজানন চাবনপ্রাশের কোটাটি টেনে নিয়ে ভাল করে শুঁকেই বুঝতে পারল ঘটনাটা।

যে ঘরে ওষুধ তৈরী করে রাখা হত সেই ঘরে কোন ক্রমে ছোট মত একটা ছুঁচো চাবনপ্রাশের ইঁড়িতে ঢুকে পড়ে আর বের হতে পারেনি। ইঁড়িতে মরে পচে গিয়ে চাবনপ্রাশের সঙ্গে মিশে গেছে, অবস্থা গুরুতর।

গজানন ডাকল, নরেন।

আজ্ঞা পণ্ডিতমশাই, বলে নরেন সামনে এসে দাঁড়াল।

তোমার কি জ্ঞানবুদ্ধি লোপ পেয়েছে ?

নরেন কোন উত্তর না দিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

তুমি চোরপাঠেয়াজিকে চাবনপ্রাশ না দিয়ে চিকাপ্রাশ দিয়েছ। তুমি জান চাবনপ্রাশের চেয়ে চিকাপ্রাশের দাম চারগুণ। তোমরাই আমার সর্বনাশ করে পথে বসাবে দেখছি। ওটা বদলে চাবনপ্রাশ দাও।

ধূর্তলাল বলল নেহি বইদ্জি হাম চৌ-গুণা দেগা।

নেহি। যো বেমারকা যো দাওয়াই।

নরেন ধূর্তলালের চিকাপ্রাশ বদলে চাবনপ্রাশ দেবার পর গজানন ইঁফ ছেড়ে বাঁচল। নরেনকে চুপি চুপি বলল, ওষুধপত্র ভাল করে দেখে শুনে দিও। নইলে জেলে যেতে হবে বুঝলে।

“শ্যামা সঙ্গীত”

গৌর গোপাল পাল

হরের বুকে, নাচিস স্নেহে, তুই মা বালিকা।
রাঙা জবায়, পোজে সবাই, জগত পালিকা।
এক হাতে মা অন্তর দানিস,
অন্য হাতে অসি হানিস,
কখন করে রাখিস, মারিস-তুই মা কালিকা।

ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ-চতুর্ভুজ চারি হাতে,
ধারণ করে আছিস মাগো-পায়ে দ'লে ভোলানাথে ;
দীন গৌরের সাধা কি বল,
বুঝতে মাগো তোর ঐ হল,
তাই ডাকি আজ সঙ্গে নে চল—ন মুণ্ড মালিকা।

যেতে যেতে ফিরে চাই

চিত্রিতা দেবী

ভোরবেলা যখন আকাশে রং লাগে না, শুধু অন্ধকার একটু ফিকে হয়ে আসে, তখন শুনতে পাই ঝিক্ ঝিক্ ঝিক্। ট্রেনের শব্দে, দূরের শব্দ কাণে এসে পৌঁছয়। ট্রেন চলেছে দূর থেকে দূরে, মাইলের পর মাইল পেরিয়ে, নীল পাহাড়ের ধার দিয়ে, সবুজ বনের পাশ দিয়ে। হৃদিকে সরে সরে চলে যাচ্ছে গ্রামের পরে গ্রাম। ধানের ক্ষেতে হাওয়া বইছে ঢেউ তুলে তুলে। জামতাড়া, মিহিজাম, মধুপুর কিম্বা পাটনা, কাশী, দিল্লী, আগ্রা। এমনকি বম্বে, ম্যাড্রাসই বা নয় কেন? কখনো ঝিক্ ঝিক্, কখনো ঘড় ঘড়, কখনো ভোঁ, কখনো পান বিড়ি সিগারেট। কখনো 'চাএ গরম'! আঃ কি সুন্দর! ছোটনাগপুরের ছোটো ছোটো পাহাড়গুলির গায়ে সবুজের অরণ্য। শালবন, আম বাগান, জাম বাগানের ঘন অন্ধকার ছায়া দূর থেকে ভেসে আসা মহুয়া ফুলের গন্ধ। নাঃ, আজ আর এসব নেই। এই তো সেবারে গিয়েছিলাম ঐদিক দিয়েই একেবারে দিল্লী পর্যন্ত। জানালা দিয়ে দেখতে দেখতে অবাক হয়ে ভাবছিলাম পাহাড়গুলি এরকম স্ফাড়া স্ফাড়া কেন? আগের দেখার সঙ্গে এ দেখা তো মিলছে না। শাল মহুয়ার গাছগুলি সব গেল কোথায়? ও হো। গাছগুলি সব লুপ্ত হয়ে গেছে মানুষের লোভের গহ্বরে। পাহাড়গুলি একেবারে শ্রীহীন হয়ে গেছে।

সেদিন সেই গল্পই হচ্ছিল, আগেকার দিনে ট্রেনে যাবার একটা আলাদা সুখ ছিল। চার বার্থের রিজার্ভ করা গাড়ী, পুরোপুরি নিজেদের। কামরায় ঢুকেই মা সেটিকে শোবার ঘরের মত গুছিয়ে নিতেন। বাক্সে বিছানা পেতে একপাশে গুটিয়ে রাখা। টেবিলে টিফিন কেয়িয়ার, ফলের বান্ধেট। এক কোণায় রাখা হাত কুঁজোর ভরা জল। একবেলার খাবার তো সঙ্গেই যেত। লুচি আলুর দম, আর বর্ধমান থেকে কেনা হাত মিহিদানা সীতা ভোগ। এমন কত বার কত লোকে কিনে এনেছে। সে জিনিষ আর পাওয়া যায় না।

তখনকার দিনে বেশীরভাগ গাড়ীর সঙ্গেই ডাইনিং কার থাকত। কেলনার বলে একটা প্রতিষ্ঠান খাবার সরবরাহ করত। তাদের তৈরী চিকেনকারী আর রাইসের স্বাদ এখনো যেন মনে পড়ে যায়।

মনে পড়ছে ছোট্টো বেলার একটা মজার গল্প। রাতে খেয়ে দেবে উপরের একটা বার্থে গায়ে চাদর মুড়ি দিয়ে আরাম করে শুয়েছি। ট্রেনের হুলুনিতে কয়েক মিনিটের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়েছি। হঠাৎ মাঝরাতে ঘুম ভেঙে গেল। সর্বনাশ! আমার গায়ের চাদরটা ট্রেনের চাকার সঙ্গে না জানি কেমন করে জড়িয়ে গেছে। আমি জোর করে চাদরটা টেনে ধরে আছি। নইলে চাদরের সঙ্গে সঙ্গে আমিও যে চাকার তলার তলিয়ে যাব। আমি প্রাণপণে চোখ বুজে চাদর আঁকড়ে আছি। রেলের চাকা ততো জোরে টানছে। গরব্, গরব্, গরব্, গরব্। দারুণ জোরে ট্রেন ছুটছে। আমার চেয়ে রেলের তীব্র গতির জোরতো বেশী হবেই। মৃত্যুর সঙ্গে টাগঅব-ওয়ারের সেই স্মৃতির রেশ আজো মনে আছে। ঈস্ কি হবে। চাদরটা যে চলে গেল, শেষ অবধি আর ধরে রাখতে পারলাম না। আমি চীৎকার করে কঁাদতে কঁাদতে উঠে বসলাম, “আমার চাদর চাকার নীচে চলে গেল।”

তখন সকলের কি হাসি। মা বলছেন, “শীগ্গীর নেমে এসে মুখ হাত ধুয়ে নাও। পরের স্টেশনেই যে নামতে হবে। তাকিয়ে দেখি, মাঝরাস্ত্রির অনেক আগেই পালিয়ে গেছে। এখন প্রথম সকাল চারিদিকে খাট খাট করছে।

সেদিন রত্না এসেছিল। সে আবার পদার্থবিজ্ঞান স্নাতক। এখন অণু পরমাণু নিয়ে কিসের গবেষণা করছে। সে আমাকে প্রায়ই বিজ্ঞানের বিষয় নানারকম গল্প করে। সেদিন আইন স্টাইনের থিয়োরী বোঝাচ্ছিল। তিনিই প্রথম দেখালেন। সব জিনিস, সব ঘটনার মধ্যে সমস্ত একটা ফ্যাক্টর। আরে তা তো বটেই। সব ঘটনাই তো ঘটে কোন না কোন সময়ে। সব জিনিসের মধ্যেই সমস্ত তার আসন গেড়ে বসেছে।

রত্না বলল, সাধারণ বুদ্ধিতে তা মনে হলেও আইন স্টাইন এটা অঙ্ক দিয়ে প্রমাণ করেছেন।

অঙ্ক! ওরে বাবা। আমি তার মধ্যে নেই। আমি সমস্তকে দেখি কাছে থেকে। দূরে থেকে, স্মৃতির ভেতর থেকে—

রত্না আমাকে খামিরে দিয়ে বলে। মাসী ভোমাদের মত অনেকে এই সৃষ্টিকে কবিতা মনে করে কিন্তু বিজ্ঞানীর কাছে সৃষ্টি রহস্য হোল অঙ্কের জটিল তত্ত্ব। ভোমাদের দার্শনিকরা নাকি বলেছেন, এ হোল ঈশ্বরের লীলা। যদি লীলা খেলাই হয়, তবে জেনো অঙ্কের খেলা।

আমি হাসতে হাসতে বলি cross word puzzle. এ ধাঁধার রহস্য কোনদিন পুরোপুরি কেউ ভেদ করতে পারবে বলে মনে হয় না। সময়ের ব্যাপার আমি তো কিছু বুঝতে পারিনা। এই ভোর কথাই ধরুন। এই তো সেদিন হাঁটি হাঁটি পা পা করে চলতে শিখলি। তারপর ঘরময় ঘুরে বেড়ালি। তারপর ইন্সকুল, কলেজ, ইউনিভার্সিটি। এখন হরত আমেরিকা যাবার চেষ্টা করছিস।

কিন্তু যেখানেই থাক, আর যে দেশেই যাস একটাই কাল তোকে ঘিরে থাকবে। কালকে মানুষ কিছুতে ছাড়তে পারে না।

ট্রেনের শব্দের সঙ্গে কি কালের শব্দও মিশে থাকে। নিঃশব্দে যে মৃত্যুকে এগিয়ে নিয়ে আসে। কালের সঙ্গে অজস্র বিচিত্র শব্দ মিশে থাকলেও কালের পায়ে আওয়াজ শোনা যায় না। তবু কবি বলেন।”

কালের যাত্রার ধ্বনি শুনিতে কি পাও ?

তারি রথ নিতাই উধাও। কালের রথ চলেছে, কিংবা রথে করে চলেছে কাল। রথযাত্রায় কি আমরা কালের ত্রিমূর্তিকেই দেখতে পাই অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ।

একদিন জন্ম হোল। মুহূর্তে মুহূর্তে অজানা ভবিষ্যৎ বর্তমান হতে লাগল। মুহূর্তে বর্তমান ছুটে লাগল অতীতে। মৃত মুহূর্তগুলি অতীতে জন্মলাভ করতে লাগল। অচেনা ভবিষ্যৎ বর্তমানে প্রবেশ করতে লাগল। দেখতে দেখতে একটি মানুষ কৈশোর, যৌবন, পার হয়ে বার্ধক্যের দ্বারে এসে নেপথ্যে বেরিয়ে যাবার জন্যে অপেক্ষা করতে লাগল।

মানুষ কি সময়ের হাতে গড়া পুতুল ? যে সময়কে কোন ট্রেন কোন প্লেন ছুটে গিয়ে ফিরে পেতে পারে না। অথচ স্মৃতির মধ্যে মাঝে মাঝে যে দিব্যি টাইটসুর হয়ে বেঁচে থাকে।

মনে পড়ে আমার সেই ছোট বেলার আমিকে। সেই যে ছোট্টো মেয়ে বব্ করা চুল। ক্রক পরা মিষ্টি মিষ্টি চেহারা। সবাই বলত শুনেছি। হু একটা ফটো ছিল। কোথায় হারিয়ে গেছে তারা। সে মেয়ের চেহারা অবশ্য আমার ভালো করে মনে নেই। কিন্তু মনে আছে তার স্কিপিং করার স্বথ, অঙ্ক না পারার হুঃখ। অঙ্ক না বোঝার অপমান। মনে আছে সমুদ্রের ঢেউ আছড়ে আছড়ে পড়ছে। কি তার গর্জন! পুরীতে বেড়াতে এসেও আমি বারান্দায় বসে অঙ্ক করার চেষ্টা করছি। মন একবারেই অঙ্কে নেই, সে সমুদ্রে স্নান করছে। কখনো ঢেউএর মাথায় লাফিয়ে, কখনো ঢেউএর তলায় তলিয়ে গিয়ে। তাই বারবার অঙ্ক ভুল হচ্ছে। সারা মন ছুটে যেতে চায় সমুদ্রে। সেই ছুটে যাওয়ার বার্তাটা এখনো মনের মধ্যে রয়ে গেছে।

কথা ছিল গল্প দিয়ে শুরু করব। কিন্তু তার বদলে কিছু চিন্তার টুকরো ছড়িয়ে পড়ল। এই জীবনের সময় সীমার কত মানুষ এলো গেলো। বেশ কিছু বিখ্যাত মানুষ, যারা শুধু নামে বিখ্যাত নন, যারা তাঁদের নিজের জীবনের আলোয় বহু মানুষের জীবন আলোকিত করেছিলেন। এমন কিছু মানুষকে দেখেছি কাছ থেকে। আবার বহু অখ্যাত মানুষ যাদের নাম কেউ জানে না, কিন্তু যাদের জীবনের স্নেহ পরিচিত বহু মানুষকে খুশী করেছিল, দেখেছি তাদেরও। এমন অনেক ঘটনার মধ্যে দিয়ে গিয়েছি, যা তখন অত্যন্ত জরুরী মনে হয়েছিল। আজ যার মূল্য কমে

গেছে। আবার এমন অনেক ঘটনা যা আকাশের আলোর মত স্বাভাবিক মনে হয়েছিল, আজ মনে হচ্ছে অসামান্য সেই “আলোকের ঝরণাধারায়” কেন অঞ্জলি ভরে নিতে ছুটে যাই নি। দ্বিতীয় সঙ্কোচে কেন ইতস্তত করেছি। না চাইতেই অনেক পেয়েছি। কিন্তু “দিনে দিনে তো সে মহাদানের যোগ্য” হতে পারিনি।

ভেবেছিলাম আমার দাদামশায়ের গল্প দিয়েই শুরু করব। কিন্তু এ প্রবন্ধে কুলবে না, তাই দাদামশায় তাঁর দাড়ি টাড়ি নিয়ে অপেক্ষা করুন। এবারে সেই ছোট্ট মেয়ের কথা দিয়েই গল্প শেষ করি, সেই যে মেয়েটী পুরীর সমুদ্রতীরে হোটেলের বারান্দায় বসে বসে অন্ধের সংখ্যা না গুণে সমুদ্রের ঢেউ গুণছিল। মেয়েটী যে আমি সে কথা বোধহয় আগেই বলেছি।

তখন আমার বয়স ছিল সাত। আমার বাবার বয়সও নিশ্চয়ই চল্লিশের নীচেই। কিন্তু পণ্ডিত বলে তখনই তাঁর খ্যাতি ছনিয়ার অনেক বিদ্বৎ সমাজে পৌঁছে গেছে। কিন্তু তিনি কিছুতেই বুঝতে পারছিলেন না, কেন তাঁর মেয়েটির মাথায় ভগ্নাংশের অংশগুলি ঢুকতে পারছে না। যতই বোঝান, ততই সে বোঝে না। শুধু কাঁদে, চড় মারলে তো রক্ষে নেই। কান্না আরো বেড়ে যায়। ধমক দিলেও একই ব্যাপার। আদর করে কি অঙ্ক বোঝানো যায়।

ব্যাপারটা এতটা ঘোরালো হয়ে উঠেছিল একটা বিশেষ কারণে। আমরা যখন রীচি রোডের বাড়িতে এলাম, আমাকে ইস্কুলে ভর্তি করার কথা ভাবা হচ্ছিল। পাড়ায় কিছু দূরেই পণ্ডিত মুরলীধর বন্দ্যোপাধ্যায় একটি মেয়েদের স্কুল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, বালীগঞ্জ বালিকা বিদ্যালয়। এখন সেই স্কুলটাই বিরাট মুরলীধর ইনস্টিটিউশনে পরিণত হয়েছে। তখন ছিল খোলামেলা একটা বাড়ি। খেলার ঘাঘগাও যথেষ্ট ছিল। একদিন বোধহয় তিনি বাড়ীতে এসেছিলেন। আবছা যেন মনে পড়ে আবক্ষ সাদা দাড়ি কিছু কালোর মিশেস দেওয়া। বাবা গর্ব করে বলতেন আমার মাষ্টার-মশাই। আবার তাঁর ছেলে বিখ্যাত লেখক আই, সি, এস হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় প্রেসিডেন্সি কলেজে বাবার ছাত্র ছিলেন। হুজুরের মধ্যে প্রীতির সম্পর্ক আজীবন অটুট ছিল।

এ গল্পে এ প্রসঙ্গ অবশ্য অবাস্তব। আমি তো ইস্কুলে ভর্তি হলাম। টীচাররা আমাকে দেখেই কেন যে এত খুসী হয়ে উঠেছিলেন। কেন যে কাড়াকাড়ি করে আদর করতে লাগলেন জানি না। আমি ক্লাস টুতে ভর্তি হয়েছিলাম। না থ্রিতে মনে নেই। তখন তো আর নার্সারি স্কুলের রেওয়াজ ছিল না।

যাই হোক ছমাস পরে যখন পরীক্ষা হোল, দেখা গেল, ইংরেজি, বাংলা, নেচার স্টাডি, ড্রইং, ইত্যাদি সব বিষয়েই আমি ভালো করে পাশ করেছি, শুধু অঙ্কে গাব্বুসু মেয়েছি। টীচাররা নিজেদের মধ্যে ঠিক করলেন, এ যখন সব বিষয়ে ভালো করে পাশ করেছে, তখন একে প্রমোশন

দেওয়া যাক। অক্টো নীচের ক্লাসে গিয়ে কিছুদিন করুক। মাস তিনেক পরে আর একবার পরীক্ষা নিয়ে তবে উপরের ক্লাসে অঙ্ক করবে। তখনকার দিনে শিক্ষিকারা বাচ্চাদের ব্যক্তিগত স্মৃতিতে অস্মৃতিতে কথা কত ভাবতেন।

আমি তো মহাখুশী। বাড়িতে এসে বললাম। আমি পাশ করেছি। শুধু অক্টো কিছুদিন নীচের ক্লাসে গিয়ে করতে হবে।

অর্থাৎ ? Report খুলে দেখে বাবার চক্ষু স্থির। অঙ্কে ফেল ! নীচের ক্লাসে গিয়ে অঙ্ক করবে। সে হবে না। এই একমাসের মধ্যেই যা যা বাচী আছে সব অঙ্ক শিখে নাও। ছুটির পরেই আবার পরীক্ষা দেবে। তাতে যদি পাশ কর তো পাশ, নইলে প্রমোশন হবে না।

আরে এ তো সিম্পল ব্যাপার। সামান্য ভগ্নাংশ। না বোঝার কি আছে ? এক কে দুভাগ করলে আধখানা হয় জানিস তো ?

“হ্যাঁ.....”। আমি উৎসাহের সঙ্গে ঘাড় নাড়ি। —“বেশ, তাহলে তিনভাগ করলে ?

এবারে আমি চূপ করে যাই।

“চারভাগ করলে ?” আমি নীরব থাকি।

ভারপরেই বাবা আমাকে নিয়ে উঠে পড়ে লাগলেন। নিজের কাতকর্ম সব ফেলে আমাকে অঙ্ক শেখাতে লাগলেন। কিন্তু যে শিখবে তার মন কই ? ছুটির এক মাসেও যখন একের ভাঙা টুকরোগুলো আমার মাথার মধ্যে বার বার হারিয়ে যেতে লাগল, তখন রণে ভঙ্গ দিয়ে বাবা একজন মাষ্টারমশাই রাখলেন। তার ফল কি হয়েছিল মনে নেই। কিন্তু পরের বছর অন্য স্কুলে ভর্তি হলাম। এটি তখনই বিখ্যাত “গোখেল মেমোরিয়াল” স্কুল। এখানে কড়া ডিসিপ্লিন। শিক্ষিকারা ভালোবেসে এক ক্লাসে প্রমোশন দিয়ে অন্য ক্লাসে অঙ্ক কসতে কিছুতেই দেবেন না। এ স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন শ্রীযুক্তা সরলা রায়। এঁকেও দেখেছি মনে আছে। প্রথম যখন দেখি, আমাদের বাড়িতে এসেছিলেন। দাক্ষণ ব্যক্তিত্বময় জমকালো চেহারা। তখনকার দিনের ভঙ্গিমা সাজ। মাথার এলবার্ট করা চুলের উপরে সাদা লেসের একটা ভেইল গলা ঢেকে পিঠের উপরে পড়েছে। সরলা রায়ের স্বামী প্রফেসর পি. কে রায়কে বাবা শ্রদ্ধা করতেন। তিনিও বোধহয় বাবার প্রফেসর ছিলেন। P. K. Ray-র লেখা ‘লজিকে’র বই আমাদের সমস্ত পর্যাস্ত ইন্টার-মীডিয়েটের পাঠ্য ছিল। আমি সেদিন আমার সবচেয়ে ভালো ক্রক পরে তৈরী হয়েছিলাম। মা আমাকে নিয়ে এসে বললেন, আশা করি আপনার স্কুলের মর্যাদা রাখতে পারবে। ভারী চুই কিন্তু।” তিনি আমার মুখের দিকে এক পলক চেয়ে বললেন।

—‘কই বেশ তো শান্ত।’

P 29184

Gold Flake সিগারেটের টিন বাবার নিত্য সঙ্গী ছিল। টিনটি টেবিলের উপরে রাখাও ছিল। কিন্তু প্রবীণা শ্রদ্ধেয়া সমাজ সেবিকার সামনে সন্কেচে টিনটিতে বাবা হাত দেননি। কথা বার্তা বলতে বলতে মিসেস পি. কে রায় তাঁর হ্যাণ্ডবাগটি খুলে রূপার সিগারেট কেস থেকে একটি সিগারেট বার করলেন। বাবা ভাড়াভাড়া সিগারেটটি ধরিয়ে দিয়ে খুশী মনে নিজের টিনটি হাতে তুলে নিলেন। সেই প্রথম কোন মহিলাকে সিগারেট খেতে দেখেছিলাম। অবশ্য ঐ রকম ব্যক্তিত্বসম্পন্ন কোনো মানুষকে মহিলা বলে চিহ্নিত করা যায় না।

সরলা রায় নিজে আমাকে স্কুলে নেওয়ার হযত আমার কিছু বাড়তি সুষোগ মিলেছিল। কিন্তু আমি জীবনে কোন সুষোগই তেমন করে গ্রহণ করতে পারিনি। অবশ্য এই প্রথম সুষোগটায় হযত ভালো করেই উৎসাহিত ছিলাম। তখনো স্কুলের এই বিরাট বাড়িটি তৈরী হয়নি। শুধু কল্লনা কল্লনা চলছিল মাত্র। স্কুল চলত ল্যান্সডাউন রোডের একটি দোতলা বাড়িতে। মাঝখানে অবশ্য বেশ বড় খেলার মাঠ ছিল। আমি ভর্তি হবার কিছুদিনের মধ্যেই কি একটা ফাংশনে ছোটোদের একটা ইংরেজী নাটক অভিনয় করার ব্যবস্থা হয়েছিল। নাটকটার নাম বোধহয় Dolls Fever বা ঐধরণের কিছু একটা। নতুন মেয়ে আমি যে কি করে নাস্তিকা সাধলাম জানি না। নাস্তিকা অর্থাৎ পুতুলের মা। আর একটি একটু বড় মেয়ে নার্স হয়েছিল। তখন নীচু ক্লাসে ছোটো ছেলেরাও পড়তে পারত। যে দুটি ছেলে ডাক্তার ও গৃহকর্তা সেজেছিল, তাদের চেহারাটা ভালো করে মনে নেই। নাম দুটো মনে পড়ে ডাক্তার ও দিলীপ।

এতো গেল সেই ছোটো মেয়েটির কয়েকটা টুকরো কথা। কিন্তু সেই মেয়েটিই যে আমি তাই বা কে বলতে পারে। এই ‘আমি’র ভিতরে দিনে দিনে বছরে বছরে কত আমি যে তৈরী হয়ে চলেছে, কে তার হিসেব রাখে? কেই বা তার নিজেকে নিজে চিনতে পারে?

স্কুল হয়েছিল ট্রেনের কথা দিয়ে। ট্রেন চলে ঝিক্ ঝিক্। কাছে কে দূরের সঙ্গে মিলিয়ে সময়কে মাড়িয়ে মাড়িয়ে ট্রেন চলে বিচিত্র আওয়াজ করতে করতে। সময় চলে নিঃশব্দে। তার নিঃশব্দ চলার বেগে কতনগর ভেঙে পড়ে, কত সাম্রাজ্য ধ্বংস হয়। খাণ্ডব প্রস্থ দগ্ধ করে ইন্দ্রপ্রস্থ গড়ে ওঠে। আবার সেই মহানগর সপ্তস্বর মাটির নীচে চাপা পড়ে যায়। তবু বার বার গড়ে ওঠে নতুন নগর, নতুন গ্রাম, নতুন জীবন। সেই মেয়েটির মত কত অজস্র ছোটো মানুষ বড় হতে হতে বুড়ো হয়ে যায়। সময়ের ঘূর্ণাবর্তে ঘুরতে ঘুরতে ছুটেছে ছুটেছে কোথায় যায়? কেন যায়? “আমার সকল নিয়ে বসে আছি সর্বনাশের আশায়? লক্ষ্য কি? শুধুই মৃত্যু? শুধুই ধ্বংস?—না, মৃত্যুর পথে পথে সৃষ্টির বিচিত্র শিল্পকলা। শুধু কালীর করাল নৃত্যই সত্য নয়। দুরাগত বংশীধ্বনির মত তারো মাঝে শোনা যায় জীবনের মহাসঙ্গীত।

কবি বঙ্কিমচন্দ্র

বসুমিত্র মজুমদার

সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সাহিত্য জীবনের সূচনা পর্বে, পাঠক সমক্ষে, কবি অর্থাৎ কবিতা রচয়িতা হিসেবে পরিচিত ছিলেন। তাঁর কাব্য সাহিত্য চর্চা বাল্যকাল থেকেই স্ফূর্তিত হয়েছিল। ছাত্রাবস্থায় তিনি যে সমস্ত গদ্য পদ্য রচনা করতেন তার অধিকাংশই প্রকাশিত হ'ত ঈশ্বর গুপ্তের 'সংবাদ প্রভাকর'র পাত্রে। 'সংবাদ প্রভাকর' যেমন ছিল একটি প্রথম সারির পত্রিকা, তেমনই ছিল সে যুগের নব্য সাহিত্যিক কবিদের সাহিত্য ও কাব্য ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হবার অমূল্য প্রবেশদ্বার স্বরূপ। বঙ্কিমচন্দ্র ছাড়াও আরো অনেক সাহিত্যিকই এর পাতায় হাত মক্ক ক'রে, ঈশ্বর গুপ্তের প্রেরণা ও উৎসাহ লাভ ক'রে পরবর্তী যুগে বিশিষ্টতা অর্জন করেছিলেন। এর ১৮৫২-র ২৫শে ফেব্রুয়ারী সংখ্যায় বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম কবিতা প্রকাশিত হয়েছিল। কবিতাটির শিরোনাম ছিল 'পদ্য'। এটি একটি কথোপকথন মূলক কবিতা। প্রথম চরণে স্ত্রীর উক্তি এবং দ্বিতীয় চরণে পুরুষের উক্তি এই ধারায় পয়ার ছন্দে রচিত কবিতাটি ছিল নিম্নরূপ—

“স্ত্রীঃ। কহ না কি হেতু, কাস্ত, শশী অস্তে চলে।

পুং। তব মুখে মুক হোয়ে চলে অস্তাচলে ॥

স্ত্রীঃ। দশ দিগ্ কেন প্রাণ, প্রকাশিত হয়।

পুং। তব মুখ আলোকেতে, হয় প্রভাময় ॥

স্ত্রীঃ। কি হেতু কোকিলকুল কুহ কুহ করে।

পুং। তোমার মধুর স্বর, পাইবার তরে ॥

স্ত্রীঃ। সে রবে কি হেতু প্রাণ, হোয়েছে বিকল

পুং। আমারে নির্দয় বোলে, পাও প্রতিফল ॥” ইত্যাদি

ছাত্রাবস্থায় বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যকৃতির একটি উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। মাত্র পনেরো বছর বয়সে (১৮৫৩) বঙ্কিমচন্দ্র সংবাদ প্রভাকর আয়োজিত এক কবিতা প্রতিযোগিতায় তাঁর কাব্য কৃতিত্বের নিদর্শন স্বরূপ সপ্রশংস পুরস্কার লাভ করেছিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে আরো জানতে পারা যায় যে, তিনি বাল্যকালেই খুব সুন্দর বাংলা ও সংস্কৃত কবিতা আবৃত্তি করতে পারতেন। তাঁর কণ্ঠের আবৃত্তি সকলকে মুগ্ধ করত। শোনা যায়, পণ্ডিত হুগলি তর্কচূড়ামণি বঙ্কিমচন্দ্রের আবৃত্তির আকর্ষণে প্রায়ই তাঁদের বাড়ী আসতেন এবং

বঙ্কিমকে মহাভারত শোনাতে, জয়দেব, ভারতচন্দ্রের কবিতার সঙ্গে প্রাথমিক পরিচয় করিয়ে দিতেন। এই ভাবেই সাহিত্য সম্রাটের শিশুমনে কাব্য প্রীতির বীজ রোপিত হয়েছিল।

ঈশ্বর গুপ্তের সংবাদ প্রভাকর ছাড়া ‘সংবাদ দর্পণ’, ‘সাধুরঞ্জন’, ‘ভ্রমর’, স্বসম্পাদিত ‘বঙ্গ দর্শন’ প্রভৃতি পত্রিকায় তার কবিতাগুলি মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়েছিল। পুস্তিকাকারে তার ‘গদ্য পদ্য বা কবিতা পুস্তক’, ‘ললিতা’, ‘মানস’ কাব্য সংকলনগুলি আমরা পেয়েছি। এ ছাড়া উপন্যাস রচনার সময় তার প্রেক্ষাপটের পরিপ্রেক্ষিতে কিস্থা বঙ্গদর্শনের পৃষ্ঠা পূরণ করতে বঙ্কিমচন্দ্র কিছু কবিতা, গান রচনা করেছিলেন।

তার লিখিত কবিতাগুলির মধ্যে অধিকাংশই বিদ্রূপাত্মক। সমাজকে, রাষ্ট্রকে, জাতিকে ঘনঘন বিদ্রূপ করেছেন কবিতাগুলির মধ্যে। তাঁর তীব্র নির্মম বিদ্রূপবাণ মূলতঃ তৎকালীন আলোচনা সর্বস্ব, শূণ্যগর্ভ আন্দোলন পদ্ধতিকে লক্ষ্য করেই নিক্ষেপিত। যেমন, ‘সমবেত বাঙ্গালীদিগের সভা’ দেখে “ভাই ভাই” শীর্ষক কবিতায় তিনি মন্তব্য করেছেন—

“শিখিয়াছি শুধু উচ্চ চীংকার
‘ভিক্ষা দাও! ভিক্ষা দাও! ভিক্ষা দাও!’ সার
দেহি দেহি দেহি বল বার বার,
না পেলে গালি দাও মিছামিছি।
দানের অযোগ্য চাও তবু দান
মানের অযোগ্য চাও তবু মান
বাঁচিতে অযোগ্য, রাখ তবু প্রাণ
ছি ছি ছি ছি! ছি ছি ছি ছি ছি ছি।”

লক্ষণীয়, বাঙালীদের দিকার দিতে গিয়ে হিন্দুদের শাস্ত্রকেও এখানে কটাক্ষ করেছেন বঙ্কিম। বেদ, উপনিষদ, ত্রিঐশ্বরী প্রভৃতি শাস্ত্রের দেহি দেহি, দাও দাও এই প্রার্থনা সমূহের প্রতি পরোক্ষ বিদ্রূপ করেছেন তিনি। এখানেই শেষ নয়, যিনি পরবর্তীকালে ‘আনন্দমঠ’, ‘দেবী চৌধুরানী’, ‘সীতারাম’ প্রভৃতি উপন্যাসে, বলতে গেলে, হিন্দুশাস্ত্রের প্রচারকের ভূমিকা নিয়েছেন, যিনি ধর্মতত্ত্ব ব্যাখ্যা করেছেন, শ্রীমদ্ভগবত গীতার টীকা রচনা করেছেন, তিনিই ‘হুর্গোৎসব’ কবিতায় লিখেছেন—

কারে মা এনেছ সঙ্গে অনন্ত রঙ্গিনী!
কি শোভা হয়েছে আজি দেখ রে সবার।
আমি বেটা লক্ষ্মীছাড়া আমার ঘরে লক্ষ্মী খাড়া
ঘর হতে খাই তাড়া, ঘর-ঘরচ নাই।
হয়েছিল হাতে ষড়ি ছাপার কাগজ পড়ি
সরস্বতী তাড়াতাড়ি, এলো বুঝি তাই?

ক'বো না মা বাড়াবাড়ি তোমার আমার ছাড়াছাড়ি
চড়ে না মা ভাতের হাঁড়ি বিড়ের কাজ নাই।
তাকু তাকু ধিনাকু ধিনাকু বাজনা বাজা রে ভাই।

Satire-এর সঙ্গে সঙ্গে একটা নাস্তিক ভাবও যেন রয়ে গেছে প্রচ্ছন্ন। কেন এমন হল? একদা যিনি কমলাকান্তের দপ্তরে “আমার দুর্গাপূজা” নিবন্ধ দিব্যদৃষ্টি-লাভ-করা-পুলক বর্ণনা করেছেন। চোখের ওপর থেকে হিরণ্ময় প্রহেলিকা সরে যাওয়ার ফলে দিব্যমন্ত্র উপলব্ধি করেছেন, তিনিই উক্ত কবিতায় কেন এ হেন আচরণে প্রবৃত্ত হলেন? প্রকৃত পক্ষে কোন লেখকের রচনা প্রায় সময়েই তাঁর ব্যক্তিত্ব তাঁর চিন্তা ভাবনার প্রতিবিম্বন। বঙ্কিমচন্দ্রের ক্ষেত্রেও এ কথাই ব্যাখ্যায় ঘটেনি। ইতিহাস পর্যবেক্ষণের দৃষ্টি, শ্রীশচন্দ্র মজুমদার এক সময় বঙ্কিমচন্দ্রের জীবন সম্বন্ধে কিছু তথ্য নথিভুক্ত করার জন্যে বঙ্কিমচন্দ্রের কাছে গেলে সাহিত্য সম্রাট বলেছিলেন, “আগে আমি নাস্তিক ছিলাম। তাহা হইতে হিন্দুধর্মে আমার মতি-গতি আশ্চর্য রকমের।” প্রথম দিককার এই নাস্তিক্য মনোভাবই তাঁর এইসব কবিতায় বর্তমান। বলা বাহুল্য যে, পরবর্তী কালে হিন্দুধর্মে মতি-গতি পরিবর্তিত হলেও কিন্তু বিদ্রূপ করা বন্ধ করেন নি। বরঞ্চ প্রয়োজনে আরো তীক্ষ্ণ বিদ্রূপ, কটাক্ষে বিদ্ধ করেছেন মেকী আবরণ। কবিতা থেকে তা গন্ত রচনাতেও সঞ্চারিত হয়েছে। বলা যেতে পারে যে, বঙ্কিমচন্দ্র বালাবস্থা থেকেই ছিলেন একজন প্রতিবাদী ব্যক্তিত্ব—একজন বিপ্লবী। পরবর্তীকালে যিনি হয়েছিলেন একজন সমাজ সংস্কারক, স্বাধীনতা আন্দোলনের অন্ততম প্রেরণা সঞ্চারক, বাল্যকালের এই সমস্ত কবিতার মধ্যেই নিহিত রয়েছে তাঁর অক্ষুরোদগমের আভাস।

তাঁর কবিতা কেবলমাত্র বিদ্রূপবর্ষাই নয়, অপূর্ব সৌন্দর্য মাধুর্য নিশ্চন্দীও। সেই সৌন্দর্য বর্ণনা, রসসৃষ্টি, রোমান্টিক চেতনা, নৈসর্গিক প্রীতি সম্বলিত কাব্য বাল্যকালের রচনাতে যেমন আছে, পরিণত পরিশীলিত রচনাতেও তাঁর সন্ধান পাওয়া যায়। এই পর্যায়ের বাল্যে রচিত ‘ললিতা’ কাব্যের কিসদংশ উদাহরণ হিসেবে উদ্ধৃত করা যাক—

“চলিল চরণে চন্দ্রবদনী
চলিয়ে চলিয়ে মধুরচরণী
উষার প্রথর তারকা ধনী
চলিতেছে গজেশ গামিনী।”

কিন্তু—

“স্তব্ধ বনে অন্ধকারে ভেসে ভেসে চারিধারে
মোহে তার হুইতনে, আপনাকে ভুলিল।

হুজনার মুখ চেয়ে হুজনাকে বুকে পেয়ে
প্রেমে আর সেই গানে এক হয়ে মিলিল ॥”

অন্য একটি কবিতার অংশ—

রাজপুরী মাঝে কি সুন্দর আছি
বসেছে বাজার রসের ঠাট ।
রমণীতে কিনে রমণীতে বেচে
লেগেছে রমণী-রূপের হাট ॥

* * * * *

নবমীর চাঁদ বর যে চন্দ্রিকা
লাখে লাখে দীপ উজলি জ্বলে ।
দোকানে দোকানে কুলবালা গণে
ঝলকে কটাক্ষ হাসিয়া চলে ॥

[আকবর সাহেবের খোশরোজ]

পরিণত বয়সের কবিতার নিদর্শন হিসেবে ‘ইন্দিরা’র অন্তর্গত একটি গানের অংশ বিশেষ উৎকলন
করি—

“ধানের ক্ষেতে ঢেউ উঠেছে
বাঁশ তলাতে জল
আয় আয় সই জল আনি গে
জল আনি গে চল ।
ঘাটটি জুড়ে গাছটি বেড়ে
ফুটল ফুলের দল ।
আয় আয় সই জল আনি গে
জল আনি গে চল ।
বিনোদ বেশে মুচকি হেসে
খুলব হাসির কল
কলসী ধ’রে গরব ক’রে
বাজিয়ে যাব মল ।
আয় আয় সই জল আনি গে
জল আনি গে চল ।”

তবে যত যাই হোক, অকপটে স্বীকার করতেই হবে যে খুব একটা উৎকৃষ্ট পদ্য তিনি রচনা করতে পারেন নি। এমন কি বন্দেমাতরম্ গানটির কাব্যিক দিক বিচারের ক্ষেত্রেও একথা সমভাবে প্রযোজ্য। বন্দেমাতরম্ গানটি খাত হওয়ার মূলে আছে আনন্দমঠের প্রেক্ষাপট। এ ছাড়া আরো একটি কথা বলা যায় যে, গীতরূপায়ণের কারণে গানটির জনপ্রিয়তার মূলে নিহিত। বন্দেমাতরম্ গানের বাণীতে যে ওজঃ শক্তি বর্তমান, বাংলা কবিতার পক্ষে তার ভার বহা সহজ সাধ্য নয় ফলতঃ কেবল কবিতার মধ্যে থেকে এর উদ্দীপ্তি-রসাস্বাদন করা সম্ভব হয় না। কিন্তু যখনই সুরে গীত হল এর মধোকার ওজঃ শক্তি তার প্রকৃত রূপ পরিষ্কৃষ্টে সমর্থ হল এবং গানটির রস গায়ক, শ্রোতা উভয়ের মধ্যেই সমভাবে ক্রিয়াশীল হতে পারল। সুরের এক মন্ত গুণ প্রবহমানতা। সেই প্রবহমানতাই কাব্যকে সংগীতে পরিণত ক'রে রসোত্তীর্ণতা প্রাপ্ত করায়।

বঙ্কিমচন্দ্র পদ্যে সবিশেষ কৃতিত্বের অধিকারী না হলেও কাব্যক্ষেত্রে তাঁর অপরিশোধনীয় অবদান আছে। সে দান বাংলা কাব্যের ধারাকে ছন্দবন্ধনের গতানুগতিকতা থেকে মুক্তি ঘটানোয়। প্রকৃত প্রস্তাবে, বঙ্কিমচন্দ্রই বাংলা গদ্য-কবিতার জনক। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ তাঁর গীতাঞ্জলির ইংরেজি অনুবাদ করার সময়, ১৯১২ সালে, বাংলা কবিতা গদ্যে লেখা যায় কি না—সে বিষয়ক চিন্তা করেছিলেন এবং ফলস্বরূপ অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘পাহাড়িয়া’ কবিতাগুলি, ‘হাওয়া বদল’, ‘আলোর ফুলকি’র মতো রচনা; কবিগুরু ‘লিপিকা’, ‘পুনশ্চ’, ‘শেষ সপ্তক’, ‘পত্রপুট’ প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থ আমরা লাভ করেছি। কিন্তু ১৯১২ সালে রবীন্দ্রনাথ যখন গদ্য কবিতার সম্ভাবনা বিষয়ে চিন্তা ভাবনা করেছিলেন, সাহিত্য সম্রাট তার অনেক আগেই (১৮৭৮ খৃঃ) গদ্যেও যে কবিতা রচনা করা যেতে পারে, সে কথা সরাসরি উত্থাপন করেছিলেন অপিচ রচনাও করেছিলেন। এ কথার সাক্ষ্য মেলে তাঁর ‘গদ্য-পদ্য বা কবিতা পুস্তকে’র ভূমিকা থেকে সেখানে তিনি লিখছেন—

“... .. এক্ষণে যে রীতি প্রচলিত আছে যে, কবিতা পদ্যেই লিখিত হইবে, তাহা সম্ভব কি না, আমার সন্দেহ আছে। আমার বিশ্বাস আছে যে, অনেক স্থানে পদ্যের অপেক্ষা গদ্য কাব্যের উপযোগী। বিষয় বিশেষের পদ্য কাব্যের উপযোগী হইতে পারে, কিন্তু অনেক স্থানে গদ্যের ব্যবহারই ভাল।”

এবং এই বক্তব্য সাপেক্ষে ‘কাব্যের গদ্যের উপযোগিতা’ প্রমাণ করতে ‘মেঘ’, ‘বৃষ্টি’, ‘খন্ডোত’ এই তিন শিরোনামায় তিনটি গদ্যকবিতা (‘গদ্যকবিতা’ নামকরণ তাঁরই করা) উদাহরণ স্বরূপ সন্নিবেশিত করেছেন। রচনাগুলি নৈসর্গিক সৌন্দর্য চেষ্টায়, রসময়তায় যথার্থই কবিতা হয়ে উঠেছে। এখানে ‘বৃষ্টি’ শীর্ষক গদ্য কবিতাটির কিয়দংশ উদ্ধৃত করা যাক—

“চল নামি—আষাঢ় আসিয়াছে—চল নামি।

আমরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৃষ্টি বিন্দু একা একজনে যুথিকাকলির

শুধু মুখ ও মুইতে পারি না—মল্লিকার ক্ষুদ্র হৃদয়
ভরিতে পারি না। কিন্তু আমরা সহস্র সহস্র, লক্ষ লক্ষ,
কোটি কোটি কণা মনে করিলে পৃথিবী ভাসাই।”
“তবে আর, ডেকে ডেকে, হেঁকে হেঁকে নবনীলকাদম্বিনী
বৃষ্টিকুল-প্রসূতি! আর মা দিম্বগুল ব্যাপিনী!
সৌরভেতঃ—সংহারিনী! এসো গগনমণ্ডল আচ্ছন্ন কর,
আমরা নামি। এসো ভগিনী, সূচাক্রহাসিনী চঞ্চলে!
বৃষ্টিকুল মুখ আলো কর। আমরা ডেকে ডেকে,
হেসে হেসে, নেচে নেচে ভুতলে নামি, তুমি বৃত্ত-মর্যভদী
বজ্র, তুমিও ডাক না—এ উৎসবে তোমার মত বাজনা কে?”

এই রকম শুধুমাত্র তিনটি গল্প কবিতাতেই নয়, তাঁর প্রায় সম্পূর্ণ রচনাবলীতেই কাব্যিক
গীতিময়তা বিদ্যমান। জীবনে জীবন যোগ, হৃদয়ে হৃদয় যোগ, রসময় চিত্তের সহমর্মীতা, মানুষকে
মানুষ জ্ঞানে বন্দনা করার সংবেদনশীলতা ইত্যাদি কবিত্বের কুললক্ষণ তাঁর রচনার দৃষ্ট হয়। তাঁর
যে কোন রচনা থেকে এর প্রতিপাত্ত উদাহরণ উৎকলন করা যেতে পারে। তাঁর জন্মে কোন
আয়াসেবই প্রয়োজন নেই রচনাবলীর যে কোন পৃষ্ঠা খুলে পাঠক দেখতে পারেন। যেমন ধরা
যাক ‘চন্দ্রশেখর’ উপন্যাসে—

“যুবতীর সঙ্গে জলের ক্রীড়া কি? তাহা আমরা বুঝি না; আমরা জল নহি। যিনি
কখন রূপ দেখিয়া গলিয়া জল হইয়াছেন, তিনিই বলিতে পারিবেন। তিনিই বলিতে পারেন কেমন
করিয়া জল কলসীত্যাগে তরঙ্গ তুলিয়া বাহুবিলম্বিত অলঙ্কারশিঞ্জিতের তালে তালে নাচে। হৃদয়োপরি
প্রথিত জলজপুষ্পের মালা দোলাইয়া সেই তালে তালে নাচে। সস্তরণ-কুতুহলী ক্ষুদ্র বিহঙ্গমটিকে
দোলাইয়া, সেই তালে তালে নাচে। যুবতীকে বেড়িয়া বেড়িয়া তাহার বাহুতে, কণ্ঠে, ক্ষেপ্ত্রে, হৃদয়ে উকি
ঝুঁকি মারিয়া, জল তরঙ্গ তুলিয়া, তালে তালে নাচে। আবার যুবতী যেমন কলসী ভাসাইয়া
দিয়া, মৃদু বায়ুর হস্তে তাহাকে সমর্পণ করিয়া, চিবুক পর্য্যন্ত জলে ডুবাইয়া বিশ্বাধরে জল স্পৃষ্ট
করে, বক্রমধ্যে তাহাকে প্রেরণ করে, সূর্যাভিমুখে প্রতিপ্রেরণ করে, জল পতন-কালে বিশ্বে বিশ্বে
শত সূর্য্য ধারণ করিয়া যুবতীকে উপহার দেয়। যুবতীর হস্ত-পদ-সঞ্চালনে জল ফোয়ারা কাটিয়া
নাচিয়া উঠে, জলেরও হিল্লোলে যুবতীর হৃদয় নৃত্য করে। হুই-ই সমান। জল চঞ্চল, এই ভুবন-
চাঞ্চল্য বিধাঙ্গিনীদিগের হৃদয়ও চঞ্চল। জলে দাগ বসে না, যুবতীর হৃদয়ে বসে কি?”

উদ্ধৃতি একটু দীর্ঘ হয়ে গেল। তা হোক, আবেগ-উচ্ছ্বাসে ইচ্ছে হয় সমগ্র রচনাবলীই একবার
আবৃত্তি করে শোনাই। এই রকম লাবণ্যময় কবিত্ব, কী উপন্যাসে কী প্রবন্ধে নিবন্ধে এই রকম
নিটোল রসময়তা, এ কবিতা ছাড়া আর কী হতে পারে?

আরো এক অর্থে বঙ্কিমচন্দ্রকে কবি অভিধায় চিহ্নিত করা যেতে পারে। সে অর্থ তাঁর ঋষিত্বে নিহিত। তিনি সত্যদ্রষ্টা। এবং সত্যদ্রষ্টা বলেই এক যুগসন্ধিক্ষণে আবির্ভূত হয়ে দেশকে, সমাজকে, ভাষাকে নব প্রগতির পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছেন। তাঁর সত্য দর্শনের মাধ্যমে, দিব্যদৃষ্টির সহযোগে, দূরদর্শী চিন্তনের দ্বারা যে সত্য উপলব্ধি করেছেন; আপনার অজের পৌরুষ, অপরিমেয় পাণ্ডিত্য তথা সর্বশক্তি দিয়ে বিশ্ববাসীর কাছে সেই মন্ত্র ঘোষণা করেছেন। যে মন্ত্র ভারতবাসীর চিত্তকে পরিশুদ্ধ করে, হৃদয়কে পরিপ্লুত করে। যে মন্ত্র মানুষ মাত্রেই অন্তর প্রকৃতিকে সক্রিয় করে তোলে। তার দায়িত্ব-কর্তব্য-বোধকে সচেতন করে তোলে। সে মন্ত্র মাতৃবোধনে পবিত্র। সে মন্ত্র মানবযুক্তি সংগ্রামে প্রেরণা সঞ্চারিণী। মনুষ্যত্বে উদ্বোধিত। ঋষি ছাড়া, মহাষ্টমীর রাত্রে, সে মহামন্ত্র কার মর্যোপলব্ধিতে আসতে পারে? কবি ছাড়া তার বাস্তব রূপদান কার পক্ষে সম্ভব। সেই বন্দেমাতরম্ মহামন্ত্রোদগাতা, দ্রষ্টা, শ্রষ্টা, প্রচারক, প্রকাশক হলেন বঙ্কিমচন্দ্র। ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র। কবি বঙ্কিমচন্দ্র ॥

সভ্যতার পরিহাস

সুধাংশু ঘোষ (ভামসেদপুর, বিহার)

মাথার উপর দিগন্ত নীল আকাশ
পায়ের নীচে ধরিত্রীর বিছানো শয্যা,
মাঝখানে অগণিত মানুষের কোলাহল,
বৃক্ষরাশি, পাহাড়-পর্বত
তটিনীর কুলু কুলু রব।
বিচিত্র পাখীর আনাগোনা,
শহর-গঞ্জ রাশি রাশি অট্টালিকা,
ছোট কুড়ে ঘর—ছেঁড়া কাঁথার ছাউনী।
কল কারখানার ঘর্ ঘর্ শব্দ,
পীচ ঢালা পথ,
জানবাহনের ছুটন্ত অভিযান।

খেটে খাওয়া মানুষের সংগ্রাম
সকলের অত্যাচারে নিপীড়িত
হর্ব্বলের দুঃসহ জীবন,
বেঁচে থাকার একি অভিলাষ!
রাজনৈতিক যুগ কাঠে শত শত
জীবনের বলি
সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ, সন্ত্রাসবাদীর বিধ্বংস অভিযান
নৃশংস মানুষের দয়্যাহীন প্রাণ।
পোষাকে ঢাকা হিংস্র উলঙ্গ মানুষের উল্লাস
অসভ্যতার উড্ডীয়মান অভিযান,
সভ্যতার একি পরিহাস।

নিশ্চিত

কুমারেশ ঘোষ

কল্যাণ আমাদের দেশের লোক। যশোরে বাড়ি। তাই তাকে ঠাট্টা করে বলতাম, ছাশের লোক।

আমার চাইতে প্রায় দশ বছরের ছোট। এক কলেজে অধ্যাপনা করে। বাংলার অধ্যাপক। বাঙ্গালীর ছেলে তো, তাই একটু-আধটু কবিতাও লেখে। ভালই লেখে। বোঝা যায়।

আর লিখলেই বিপদ। সভায় ডাক পড়ে, বক্তৃতা দিতে হয়। পনেরো মিনিটের একটা ভাষণের জন্তে প্রায় দেড়ঘণ্টা সময় নষ্ট হয়। আবার এমনও হয়, আদর করে ট্যাক্সিতে বা গাড়িতে নিয়ে যায়। ভাষণের পর শুকনো দুটো সিঙ্গাড়া আর দুটো সন্দেশ খাইয়ে, সভায় মকে গলায় পরানো মালাটা হাতে গুঁজে দিয়ে বলে, তাইতো স্তার, ট্যাক্সি গাড়ি কিছুই পাচ্ছি নে। চলুন, আপনাকে কাছেই বাস-ষ্টপটায় পৌঁছে দিই।

এসব কথা কল্যাণের মুখেই শোনা।

হেসে বলে, দাদা, কী কুক্ষণেই কবিতা লিখতে গেছলাম আর কয়েকটা পত্র পত্রিকায় বেরিয়েছিল। ব্যাস, ধরা পড়ে গেছি। এখন রবিবার এলেই ভয় হয়।

হেসে বলি, তাহলে বলো, তোমার রবিফোবিয়া হয়েছে – হাইড্রোফোবিয়ার মত।

— ঠিক বলেছেন দাদা। বেশ বলেছেন।

কথাটা কল্যাণের খুবই পছন্দ হয়েছিলো। প্রায়ই বলতো, দাদা, আমার রবিফোবিয়া সারচে তো না-ই। বরং বাড়চে।

এই কল্যাণের আর এক রোগ দেখা দিলো, স্বরভঙ্গ হলো তার। প্রথমে গলা ভাঙা, পরে গলা ধসধস। স্বর বিকৃতি। শেষে প্রায় কথা বন্ধ। এলোপ্যাথি, কবিরাজী, হোমিওপ্যাথি, অনেক রকম চিকিৎসা চললো। শেষে কফ সর্দিও।

কল্যাণকে হাসপাতালে ভর্তি করানো হলো। খবর পেয়ে হাসপাতালে দেখতে গেলাম। য়ান হেসে বিকৃত স্বরে থেমে-থেমে জানালো, দাদা, কলেজ যাওয়া বন্ধ, সভা সমিতি বন্ধ। রবিফোবিয়া সেরে গেছে আমার।

মান হেসে তাকে উৎসাহ দিয়ে বললাম, খুব ভাল। আর ভাল হয়ে গেলে শুধুই কলেজে বক্তৃতা। নো সভা-সমিতি। আর রবিফোবিয়ার ভয় থাকবে না।

বিছানায় শোয়া কল্যাণ শুনে ফিকে হাসি হাসলো সেও।

তারপর বিশেষ কাজে কলকাতার বাইরে ছিলাম বেশ কিছুদিন।

ফিরে এসে শুনলাম, কল্যাণ হাসপাতাল থেকে বাড়ী ফিরে এসেছে। অপারেশন হয়েছিলো। এখন বাড়িতেই আছে।

আরো শুনলাম, কল্যাণের গলায় নাকি ক্যান্সার হয়েছে। গলার পাশে কেটে তাতে টিউব বসানো। তাই দিয়ে লিকুইড খাওয়াতে হয়।

শুনে মনটা খুবই খারাপ হয়ে গেল। অমন হাসিখুশি মানুষটা। সত্যিই, ভগবানের মার ছনিয়ার বার।

একদিন সসংকোচে গেলাম কল্যাণকে দেখতে, তার বাড়িতে। কল্যাণের স্ত্রী সরমা আমাকে ভেতরে কল্যাণের ঘরে একটা চেয়ার টেনে বসালো তার খাটের পাশেই। পরে চলে গেল।

কল্যাণ বেশ কয়েকটা বালিশে ঠেস দিয়ে আধশোয়া হয়ে আছে। আমাকে দেখে হ' হাত জোড় করে প্রণাম জানালো। একটু হাসলো। ফ্যাকাসে হাসি।

আমি চেয়ারে বসে বেশ জোরেই বললাম, বেশ ভালই তো আছো দেখছি। আমি বাইরে ছিলাম, তাই এতদিন আসতে পারিনি।

উত্তরে কল্যাণ পাশেই রাখা খাতা-কলম নিয়ে লিখে খাতাটা আমাকে এগিয়ে দিলো। দেখলাম লিখেছে, দাদা, প্রণাম নেবেন। আমিও ভেবেছিলাম আপনি এখানে নেই। নইলে আসতেন। তবে গলার ঘা-টা শুকোতে দেরি হচ্ছে, তাই গলার পাশে নল বসিয়ে খাওয়াচ্ছে।

চোখ তুলে দেখি কল্যাণের গলার পাশে নলের একটা মুখ একটু বেরিয়ে আছে।

ততক্ষণে কল্যাণ তার বালিশের তলা থেকে একখানা ভাঁজ করা কাগজ আমার হাতে এগিয়ে দিলো। দেখি, এক ডাক্তারের প্যাডে কী সব লেখা। পড়লাম। ডাক্তারের রিপোর্ট। তাতে লেখা যা, তা হচ্ছে বায়োপসি টেস্ট করা হয়েছে। ক্যান্সারের কোন লক্ষণ পাওয়া যায়নি। সাধারণ যা। চিকিৎসায় সেরে যাবে।

যাক, নিশ্চিন্ত হলাম।

হেসে বললাম, বাঃ, এতো খুব ভাল খবর।

ঠিক সেই সময় সরমা ঘরে ঢুকলো, হাতে ট্রে-তে আমার জন্যে চা-বিস্কুট আর একটা বাটিতে সাদা বালির মত কিছু কল্যাণের জন্যে।

সরমা টেবিলে আমার চা-বিস্কুট নামিয়ে রেখে বললো, খান। এখন ওকে খাওয়াতে হবে।

দেখলাম, সরমা একটা কাঁচের ফানেল ঐ নলের মুখে লাগালো। পরে একটা বড় চামচে দিয়ে বাটি থেকে ঐ তরল খাদ্য আস্তে আস্তে ঢালতে লাগলো তাতে।

আমি অবাক হয়ে দেখতে লাগলাম। বীভৎস দৃশ্য। কল্যাণ বেশ নিশ্চিন্ত। বোধহয় এই ধরনের খাদ্য গ্রহণে অভ্যস্ত হয়েছে সে। আর কয়েকদিন বাদে যা শুকালে আবার নিজের হাতে খাওয়া, কলেক্স খাওয়া।

কিন্তু ঐ কাণ্ড দেখে আমার মুখে চা উঠলো না। সংকোচ বোধ হলো।

সরমা হয়তো বুঝতে পারলো।

বললো, চা-টা খান ততক্ষণ।

কল্যাণের ঐ মর্যাস্তিক খাওয়া শেষ হলে বললাম, আচ্ছা ভাই কল্যাণ, আজ উঠি। আবার পরে আসবো। যাক, তোমার অসুখটা ঋাপ নয় দেখে নিশ্চিন্ত হলাম।

কল্যাণ হাত দেখিয়ে আমাকে দাঁড়াতে বলে আবার খাতায় লিখে আমাকে দিলো। পড়লাম দাদা, আমিও নিশ্চিন্ত। আবার আসবেন। প্রণাম।

বেরিয়ে এলাম ঘর থেকে।

সরমা কল্যাণকে খাইয়ে একটু আগেই বেরিয়ে গেছলো ঘর থেকে। দেখি বাড়ির সদর দরজার কাছে দাঁড়িয়ে।

আমাকে প্রণাম করে সজল চোখে নীচু গলায় বললো, দাদা, ওঁকে আর বাঁচানো যাবে না বুঝি। এখন ভগবানই ভরসা। সত্যিই ঐ রোগ। তবে যাতে ভর না পান, তাই বুদ্ধি পরামর্শ করে আমার বড় ছেলে নির্মল এক ডাক্তারের কাছ থেকে ঐ মিথো রিপোর্ট করিয়ে এনেচে।

শুনে চমকে উঠলাম। তাহলে সত্যিই ওর ক্যান্সার। ওঠা মিথো রিপোর্ট। তাই অত নিশ্চিন্ত।

আমার বুকে পাথর চেপে বসলো।

মুখটা ঘুরিয়ে বললাম, আচ্ছা চলি।

তিনটি টিল ও ভালবাসা

এ সারাক

অর্জুনের মতই বেশ কিছুক্ষণ লক্ষ্যস্থির করে নেয় অনীশ। তারপর প্রচণ্ড জোরে-টিল ছুড়ল ঝুলন্ত আমটিকে লক্ষ্য করে।

অনীশ অর্জুনের মত লক্ষ্যভেদী নয়। তবু টিলটা হাতে নিয়ে একটু কসরৎ করে নেয় সে। লোফাতে লোফাতে আচমকা টিলটা বেরিয়ে যায় অনীশের হাত থেকে।

সিমির বোধগম্য হবার আগেই টিলটা তীর বেগে ছুটে চলে।

সিমি হাঁ। এমনটি সে চায়নি। প্রেমে বাজী ধরার তীব্র বিরোধী সে। গাছের আম গাছেই থাক! তাদের ভালবাসা একান্ত তাদের। টিল ও আমের সঙ্গে তাদের ভালবাসার স্থায়ীত্বের কি সম্পর্ক?

অর্জুন বাজী ধরেনি। বাজী ধরেছিল জোপদী! অনীশের ব্যাপারটাই ভিন্ন। বেড়াতে বেরিয়ে তিনটি টিল তুলে নিয়ে একটা ঝুলন্ত আমকে লক্ষ্য করে বলল—অনীশ, সিমি ভাগ্য পরীক্ষা করবো আমি।

—কি রকম? ব্যাপারটা তখনও হাক্কা ভিয়েনে ভিজানো। সিমি ভাগ্য মানে না, তার ভালবাসার উপর জুয়া! অসহ.....

তুমি আমার কি না, দেখতে চাই!

—ওমা, একি কথা গো! আমি তো তোমার-ই!

—আমটিকে লক্ষ্যভেদ করে দেখা যাক। তিনটি টিলে আমটিকে লক্ষ্যভেদ করতে পারলেই, তুমি আমার।

—আর! লক্ষ্য ভেদ না হলে, আমি তোমার নয়?

আমটিকে লক্ষ্য করতে করতে মুখের পেশী শক্ত হয়ে উঠল, চীৎকার করে উঠল অনীশ—
তিনটি টিলেই লক্ষ্যভেদ হবে, লক্ষ্যভেদ হবে না—মানে?

প্রচণ্ড জোরে টিলটা ছুড়ে দিল অনীশ।

বাগানে গরুর পাল, দুই রাখাল হাঁ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তারা টিল দেখছে না, সিমিকে, কে জানে। সিমি বোবা। সিমি লক্ষ্য করল—টিলটি ঘূর্ণির মত ঘুরতে ঘুরতে আমের পাশ দিয়ে পেরিয়ে গেল। আমটিকে স্পর্শ করল না।

অনীশের ব্যর্থতার উল্লাসে—রাখাল ছেলে দুটি হেসে উঠল হাততালি দিয়ে।

অনীশ যেন পাথর। ওর হাত পা, দেহের ভিতরে পেশীগুলো শক্ত হয়ে উঠছে। আমটিকে বোটা ছাড়ার নেশায় ফুসে উঠল। সহজে হার স্বীকারে সে নারাজ। অনীশ বড় জেদী। দ্বিতীয় টিলটি তুলে নিল সে।

জোণাচার্য্যের প্রশ্নের সে উত্তর দেয় মনে মনে—গুরুদেব, গাছের আম ছাড়া আর কিছুই দেখছি না। এমনকি পাশে দণ্ডায়মান সিমিও নজরের বাইরে।

অনীশ এমন খেলা খেলবে সিমি ভাবতে পারেনি। বৈকালে সিমি অনীশকে ডেকে নিয়ে এসেছে বেড়াবো বলে। আম বাগানে বসে গল্প করার বাসনানিষে। গাছের ঝুলন্ত আমটি দেখে অনীশের মাথায় ভূত চাপলো নাকি ?

সিমি লক্ষ্য করছে—অনীশের চোখ মুখের আকৃতিটাই বদলে যাচ্ছে। পাওয়া—না পাওয়ার খেলার মেতে উঠছে। ধৈর্য্য হারায় সিমি। জড়িয়ে ধরে অনীশকে ক্রান্ত করতে চায়। আত্মঘাতী লড়াইয়ের মহদান থেকে ফেবাতে চায় তাকে। বোঝাতে শুরু করে—অনীশ, তুমি একি করছ ? আমি'ত তোমারই ! আমাদের মিলনে তো কোন বাধা নেই। আমাদের বিয়েতে সকলেইত রাজী।

—অনীশের নিঃশ্বাস ভারি হয়। ধীর কণ্ঠে বলে,—সিমি যা সহজেই হাতে আসে, তা সহজেই হারিয়ে যায়।

—তাহলে, তুমি কি আমাদের প্রেমে প্রতিবন্ধকতা আশা করছিলে ? প্রতিবন্ধকতা এলেই বুঝি ভাল হতো ?

—সিমি, ভাল মন্দ সবই ভবিতবোর ফল। যে জিনিষ কঠোর সংগ্রামের ভেতরে হাতে আসে, সে জিনিষ প্রাপ্তির আনন্দই অলদা। দ্বিতীয় টিলটা ছুড়ে দেখি না ! লক্ষ্যভেদ আমার হবে কি না ?

সিমি এর মর্ম মূলে আঘাত হানে। —বেশ তুমি টিল ছুড়লে, এটাও যদি বার্থ হয় ? তাহলে তুমি……

অনীশ চীৎকার করে উঠে—, চাপা পড়ে যায় সিমির শেষের কথা—কখনও না। আমি বার্থ হতে পারি না। আমাদের ভালবাসাতে তো কোন খাঁদ নেই।

—আমাদের ভালবাসার উপর তোমার শ্রদ্ধা থাকলে, জুয়ার ঘুটি তুলে নিচ্ছ কেন ? ফেলে দাও টিল। আমি তো তোমার ?

—জানি তো ! তবু ভাগ্য পরীক্ষাতে আপত্তি কেন ?

—অনীশ তুমি কি সুরাকা হলে ?

—সুরাকা ! সে কে ?

—তুমি চিনবে না। মক্কার অধিবাসী। মস্ত তীরন্দাজ। রহিম মাষ্টারের কাছে সুরাকার কাহিনী শুনেছিলাম। যে কোন অভিযানে যাবার আগে সুরাকা, ইয়া কিংবা না বাচক তীর ছুড়ে (টস করার মত) ভাগ্য যাচাই করে নেয়। তীর ইয়া বাচক হলে সে ঝাপিয়ে পড়তো অভিযানে। না বাচক হলে পিছিয়ে যেতো। হজরত মহম্মদকে হত্যা করতে যাবার আগে সে তীর ছুড়ে ভাগ্য যাচাই করেছিল। তার তীর “না” বাচক হওয়ায়, হজরত মহম্মদকে হাতের নাগালের মধ্যে পেয়েও সে হত্যা করেনি।

—অনীশ বলল, আমি টিল ছুঁড়ে দেখিনা। আমাদের প্রেম ইয়া বাচক কিনা।

—অনীশ আমি যে তোমাকে আত্মসমর্পণ করে বসে আছি। তোমাকে ছাড়া যে আমি বাঁচতে পারবো না। অনীশ, তুমি ছেলমানুষী করো না। ফেলে দাও টিল। আমাকে নিয়ে জুয়া খেলো না।

—সিমি তুমি এটাকে জুয়া বলছ কেন? শুধু শুধু ভয় পাচ্ছে। তুমি যে আমার হবে, আমার জগৎ নির্ধারিত, তাকে আমার কাছ থেকে সরিয়ে নেবার সাধ্য কার! তুমি আমার কি না, সেটা দেখে নিতে এত আপত্তি কেন?

—আপত্তির যথেষ্ট কারণ আছে অনীশ। এটা অন্ধ-কুসংস্কার।

—সিমি ভাগ্য আর কুসংস্কার এক নয়। আমি স্রেফ ভাগ্য পরীক্ষা করছি। তুমি কি ভাগ্য বিশ্বাস কর না?

জেদি হয়ে উঠল সিমি। —না আমি ভাগ্য মানি না। টিল ফেলে দাও। সিমি টেনে ধরে অনীশকে।

—অনীশ নিজেই মুক্ত করেই শা করে দ্বিতীয় টিল ছুঁড়ে দেয়। তাজ্জব ব্যাপার। বেশ কয়েক জোড়া চোখ, টিলের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ছুটেতে শুরু করে। আশা-নিরাশার স্পন্দন। টিলের সঙ্গে পাখা মেলে। ঝিমিয়ে পড়া সূর্যেরও চোখ বিস্করিত হয়। টিল প্রচণ্ড বেগে আমার পাশ দিয়ে, মানে স্মৃতি পরিমান দূরত্ব রেখে পেরিয়ে যায় ডালপালা স্পর্শ করে। সশব্দে পড়ে গরুর পালের ভিতর। দুটি গরু লেজ তুলে দৌড় মারে, গাছের পাখী ডানা ঝট-পট করে ওপরে উড়ে যায়। সিমি বসে পড়ে ধপ করে মাটিতে। হতাশা ঘিরে ধরে। রাখাল বালকরা হেসে উঠে হাততালি দিয়ে।

আমবাগানের পাশেই রেল লাইন। সামনে ধান ক্ষেত। একটা গুডস্ ট্রেন পেরিয়ে যাচ্ছে তে-তালের শব্দ তুলে। প্রতিদিন ঠিক এই সময় গুডস্ ট্রেনটি পার হয়। ওরা চার চোখে গাড়ী দেখতে দেখতে, স্বপ্ন মাখানো মনকে ছুটিয়ে দিয়েছে রেল লাইনের উপর দিয়ে কতদিন।

সেদিন অনীশ গাড়ী দেখতে দেখতে বলেছিল তোমাকে নিয়ে ট্রেনে চড়ে অনেক দূর চলে যাবো। হারিয়ে যাবো! যাবে সিমি?

—আরে, আগে বিয়েটা হোক।

—তখন পালানোতে মজা নেই, তখন লোকে বলবে, অনীশ বৌ নিয়ে বেড়াতে গেছে। এখন গেলে কি বলবে বলতো? অনীশ সিমিকে নিয়ে ভেগেছে। কত আলোড়ন উঠবে ঘরে বাইরে। ছুটাছুটি চলবে, খানা পুলিশ হবে। বিয়ের পর তো এসব হয় না।

গাড়ী চলে যায় চোখের আড়ালে, মিলিয়ে যায় শব্দ। গাড়ী দেখে আগের মত সহজ সরল, ত্বকের উপর সর পরার মত চিন্তা আজ আর নেই।

দ্বিতীয় টিলের ব্যর্থতার অনীশ হয়ে উঠে মানুষ। তার মুখের উপর ঘন কালো মেঘের স্তূপ।
আমটির উপর হিংস্র হয়ে ওঠে সে, তার চোখের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হয়।

হাউ মাউ করে কেঁদে ওঠে সিমি।

অনীশের দৃষ্টিতে তো এখন আম ছাড়া আর কিছুই নেই। রাখাল, গরুর পাল, সিমি, বাগান,
আকাশ সব হওয়া, তার চোখে এখন অর্জুনের দৃষ্টি। পাখীর চোখের মতই অনীশের চোখের
সামনে আমটি শুধু হলছে ঘড়ির দোলকের মত।

অনীশ তৃতীয় টিল লোফাতে শুরু করে। টান টান হয়ে উঠছে তার মেরুদণ্ড।

তৃতীয় টিল শা করে বেরিয়ে গেল তার হাত থেকে।

সিমি ছ'হাতে মুখ ঢেকে বসে পড়ল হাই গোর্ডে। মাথার খোপা খুলে গেল, বসে পড়ল
শাড়ীর আঁচল।

না, সে চোখ মেলে কিছু দেখছে না।

তৃতীয় টিলে আম পড়ে গেল। আনন্দে চীৎকার করে উঠল অনীশ,—সিমি আম পড়েছে।
সিমি আমি জিতেছি; উঠ, ঐ দেখ আমটা পড়ে আছে,—বিজয়ী আমি।

আশ্চর্য, রাখাল বালক ছোটো এবার হাততালি দিল না। খিল খিল করে হাসল না। ভয়ে
ভয়ে তারা ইল্লজিৎ পতনের মতই আমটিকে দেখতে লাগল।

অনীশ সিমিকে হাত ধরে টেনে তুলল—সিমি ঐ দেখ আম, আমি জিতেছি।

সিমি তড়াক উঠে দাঁড়িয়ে শাড়ীর আঁচল শক্ত করে জড়িয়ে নেয় কোমরে। এলো হুল বেঁধে নেয়
গোছ করে। সরাসরি অনীশের চোখে চোখ রাখে। গভীর গলার স্বর। অনীশ, আমটা
যদি না পড়তো?

—তুমি তো আমার, মানে আমার কণ্ঠে নির্ধারিত। পড়বে না মানে!

—যদি না পড়তো, তুমি কি করত। তীক্ষ্ণ হয়ে উঠে সিমির গলা।

—আম পড়তে বাধা। কারণ তুমি আমার ভাগ্যের ফসল।

—অনীশ, তোমার ভাগ্যগননা ভুল হয়েছে। আমটি পড়েছে, তাই তুমি ছুটে এসেছ আমার
কাছে। আম না পড়লে আমার রক্তাক্ত দেহটা হয়তো তাকিয়েও দেখতে না। —তাই না অনীশ?

তোমার জেদ আমাকে সঠিক পথের সন্ধান দিয়েছে অনীশ। এখন থেকে তোমার আমার পথ
সম্পূর্ণ ভিন্ন।

মনে রেখো—ভালবাসা কখনও সত্য মানে না।

হন হন করে হেঁটে গেল সিমি।

স্বামী-শিষ্য সংবাদ

সান্তোষ কুমার দে

সম্প্রতি Sister Nivedita Foundation for Advancement of Learning নামক একটি মহান উদ্দেশ্য প্রণোদিত প্রতিষ্ঠান থেকে প্রকাশিত, ডঃ অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত 'ভগিনী নিবেদিতা' নামে একখানি উচ্চাঙ্গের সংক্ষিপ্ত জীবনীগ্রন্থ উপহার পেয়ে বিশেষ আগ্রহের সঙ্গে পড়লাম। মাত্র ৩৪ পৃষ্ঠা কলেবরের মধ্যেও ভগিনী নিবেদিতার 'সংক্ষিপ্ত জীবন কথা' এবং 'নিবেদিতা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ' এই দুইটি বিভাগে আশ্চর্যজনক দক্ষতায় সেই মহান জীবনীর এমন সুসম্পূর্ণ পরিচয়—যে দেওয়া সম্ভব হয়েছে তার জন্য আমরা গ্রন্থকার ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে ঋণী। মাত্র পাঁচ টাকা দামে এমন পরিচ্ছন্ন মুদ্রণ ও কুচিশীল প্রকাশনার জন্যও আমরা নিবেদিতা ফাউন্ডেশানের কর্তৃপক্ষকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাই।

এই নিটোল মুক্তার মতো আকর্ষণীয় সংক্ষিপ্ত জীবনীগ্রন্থখানি পড়তে পড়তে বার বার যে বইখানির কথা মনে পড়ছিল তা হল ভগিনী নিবেদিতার রচিত The Master As I Saw Him. প্রায় ৬০ বছর আগে বইখানি আমি কিনেছিলাম এবং নানা সময় নানা প্রসঙ্গে বইখানি নান্দা চাড়া করেছি। তাতে মনে হয়েছে, তাঁর গুরু স্বামী বিবেকানন্দের প্রসঙ্গ বলছেন যিনি তাঁর কিছু পরিচয়ও তার মধ্যে হতে স্বতস্ফূর্ত ভাবে প্রতিভাত হয়েছে। স্বামীজির জীবনী এবং অতুলনীয় কর্মকাণ্ডের বিষয়ে বিপুল সাহিত্য রচিত হয়েছে তবু ভগিনী নিবেদিতার অতি অন্তরঙ্গ আলোচনার স্বামীজিকে যত নিবিড় ভাবে পাওয়া যায় তেমন বুঝি আর কোথাও পাই না। স্বামীজির গুরুভাইয়েরা তাঁকে নিঃসন্দেহে নিবেদিতার থেকেও বেশিদিন খুবই নিকট থেকে দেখেছেন, তাঁর সাধক জীবনেরও তাঁরা অধিকতর অন্তরঙ্গ সঙ্গী ছিলেন তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু যে শ্রদ্ধা ও সুগভীর নিষ্ঠার সঙ্গে নিবেদিতা তাঁর গুরুর ব্যক্তি পরিচয় ব্যক্ত করেছেন তারও বুঝি তুলনা নেই।

মৃত্যু সম্বন্ধে, আধ্যাত্মিক সাধনা সম্বন্ধে, এমন কি লৌকিক আচার আচরণের বিষয়েও স্বামীজির যে সব অভিমত নিবেদিতার লেখায় বিধৃত আছে তা স্বামীজিকে জানবার চিনবার পক্ষে অশেষ সহায়তা করেছে। নেহাৎ ছাত্রজীবনের অতি উৎসাহে বইটি পড়ে সে সব গভীর তত্ত্বকথার কিছুই বুঝতে পারিনি। সেখানেও মনে লেগে আছে স্বামীজির স্নেহময় পিতৃহৃদয়ের পরিচয়। তাঁর তিরোধানের ঠিক আগের সপ্তাহের ঘটনা। নিবেদিতা তখনও বাগবাজারেই থাকেন। স্বামীজি তাঁকে বেলুড়ে গিয়ে প্রসাদ পাওয়ার আমন্ত্রণ জানিয়েছেন, এবং তিনি গেলে নিজে কাছে বসে তাঁকে

খাইয়েছেন। আহা—কাঁঠালের বীজ এবং আলু ভাতে ভাত আর শীতল দুধ। পরম পরিতৃপ্তির সঙ্গে তাতেই উদরপূর্তি করলেন নিবেদিতা। বলা বাহুল্য, হাত দিয়ে ভাত মেখেই খেয়েছেন তিনি। যেভাবে আমরা সচরাচর খাই। আঁচাবার সময় স্বামীজি নিজে তাঁর হাতে জল ঢেলে হাত ধুইয়ে দিলেন, এমন কি নিজে নিবেদিতার হাত গামছায় মুছে দিলেন।

নিবেদিতাও গুরুর কাছে এতটা সমাদর কোনদিন পান নি। তিনি সংকুচিত হয়ে বললেন, যে কাজ আপনার সেবায় আমি করতে পেলে ধন্য হই আপনি সে কাজ আমার জ্ঞাত করছেন কেন?

উত্তরে হাসি মুখে স্বামীজি জবাব দিয়েছিলেন,—কেন, যীশু কি তাঁর শিষ্যদের পা পর্যন্ত নিজে ধুয়ে দেন নি?

নিবেদিতার মনে পড়ল, যীশু তাঁর শিষ্যদের পা ধুইয়ে দিয়েছিলেন তাঁর পরলোক গমনের আগে। শিষ্যদের শেষ আশীর্বাদ জানাবার জ্ঞাত। স্বামীজিও কি—? প্রশ্নটা মনে এলেও তিনি মুখে উচ্চারণ করতে পারলেন না। স্বামীজিও যে যীশুর মতোই, জেনে শুনেই, চলে যাবার আগে শেষবারের মত তাঁর অপার স্নেহের পাত্রীকে নিজ হাতে পরিচর্যা করে গেলেন? সেই অতি সামান্য ঘটনার বিবরণটিও নিবেদিতা কতো নিপুণভাবে বর্ণনা করেছেন তাঁর স্মৃতিচারণায়, নিজের নাম একবারও উচ্চারণ না করে।

ঠাকুর নিজে যাঁকে দেখা মাত্র অপার শক্তিধর যোগবিভূতি সম্পন্ন মহাপুরুষ বলে চিনতে পেরেছিলেন, সেই বিকেকানন্দ ইচ্ছা করে নিষিদ্ধ খাদ্য খেয়ে এলেও ঠাকুর বলেছিলেন, তাতে তাঁর নরেনের কোনই ক্ষতি হবে না। তিনি কিন্তু দেবদর্শনের আগে উপবাস পালন। স্নানাস্তে পবিত্র শুদ্ধাচারে মন্দিরে প্রবেশ প্রভৃতি সমস্ত পালন করতেন। স্বামীজির অমরনাথ গুহার জ্যোতির্লিঙ্গ দর্শন এবং কাশ্মীরে ক্ষীরভবানী মন্দিরে গমনের বর্ণনা প্রসঙ্গে কঠোর নিষ্ঠাত্বের-প্রতিটি আচরণ প্রতিপালন নিবেদিতা তাঁর স্মৃতিচারণায় উল্লেখ করেছেন। আর স্বামীজির নানা উপদেশ ও আধ্যাত্মিক উপলক্ষের কথাও কি কম নৈপুণ্যের সঙ্গে আলোচনা করেছেন—যার জ্ঞাত ওই স্মৃতিচারণ অগোনে ধর্মগ্রন্থের রূপ গ্রহণ করেছে। স্বামীজির স্বরূপ তাতে ভাস্বর হয়ে উঠেছে।

গিরিবালা মহিলা নিবাস

ছাত্রী ও কর্মরতা মহিলাদের

আবাসিক ব্যবস্থা আছে।

ফোন : ৪৭৫-৮১৭২

গ্রাম্য জীবনে সিনেমার প্রভাব

সুনীল কুমার দে (সিংভূম)

বর্তমান সমাজে দিন প্রতিদিন আজ যে অপরাধের সংখ্যা বাড়ছে, মানুষ অবক্ষয়ের পথে নেমে চলেছে নৈতিক পতন ঘটেছে মূল্যবোধের হ্রাস পাচ্ছে, লুট পাট, ধর্ষণ হত্যা, আত্মহত্যা, প্রভৃতি হিংসাত্মক ঘটনা ঘটেছে, অশ্লীষ আচার আচরণ বৃদ্ধি পাচ্ছে এরকম বেকার সমস্যা, নোংরা রাজনীতি, শিক্ষানীতি সমাজ ব্যবস্থা, ও প্রশাসনের সাথে সাথে বর্তমান সিনেমাও কম দায়ী নয়। সিনেমার উপর দোষারোপ শুনে হয়তো সিনেমা প্রেমী বন্ধুরা বিশেষ করে বর্তমান যুগের কিশোর-কিশোরী যুবক যুবতীও তথাকথিত আধুনিক ব্যক্তিত্ব আমার উপর তেলে বেগুন ছলে উঠবেন ও কোমর বেঁধে তর্ক যুদ্ধে অবতীর্ণ হবেন। আমি কিন্তু তর্ক করতেও চাই না এবং কারো মনে আঘাত দিতেও চাই না কেবলমাত্র নগ্ন সত্যকে সবার সামনে তুলে ধরতে চাই। সত্য কঠোর ও কুট হয় তাই অনেক সময় প্রাণে লাগে কিন্তু সত্যকে অস্বীকার করা যায় না। আজ শিশু, কিশোর, যুবক এমন কি বয়স্ক লোক পর্যন্ত সবাই সিনেমার ভক্ত তা শহরের হোক বা গ্রামের হোক। মানুষের পোশাক-পরিচ্ছদ, চাল-চলন, আচার-ব্যবহার কথাবার্তা, রীতিনীতি সবই যেন পালটে দিয়েছে সিনেমা। আজ ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের মুখে ভজন বা ভক্তিগীতি, দেশাত্মবোধক বা লোকগীতি প্রায়ই শোনা যায় না, কিন্তু সিনেমার গান যা সবার সামনে গাওয়া চলে না তাও শোনা যায় আজ। মা বাবার কাছে যদি সেই সব গানের অর্থ ছেলেমেয়েরা জিজ্ঞেস করে বসে তাহলে মা-বাবাকে নীরবে মাথা নীচু করে দিতে হয়। আমি বলছি না যে বর্তমান নোংরা পরিবেশ পরিস্থিতির জন্য কেবলমাত্র সিনেমাই দায়ী, তবে আজকের সিনেমারও বিশেষ ভূমিকা আছে একথা স্বীকার করতেই হবে। আমার কথা শুনে শ্রোতা বন্ধুরা মনে করবেন বক্তা মহাশয় ঘোর সিনেমা বিরোধী কিংবা মানধাতা আমলের লোক কিন্তু না—ভালো সিনেমার বিরোধী আমি মোটেই নই। কারণ সিনেমা বর্তমান যুগে জীবনদর্শন প্রচারের সব থেকে বড় মাধ্যম কিন্তু অশ্লীল সিনেমা যার দ্বারা মানুষের চরিত্রের হনন হয়, মানুষের মূল্যবোধের হ্রাস হয়। নৈতিক পতন হয় সে সব সিনেমা না দেখানো উচিত না তৈরী করা উচিত। আসলে সিনেমা সম্পূর্ণ রূপে ব্যবসায়িক না করে শিক্ষাপ্রদ ও সুন্দর করা উচিত যা এক সাথে মা বাবা ভাই বোন সবাই মিলে বসে যেন দেখতে পারা যায়। বর্তমান সিনেমার এমনও দৃশ্য দেখানো হয় যা ছেলেমেয়েদের নিয়ে দেখা যায় না। হয়তো মা বাবা কিংবা বড়দের উঠে যেতে হয় কিংবা টিভি কালো করে দিতে হয় কিংবা চোখ বন্ধ করে দিতে হয়। এই সব নোংরা দৃশ্য বড়দের খুব প্রভাবিত না করলেও স্নকমোল শিশু

কিশোর ও যুবা মনে খুবই খারাপ ছাপ ফেলে তাই সিনেমা শুধু মাত্র মনোরঞ্জনের সাধনই যেন না হয় নৈতিক শিক্ষার ও চরিত্র গঠনের মাধ্যমও যেন হয়।

এবার মূল পাঠে আসি। আমার আলোচ্য বিষয়টা হলো গ্রামা জীবনে সিনেমার প্রভাব। প্রভাব বলতে ভালো ও মন্দ দুই আছে। তবে বর্তমান সিনেমার প্রভাব মন্দেরই নামাস্তর। শহরে তো সিনেমার প্রভাব কি তা সংবাদপত্র খুললেই জানতে পারবো। প্রথমতঃ শহরে প্রায় ঘরে ঘরে টিভি শোভা পাচ্ছে তার উপর যাবুগায় যাবুগায় মেলা সিনেমা হল স্তূতরাং সিনেমা দেখতে অসুবিধে নেই। দেওয়ালে দেওয়ালে এমন সব অশ্লীল পোষ্টার লাগানো থাকে যা চোখ মেলে দেখা যায় না। বেশীর ভাগ সিনেমাতে 'এ' লেখা থাকে অর্থাৎ বয়স্কদের জন্য বা সম্পূর্ণ অশ্লীলতার ভরা কিন্তু দুঃখের বিষয় 'এ' সিনেমা বয়স্করা বেশী দেখে না, কিশোর কিশোরী ও যুবক যুবতীরাই বেশী দেখে। এই সব অশ্লীল সিনেমা আজ প্রচণ্ডভাবে বিলাসিতা করছে সারা যুব সমাজকে। আজ যে সমাজে অনাচার ভ্রষ্টাচার খুন ধর্ষণ ইত্যাদি আত্মহত্যা। জলের মতো হচ্ছে, মানুষ হিন্দুটে ও কামুক হয়ে উঠছে এইসব অশ্লীল সিনেমাই নিঃসন্দেহে দায়ী। শহরের এই দূষিত হাওয়া আজ গ্রামের দিকেও বয়ে চলেছে ও ধীরে ধীরে গ্রামের শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সুস্থ পরিবেশকে নষ্ট করে চলেছে। আজ প্রায় প্রতিটি গ্রামেই বৈজ্ঞানিক লাইন গেছে। যার ফলে প্রতিটি গ্রামেই প্রায় হু / চারটে করে টিভিও শোভা পাচ্ছে। টিভিতে এখন এমন কোন দিন নেই যে দিন সিনেমা দেখানো হয় না তার উপর সপ্তাহকাপি চিত্রাহার চিত্রমালা ও রঙ্গোলীক ছড়াছড়ি। এছাড়াও আছে জি.টিভি এম.টিভি ও ষ্টার টিভির অসংখ্য অশ্লীল কার্যক্রম। গ্রামের মানুষদের সিনেমা দেখার জন্য আর শহরে ছুটেতে হয় না। এখন টিভিই মনোরঞ্জনের প্রধান কেন্দ্র হয়ে দাঁড়িয়েছে। টিভির অসংখ্য ভালো প্রোগ্রাম প্রায় কেউ দেখে না কিন্তু সিনেমা ও চিত্রাহার দেখতে কেউ বাদ দেয় না। যার প্রভাব আজ আমাদের সামনে হাতে নাতে।

সিনেমা আজ গ্রামের শিক্ষাকে নষ্ট করে দিয়েছে। আমরা জানি যখন সিনেমা ও টিভির প্রচার গ্রামে ছিলো না তখন গ্রামে লেখাপড়ার একটা সুন্দর পরিবেশ ছিলো। ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে লেখাপড়া করার, নতুন কিছু জানার একটা সুস্থ মানসিকতা ছিলো, ভালো ভাবে পাশ করার, ভালো ফল করার, ভালো মানুষ হওয়ার, শিক্ষিত হয়ে চাকরী বাকরী করে উন্নতি করার একটা স্বপ্ন ছিলো, আশা ছিলো অথচ আগেকার দিনে ছাত্র-ছাত্রীদের আর্থিক অবস্থা খুবই দমনীয় ও শোচনীয় ছিলো। ঠিকভাবে বই খাতা পেতো না, পোষাক পরিচ্ছদ পেতো না, এমন কি ভালো করে খাবারও পেতো না। বাড়ীতে কাজও করতে হতো সাথে সাথে পড়াশোনাও করতে হতো কিন্তু হলে কি হয় শিক্ষা গ্রহণ করার প্রবল ইচ্ছা ছিলো, প্রতিযোগিতার ভাবনা ছিলো, অধ্যয়ন অধ্যবসায় ছিলো। কিন্তু আজ ছাত্রছাত্রীদের সব কিছু সুযোগ সুবিধে থাকা সত্ত্বেও কিন্তু লেখাপড়া করার মানসিকতা নেই, জানার আগ্রহ নেই অধ্যয়ন ও অধ্যবসায় নেই। বলতে গেলে কি আজ লেখাপড়ার মহলই শেষ হয়ে গেছে।

আজকের ছাত্র-ছাত্রীরা খাওয়া, পরা ও ক্যাশন নিয়েই মশগুল তাও আবার সিনেমার নায়ক-নায়িকাদের অঙ্ক অনুকরণে। বলতে বড় লজ্জা হচ্ছে যে অনেক ছেলে মেয়ে নিজেদের পাঠ্য পুস্তকগুলোর নাম পর্যন্ত জানেনা, কতগুলো বিষয় তাও অজানা কিন্তু কোন সিনেমার কে অভিনেতা, কে অভিনেত্রী এবং কি কি গান আছে তা পাঁচ বছরের শিশু পর্যন্ত গড় গড় করে বলে দেবে। আজকাল গ্রামের ছেলেমেয়েরাও স্কুলে যেত না যেতেই প্রেমপত্র লিখতে শুরু করে অশ্লীল সিনেমার বই পড়ে; চাকু ভুজালি দেখায়, সিগারেট, বিড়ি ও মদ খেয়ে বাহাদুরীর পরিচয় দেয় এসব করার প্রকৃতি কিন্তু নিঃসন্দেহে আজকের সিনেমাই যোগান দিচ্ছে। এইভাবে সিনেমা আজ গ্রামের শিক্ষাকে নষ্ট করে দিয়ে সুন্দর পরিবেশকে বিধ্বস্ত করছে।

তারপর চরিত্রের উপরও হাত লাগিয়ে দিচ্ছে সিনেমা। আসলে শিক্ষাই যেখানে শেষ হয়ে গেছে সেখানে চরিত্র থাকবে কি করে? বর্তমান শিক্ষানীতি এমনতেই ক্রটিপূর্ণ যেখানে না নৈতিক শিক্ষার সূচী আছে না চরিত্র গঠনের কথা আছে। কিন্তু তবু পরিবেশ ভালো হলে, অভিভাবক ও মা বাবা ভালো হলে ও সমাজ থাকলে ছেলেমেয়েরাও কিছু ভালো হয়। সাধারণতঃ দেখা যায়, যে লেখাপড়াতে ভালো তার চরিত্রও ভালো। আজ কিন্তু ভালো পরিবেশ ও শিক্ষার মহলকে নোংরা করে দিচ্ছে আজকের সিনেমা তাই গ্রামের ছেলে মেয়েরাও আজ নৈতিকহীনতার শিকারগ্রস্থ। নেশা, ঘোঁরাচোর, হিংসা, প্রভৃতি অমানবীয় প্রবৃত্তিগুলো তাদের চরিত্রকে কেড়ে নিচ্ছে যার ফলে গ্রামেও আজ প্রেম প্রসঙ্গ নিয়ে হত্যা, আত্মহত্যার ঘটনা ঘটছে, নোম গুলির আওয়াজ শোনা যাচ্ছে।

গ্রাম্য সংস্কৃতির উপরও প্রচণ্ডভাবে প্রভাব ফেলেছে সিনেমা। আগেকার দিনে গ্রামে একটা সুন্দর পরিবেশ ছিলো, সংস্কৃতি প্রাণবন্ত ছিলো, গ্রামে একটা বিশেষ আকর্ষণ ছিলো যে কোন পূজা, উৎসব অনুষ্ঠানে, বিয়ে শ্রাদ্ধ অন্নপ্রাশনে হয় ভক্তি সংগীত না হয় কীর্তন, না হয় পল্লীগীতি না হয় ষাড়া নাটকের সুর বাজতো কিন্তু আজ, গ্রামে তা বাজে না। হলুধনি, শঙ্খধনি বাজনা পল্লীগীতি, লোকগীতি প্রায় বন্ধের মুখে। আজ প্রতিটি উৎসব অনুষ্ঠানে শুধু অশ্লীল সিনেমা গান বাজে আর কিছু নয়। গানের না থাকে ভালো অর্থ না থাকে ভালো সুর। পূজো হচ্ছে তাও সিনেমা গান বাজছে, মানুষ মরেছে শ্রাদ্ধ হচ্ছে তাও সিনেমা গান বাজছে, বিয়ে ও বার্তা ডে হচ্ছে তাও সিনেমারই গান বাজছে। সত্যি! গ্রামের যে একটা আধ্যাত্মিক পরিবেশ ও সাংস্কৃতিক পরিবেশ ছিলো বর্তমান সিনেমা তা চিবিয়ে খেতে বসেছে। আজ গ্রামে ষাড়া নাটক পালাগান, হরিনাম সংকীর্তন ডুবাং নাচ, কাঠি নাচ ছোঁনাচ প্রভৃতি লোক উৎসবে লোক হয় না। হুঁসু সংগীত, বাদনা নীতি, সড়বহল গীত প্রভৃতিকেও ধীরে ধীরে ভুলতে বসেছে। টিভির সিনেমা ছেড়ে কেউ লোক উৎসবে যোগ দেয় না। ফলে ধীরে ধীরে গ্রামে লোক সংস্কৃতি ও লোক উৎসবগুলো মৃত্যুর

গ্রহর গুনতে বসেছে! প্রাচীন সংস্কৃতি, সংগীত, শিল্প কলার উপরও বিশেষ প্রভাব ফেলেছে এই সিনেমা। ধীরে ধীরে এইসব প্রায় অবলুপ্তির পথে। নূতন প্রজন্ম ও যুবক যুবতীরা আজকাল যাত্রা নাটক ড্রামা করতে, কীর্তন পদাবলী পালাগান গাইতে, ডুবাং কাঠিনাচ ছোঁনাচ করতে লজ্জা পায়। এগুলোকে ছেড়ে দিয়ে পুজো উৎসবে বিয়েতে মদ খেয়ে ত্রেকড্যান্স করে, অশ্লীল আচার আচরণ করে, অশ্লীল পোষাক পরিচ্ছদ পরে ঘুরে বেড়ায় যা কিন্তু সবই সিনেমার অবদান। মেয়েরাও আজ সন্ধ্যাদীপ দিতে, ঘোমটা দিয়ে শাড়ী পরতে লজ্জা পায়। মেকি আধুনিকতা ও ফ্যাশনের বশ্য এনে সিনেমা গ্রামের মেয়েদের লজ্জা, বিনয়, সরলতা, পবিত্রতা, ভক্তিভাব প্রভৃতি মানবিক মূল্যবোধগুলোকে নীরবে ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

অনেকেই বলবেন, আরে মশায় সিনেমা গ্রামের মানুষকে আধুনিক করেছে, গতিশীল করেছে, জাত ধর্ম ভাষার গভীকে ভেঙে দিয়েছে, চালাক চতুর করে দিয়েছে সবাইকে। আধুনিকতা কিন্তু অশ্লীলতা নয়। আধুনিকতা অর্থে অবাধ যৌনাচার নয়, পারিবারিক মধুর সম্বন্ধগুলোকে ভেঙে দেওয়া নয়, অশ্লীল আচার আচরণ নয়, নগ্ন পোষাক পরিধান করা নয়, মা বাবা, ভাই বোন একসাথে বসে মদ খেয়ে কুর্তি করা নয়, ভাই বোন, স্বামী-স্ত্রী মা বাবার পবিত্র সম্বন্ধগুলোকে নষ্ট করে দেওয়া নয়, চরিত্রের গলা টিপে দেওয়া নয়, মানবিক মূল্যবোধগুলোকে ক্ষতম করে দেওয়া নয়, আধুনিকতা হলো নির্মলতা। কলুষ মুক্ত হয়ে সকল সংকীর্ণতার উর্ধে যাওয়ার নামই হলো আধুনিকতা। নিজেদের প্রসার করার নামই হলো আধুনিকতা। যদি আধুনিক হতে গিয়ে চরিত্রকে হারাতে হয় মানবিক মূল্যবোধগুলোকে হারাতে হয়, মনুষ্যত্বকে হারাতে হয়, মানবতা ও নৈতিকতাকে হারাতে হয়, পশুর স্বরে নেমে যেতে হয় তবে সেটা আধুনিকতা নয়, অসভ্যতা।

তবে সিনেমা যে গ্রামের মানুষকে কিছুই দেয়নি এমন কথা নয়। দেশ বিদেশের সাহিত্য, সংস্কৃতি সংগীত কলা সম্বন্ধে জ্ঞান, মহাপুরুষদের সম্বন্ধে জ্ঞান দর্শনীয় স্থান সম্বন্ধে জ্ঞান হয়েছে সিনেমার মাধ্যমে যা সত্যি গ্রামের বেশীর ভাগ মানুষের পক্ষে। জানা বা দেখা অসম্ভব ব্যপার ছিলো। এছাড়াও জাতপাত ছুয়াছুয়ত অস্পৃশ্যতা অন্ধ বিশ্বাস হ্রাসকরণেও কিছু ভালো ছাপ ফেলেছে সিনেমা। পণপ্রথা হ্রাসকরণ, আন্তর্জাতীয় বিবাহ জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ, নেশা থেকে পরিজ্ঞান পাওয়ার প্রেরণাও যুগিয়েছে। নারী শিক্ষা ও নারী মুক্তির আওরাজ ও গ্রামের মানুষকে দিয়েছে সিনেমা স্মৃতরাং সিনেমার কিছু ভালো দিকও আছে তবে ভালো সিনেমার। সেজন্য আগেই আমি বলেছি ভালো সিনেমার বিরোধী আমি নই। তবে বর্তমান যুগে যেসব সিনেমা তৈরী হচ্ছে প্রায় সবই মুখতঃ সেক্স ও হিংসার উপর আধারিত যার কুপ্রভাব শহরে ও গ্রামে প্রচণ্ডভাবে পড়েছে বা এখনও পড়েছে যার সত্তর প্রতিবন্দ লাগানো উচিত তবেই গ্রাম ও শহর দুই বাঁচবে।

চার বন্ধু

(রহস্যময় নয় - ঘটনা মাত্র)

ডাঃ রামচন্দ্র গুপ্ত

সে আজ অনেক দিনের কথা তখন ইংরাজরা ভারতে রাজত্ব করছে। এই সময় বহু বাঙ্গালী বিশেষ করে যারা অবস্থাপন্ন তাদের ছেলেদের ইংল্যান্ডে পাঠাতেন উচ্চ শিক্ষা লাভের জন্য।

সেই সময় লণ্ডনের এক বিখ্যাত রেষ্টোরাঁয় সুরেশ, মানবেন্দ্র ও অজিতেন্দ্র প্রায়ই খাওয়া দাওয়া করতো আর চুটিয়ে আড্ডা দিত। একদিন তারা রেষ্টোরাঁতে বসে আড্ডা দিচ্ছে কুমার নামে আর এক বন্ধু তাদের সঙ্গে এসে যোগ দেয়।

সুরেশ লণ্ডনে অনেকদিন এসেছে পড়াশুনা শেষ করে একটি কলেজে প্রফেসরী করে, মানবেন্দ্র পড়াশুনা করে ও একটি সংস্থায় কাজও করে, অজিতেন্দ্র লণ্ডনে অল্পদিন এসেছে—সে এনথ্রপলজিতে ডক্টরেট করছে আর কুমার এসেছে ক্রিমিনোলজিতে গবেষণা করতে। এই কুমারকে নিয়ে বন্ধুমহল হাসাহাসি করতো—তাকে যেমন ফরসা দেখতে—তেমনি নাহুস নুহুস সকলে বলতো কুমারকে তুই এই চেহারা নিয়ে ক্রিমিনোলজিতে দাঁড়াতে পারবি? আসলে সে যে শক্তিমান সুরেশ তা দেখেছিল কোন একটি ঘটনার মাধ্যমে। সেইজন্য সুরেশ কোনদিন কুমারকে নিয়ে বাঙ্গ করেনি।

চারবন্ধুর মধ্যে মানবেন্দ্র ও অজিতেন্দ্রের মধ্যে খুবই বন্ধুত্ব—এরা থাকেও প্রায় কাছাকাছি। দরকার অদরকারে উভয়ে উভয়ের বাড়ী যাতায়াত করে। আড্ডাও মারে কাজ না থাকলে। এরা চার বন্ধুর কেউই বিয়ে করেনি—যখন তখন ফুরসৎ পেলেই গাড়ী নিয়ে বেড়াতে বেরোত। সুরেশও কুমারের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলে।

অজিতেন্দ্রকে মাঝে মাঝে গবেষণার জন্য সহরের বাহিরে যেতে হয় সেই সময় মানবেন্দ্র তার বাড়ী দেখাশুনা করে—এইভাবে বন্ধু বান্ধব ও গবেষণা নিয়ে অজিতেন্দ্রের সময় বেশ ভাল ভাবে কেটে যাচ্ছিল—হঠাৎ একদিনের ঘটনা—সকালে বাড়ীতে তাল দিবে গবেষণার জন্য সকাল সকাল বেড়িয়ে যায় - ফিরতে হয় সন্ধ্যা—বাড়ীর দরজা খুলে দেখে সামনের ঘরে এক মেমসাহেব মরে পড়ে আছে। অজিতেন্দ্র খুব ভয় পেয়ে যায়—ভেবেই পার না দরজা বন্ধ থাকা সত্ত্বেও মেম সাহেব ভিতরে ঢুকলো কেমন করে। ঘরের দরজায় তাল দিবে অজিতেন্দ্র ছোট্ট মানবেন্দ্রের বাড়ী। মানবেন্দ্রকে তার বিপদের কথা বলে—আরও বলে আমি ভেবে পাচ্ছি না কেমন করে মেমসাহেব ঘরের ভিতরে ঢুকলো। বাড়ী তাল দেওয়া থাকা সত্ত্বেও। মানবেন্দ্র অজিতেন্দ্রের

কথা শুনে বললো এখন যেন পুলিশে জানাস না—আগে সুরেশ ও কুমারকে খবর দে। তাদের পরামর্শ নেওয়া দরকার। অজিতেন্দ্র ও মানবেন্দ্র দুজনেই সুরেশ ও কুমারকে টেলিফোনে চলে আসবার জন্য অনুরোধ করলো। সুরেশ ও কুমার আধ ঘণ্টার ভিতর এসে হাজির। কুমার এসেই জিজ্ঞাসা করলো পুলিশে খবর দেওয়া হয়েছে কিনা ?

অজিতেন্দ্র বললো আমি প্রায় এক ঘণ্টা আগে কলেজ থেকে বাড়ী ফিরে ঘরের দরজা খুলে এই অবস্থা দেখে প্রথমে মানবেন্দ্রকে ও তারপর তোমাদের খবর দিয়েছি—আমি আশ্চর্য্য হয়েছি, ঘরের দরজা বন্ধ থাকা সত্ত্বেও এমনটি হ'ল কি করে। আমি ভেবে পাচ্ছি না আমি এখন কি করবো। তোরাই আমাকে এই বিপদ থেকে উদ্ধার কর।

কুমার বললো আমরা বিদেশে বাঙ্গালী—আমাদের কথা সাদা চামড়াওয়ালারা বিশ্বাস করবে না। এসেই অজিতেন্দ্রকে নিয়ে টানাটানি করবে। এখন আমাকে একটু সময় দাও ভাবতে।

প্রথমেই অজিতেন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করি—তার সঙ্গে এই মেমসাহেবের বনিষ্ঠতা ছিল কিনা? আগে কোনদিন কোথাও দেখেছে কিনা? অজিতেন্দ্রের বাড়ীতে কারা কারা বেড়াতে আসে—কেউ বাড়ীতে দিনে বা রাত্রে থাকে কিনা ?

অজিতেন্দ্রের উত্তর—

১) আমি বিদেশভূঁয়ে আসা অবধি সময় পাইনি কোন মেমসাহেবের সঙ্গে বন্ধুত্ব করবার অফিসে যে সব মেমসাহেবের সঙ্গে পরিচয় আছে তারাও গবেষণা নিয়ে ব্যস্ত। মেমসাহেবদের সঙ্গে মেলামেশার কোন প্রশ্নই ওঠে না।

২) মৃত মেমসাহেবটিকে আগে কোন জায়গায় দেখার কোন সুযোগই হয় নাই।

৩) আমার বাড়ীতে মানবেন্দ্র ছাড়া আর কেউ কোনদিন বেড়াতে আসে নি। আমি মাঝে দশ দিন বাড়ীতে ছিলাম না মানবেন্দ্র আমার বাড়ীতে থাকতো আমি ফিরে আসার পর মানবেন্দ্র কোনদিন আমার কাছে আসে নি।

মানবেন্দ্রকে প্রশ্ন কুমারের

১) মানবেন্দ্র অজিতেন্দ্রের অনুপস্থিতিতে তোমার সঙ্গে কেউ অজিতেন্দ্রের বাড়ী দেখা করতে আসতো ?

মানবেন্দ্র ভাবতেই পারে নি কুমার এমনভাবে তাকে প্রশ্ন করবে। সে খুবই আশ্চর্য্য হয়ে গেলো—মানবেন্দ্র কুমারের কথায় কোন সঠিকভাবে জবাব দিতে পারলো না—আমতা আমতা করতে লাগলো।

তখন কুমার বলতে আরম্ভ করলো—মানবেন্দ্র তুমি আমাদের বন্ধু—যদি কোন অস্ত্র কলঙ্ক করে থাক বিদেশ ভূঁইএ তুমি যাতে কোন বিপদে না পর তা আমাদের দেখতে হবে।

তুমি সত্যি কথাই বল—তার আগে কিছুটা তোমাকে ধরিয়ে দিচ্ছি। তুমি বিষে করো নি। সাধারণতঃ বিদেশে তুমি নানাভাবে প্রলোভিত। তুমি ঐ মেমটিকে নিয়ে নিজের বাড়ীতে না গিয়ে আসতে মান্নে মাঝে অজিতেন্দ্র বাড়ী—অজিতেন্দ্র সকাল সকাল কলেজে বেড়িয়ে যায়, আর আসে সন্ধ্যায়। এই বাড়ীতে মেমসাহেবকে নিয়ে স্ফূর্তি করতে—আর মেমসাহেবের চাহিদা মেটাতে। যেদিন মেমসাহেব মারা যায় সেদিন মেমসাহেবের চাহিদা অনেক বেশী ছিল—যারজন্য বচসা হয়। তুমি হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে মেমসাহেবের মাথায় আঘাত করো—ফলে মেম সাহেবের মৃত্যু হয়।

স্বদেশ জিজ্ঞাসা করলো কুমার তুমি তো এত বললে কিন্তু বললে না তো মানবেন্দ্র বাড়ীতে ঢুকলো কেমন করে বাড়ী তো তালা দেওয়া থাকতো! কুমার বললো, এতো সহজ কথা—অজিতেন্দ্র বাড়ী যখন ছিল না মানবেন্দ্র বাড়ী দেখা শোনা করতো সেই সময় মানবেন্দ্র ডুপ্লিকেট চাবি করে রেখেছিল। এই ডুপ্লিকেট চাবির দ্বারায় মানবেন্দ্র তার মেমসাহেবকে নিয়ে আসতো।

মানবেন্দ্র কিতাবে এতগুলি কথা জবাব দেবে ভেবে পার না মানবেন্দ্র কেঁদে ফেলে—সে তার বন্ধুদের কাছে নিজেকে সঁপে দেয়—বলে তোরা আমাকে যা মনে করিস করতে পারিস তোরা যখন আমার তোদের বন্ধু বলে গ্রহণ করেছিস—। এখন বুঝতে পারছি আমি কত অন্যায় করেছি। এবার অন্য দুই বন্ধু অজিতেন্দ্র ও স্বদেশ কথা শুরু করলো—কুমারকে জিজ্ঞাসা করলো এখন বলো তোমার কি উপদেশ এই ব্যাপারে।

কুমার অনেক চিন্তার পর বললো—আমাদের সকলেরই গাড়ী আছে—আজ রাত্রে মধ্যাহ্নে মানবেন্দ্র তার গাড়ীতে করে মেমসাহেবের মৃতদেহ নিয়ে যাবে আমরা তার আগে পিছু তাকে ধাওয়া করবো যাতে এখানকার পুলিশ কোন সন্দেহ না করে। আমরা এমন ভাবে যাব যেন আমরা পরস্পর পরস্পরকে চিনি না। এমনি ভাবে আমরা শহর ছাড়িয়ে বহুদূরে নির্জন জায়গায় নদীর ত্রোতের মুখে মেমসাহেবকে ভাসিয়ে দেব—মানবেন্দ্র কাজটা করেই প্রথম প্লেনেই হয় জার্মানী না হয় ফ্রান্স চলে যাবে আর আমরা যে যার কাজে যোগ দেব। এই হল সমাধান। সকলেই একমত—কথামত কাজ করে যে যার ব্যবস্থা মত কর্মস্থলে চলে গেল। মানবেন্দ্র প্লেনে জার্মানীতে তার ভাই-এর কাছে চলে গেল—সেখান থেকে অফিসে ফোন করলো ভাই এর স্ত্রীর অনুস্থতার জন্য হঠাৎ জার্মানী চলে এসেছে—এক সপ্তাহের ছুটি মঞ্জুর করা হোক। ছুটি কাটিয়ে অফিসে যোগ দিয়ে মানবেন্দ্র শুনলো মিস্ টিভেনসন বেশ কদিন অফিসে আসছেন না। বাড়ীতে লোক পাঠান হয়েছিল—বাড়ীতে তিনি নাই, বোধহয় কোথাও চলে গেছেন। মানবেন্দ্রের গা দিয়ে থাম ঝড়তে লাগলো।

স্মৃতি তর্পণ

সুনীল কুমার ঘোষ (বীরভূম)

চিঠি লিখতে বসে উদ্বেলিত হৃদয়টা মাঝে মাঝে কেঁপে উঠছিল ভবেশের। বার বার পথরোধ করে দাঁড়াচ্ছে বিকাশের প্রেরিত চিঠির অংশটা—‘মীনাকে সুখী করার জন্য তার অনুমতিতে গোপনে তোমার গৃহত্যাগ করে আসার পর ওকে বিয়ে করেছি। মীনা এখন আমার কারখানার অর্ধেক অংশের কাগজে কলমে আইনসঙ্গত অধিকারিণী। কয়েক কোটি টাকা তার হাতের মুঠোর। অতীত স্ত্রীর স্মৃতি ভুলে, আমাদের—ক্ষমা ক’রো।’

—চিঠির এই অংশটা মনে পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই সমস্ত শরীর মন এক ধরনের অবশ অসারতার ঢেকে যেতে চাইল ভবেশের। মীনা ভবেশকে ত্যাগ করে চলে যাওয়ার পর তিন বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। এর মধ্যে বহু কৈফিয়তের ঝড় তাকে নানা ভাবে ব্যতিব্যস্ত করেছে। কিন্তু তাও ধীরে ধীরে নিস্তরঙ্গ শিথিলতার ক্রমে ক্রমে থেমে গিয়েছে। অশান্ত হৃদয়ের ঝড় এখনো যে ভবেশের রক্তে মাংসে গড়া দেহের সীমানায়, হৃদয়ের দরজায় আঘাত হানে না তা নয়, তবে তা—স্ফীর্ণ প্রায়। নিজের সহ সীমার মধ্যেই নিজের ব্যক্তিগত শীতল সম্পত্তির ভাঙাচুরো অংশের মতোই প্রায় নিশ্চল। পত্রটা আসার পর আবার প্রায় নিভে যাওয়া অগ্নির বিস্ফোরণ শুরু হল—সুপ্ত আত্মশুদ্ধির জীবন্ত বিভীষিকার তাণ্ডব জুড়ে দিল। বেশ একরকম চলছিল জীবনটা, আবার এ এক অকারণ ঝড়ের আপটায় জীবন স্তরীটা অকুল সমুদ্রে ডুবিয়ে দেওয়ার প্ররোচনার মতোই—বিকাশ ও মীনার ভবেশের প্রতি সক্রিয় সদস্ত হুঁশিয়ারী ও বাস্তবের কণাঘাত! অতীত স্ত্রীর স্মৃতিকে ভুলে যেতে বলেছে বিকাশ। ভবেশ তো ভুলে যেতেই চেয়েছিল। সব জেনেও তো সে নির্বাক নিশ্চল হয়ে মেনে নিয়েছিল মীনার ব্যক্তিগত ক্ষুধার উচ্ছ্বাসময় উত্তেজনাকর ইচ্ছাকে। ভবেশ তো চেয়েছিল অতীতের সব কিছুই তার নিজস্ব হয়ে থাক। বিকাশ ও মীনার জীবন পরিবার যেন কোনদিনই—ভবেশের উপস্থিতি না থাকে। তবুও ওরা বোধহয় ভবেশকে আঘাতই দিতে চায়—হৃদয়ের গভীর ক্ষতে আঘাতের পর আঘাত দিয়ে শালীনতাহীন নির্মমতার নিজেদের জৈবিক ক্ষুধা তথা আত্মতৃপ্তির স্পৃহাকে জাগিয়ে রাখার কোণলমাত্র। হৃদয়ের অসারতা ঢাকতে উত্তেজনার আগুনকে জ্বিঁয়ে রাখার এটাই বোধহয় মীনা ও বিকাশের পক্ষে সর্বশেষ জাগিয়ে রাখা প্রয়োজনভিত্তিক যোগানের একমাত্র হাতিয়ার। ভবেশের ক্ষত-বিক্ষত হৃদয়ের উপর বিকাশের এ চিঠি কাটা ঘায়ে নুনের ছিটের মতোই। অবশ্য এ আঘাতের চেয়ে অনেক বড় আঘাতই মীনা দিয়েছে—ভবেশের সরলতার সুযোগ নিয়ে বিশ্বাসভাঙ্গিনীর ভূমিকায় নারিকার অভিনয়ের মধ্য দিয়ে।

ভালবাসায় কোন মনগড়া অছিল বা ভগ্নামির স্থান ছিল না ভবেশের। ভবেশ সত্যি ভালবেসেছিল মীনাকে এবং—আজও ভালবাসে।

কিছুক্ষণ ভাবাবিষ্টের মতো কেটে যাওয়ার পর চিঠিটা যেন আবার ভাবিয়ে তুলল ভবেশকে—মীনা কি সত্যিই স্মৃতি হতে পেরেছে? যদিও বিকাশ চিঠির সর্বত্র মীনার স্মৃতিরই এক মুক্ত মহাকাশ তার সামনে এগিয়ে দিয়েছে! তারা তো আসতে পারতো? মীনা কি পথভ্রষ্টা পথিকের মতো নিরুপায় হয়ে তার ভুলের মাসুল দিতে নিরুপায় মাথা কুটে মরছে? ক্ষতি করা বা ঝামেলা অশাস্তির ইচ্ছা থাকলে ভবেশ যে অনায়াসেই সে স্মৃষণ নিতে পারতো, তা' তো বিকাশ বা মীনার অজানা নয়! বিকাশ জানতো—ভবেশ নিরুপায় নয়, মীনাকে সত্যিই ভালবাসে। মীনা তাকে প্রয়োজনের খেলনার মতো ফেলে চলে এলেও মীনার শাস্তির স্বপ্নে ব্যাঘাত ঘটে ভেঙে চূরমার হয়ে থাক, তা—কখনো চাইবে না ভবেশ! মনের এই জোর, এই বিশ্বাসের অমোঘতা নিয়েই বিকাশ মীনার দেহলতাকে নিজের দেহের আঙিনার ভোগের পসরা সাজাতে কুণ্ঠাবোধ করে নাই। বিকাশ বিশ্বাস করতো, মীনার বিশ্বগ্রাসী জৈবিক ও সম্পদের ক্ষুধা ভবেশ যেমন মেটাতে অক্ষম, তেমনিই অক্ষম বালির বাঁধ দিয়ে মীনার মানসিকতাকে তার জীবনে আটকে রাখা। এককালের অকৃত্রিম বন্ধু ভবেশ যেমন বিকাশের সমস্ত দুর্বলতা শক্তির সঠিক পরিচয় জানতো, তেমনি জানতো—বিকাশ ভবেশেরও পরিচয়! তবুও বন্ধুত্বের সীমানা পেরিয়ে জীবনের যে স্বতন্ত্রগতি জীবনের সমস্ত কিছুকে নিয়ন্ত্রিত করে আলাদা খাতে বইয়ে দেয়—বাস্তব জীবনে দুই বন্ধুর গতিশীল জীবনের পার্থক্যটা দেখিয়ে দিল দুই বন্ধুকেই—মীনা! এখানে প্রয়োজন ভাগ ও তিতিক্ষার যে আমরণ সংগ্রাম আবহমান কাল ধরে চলছে—ব্যত্যয় ঘটল না ত্রিভুজ জীবনের আকর্ষণ বিকর্ষণের মধ্যেও!

নানা এলোমেলো চিন্তার ঝড়ে ভবেশের মনের দরজার খুলে গেল সবচেয়ে স্বর্ণীয় একটি রাতের অতীত স্মৃতির ঘোমটা—ফুলশয্যার রাত। দু'বছরের অবাধ মেলামেশা, মন দেওয়া নেওয়ার বিশ্বাস দৃঢ় হলে বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ স্বীকৃতির ছাড়পত্র পাওয়া শিক্ষিতা মীনা ধরা দিয়েছিল ভবেশের জীবনে পরিণীতা বধুরূপে। ফুলশয্যার স্নসজ্জিতা মীনার একটা হাত ধরে ভবেশ বলেছিল—আমাদের এই অভাবের সংসারে, কি দিয়ে তোমাকে স্মৃতি করবো জানিনা, তবু—তোমার মধ্যে সব অভাবের অবসান হোক।

অবগুণ্ঠনবতী সলজ্জা মীনা ঘোমটা একটু শিথিল করে দৃষ্টিটা ভবেশের মুখের উপর ছড়িয়ে দিয়ে মুহূ হেসে বলেছিল,—অজাব দেখেই এসেছি, অভাব সব কিছু কেড়ে নিতে পারে না; তোমার আমার সম্পর্কটা অভাবের বাইরেই।

—হয়তো তাই, তবু বাস্তব জীবন বড় কঠোর, বড় নির্মম; অভাবই তার সবচেয়ে বড় হাতিয়ার! এর হাতের খেলার মানুষ অমানুষ হয়, আবার অমানুষও শ্রেষ্ঠ মানুষে রূপান্তরিত হয়!

— এই অভাবই মানুষকে চেনার সুযোগ দেয়, অভাবই মানুষকে পরিপূর্ণতার উপযোগী করে তোলে; অভাব থাকে বলে উত্তরোত্তর সত্য ও শ্রেষ্ঠতার দিকে এগিয়ে যাওয়া যায়; আমাদের জীবনকে এগিয়ে নিয়ে যাবো—আনন্দ-শান্তি-শ্রেষ্ঠত্বলাভের দিকেই!

বিস্ময়মাখা দৃষ্টিতে সেদিন তাকিয়েছিল ভবেশ নববিবাহিতা অনন্যাসুন্দরী বধূর অপাপবিদ্ধ মুখের দিকে। ভবেশের যা কিছু সন্দেহ ও হর্বলতা যেন মীনা ফুলশয্যার রাতেই মুক্তি দিয়ে দিতে সক্ষম হল। গভীর আবেগে সেদিন ভবেশের কোলে নিজের দেহটা এলিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্তে পরম প্রাপ্তির তৃপ্তির শ্বাস নিয়েছিল মীনা। সে সময় মীনার মনোজগতে তার বহুদিনের সুখের নীড় বাঁধার স্বপ্ন বৃষ্টি সার্থক হতে চলেছে, এই ভরসার ছিল ভরপুর।

তারপর কেটে গিয়েছে দু' ছোটো বছর। হিসেবের খতিয়ানে আকর্ষণ বিকর্ষণের ঠেলাগাড়িতে জীবনটা ক্রমশঃ বোঝার মতো মনে হয়েছিল মীনার। মীনার সীমাহীন আকাঙ্ক্ষা—পাওয়া না পাওয়ার মূর্তিমন্ত ঋতিকা প্রয়োজনের পরিবেশ ক্রমশঃ ঘোরালো করে তুলছিল। ভবেশ তখন ঝড় তুফানে একাকী নৌকার কাণ্ডারী হিসেবে এ পরিস্থিতির মোকাবিলা ও আত্মরক্ষার জগু হাতিয়ারের অভাব দেখেছিল—একটা স্থূল মাষ্টারি তার একমাত্র পাথর! ঠিক এই সময়েই আবির্ভূত হল বিকাশ। ঝড় তুফানে মস্তুর মস্তাদাতা তথা জ্বালা রূপে। মীনার রূপের আগুন বিকাশকে মাঝে মাঝে ঝলসে দিত। মীনার গোপন ইচ্ছার গোপনীয়তার অংশগ্রহণ করার যোগ্যতা দেখালো যৌবনদীপ্ত বিকাশ—মীনার প্রয়োজনসর্বস্ব দেহমনের দুজ্জের বহুস্তর চাবিকাঠি বিকাশের হাতের মুঠোয় এসে গেল। ভবেশ সবই বুঝতে পেরেছিল। ঘর শত্রু বিভীষণের রূপ নিয়ে বন্ধু বিকাশ অব্যাহত দ্বারে তার সংসার সীমার লোভের লেলিহান শিখার মীনাকে গ্রাস করল। ভবেশ জানলেও পরিস্থিতি অন্তরিক্তে মোড় নিয়েছে। ভবেশ মীনার দৃষ্টিতে তখন অপাত্তেয়—অক্ষম একটি সাধারণ যুবক মাত্র! ভবেশের অসহায়ত্বের সুযোগ রক্তে রক্তে নিয়েছিল বিকাশ। মীনা যেভাবে সর্বসমক্ষে লজ্জার শেষতম পর্যায়ে পৌঁছে দিয়ে সুখ ও শান্তির নীড় গড়ার স্বপ্ন নিয়ে বিকাশের অকলঙ্কী হয়েচে, তাতে, পারিপার্শ্বিক সমাজ যাই বলুক যাই বুঝুক, বিকাশ মীনার অন্তরের প্রজ্জ্বলিত দীপশিখার—ভবেশ, একটি কাপুরুষ, ক্রীবত্বই তার সহজ পরিচয়! ঐশ্বর্যের চূড়ান্তে বসে বিকাশের মনোরঞ্জন তথা মীনার যৌবনের প্রাপ্তি পরম্পরা পরিপূর্ণতার শপথ—ভবেশের নিতান্ত আটপোড়ে জীবনকে শুধু তাকিলাই করে নাই, জীবনের মূল্যবোধকে হু'পায়ে ছেঁটে মীনা দেখিয়ে দিয়েছে, অক্ষমতা কাপুরুষের বিলাসিতা মাত্র—জীবনকে জীবনের মতোই পেতে হয়! এই হিসেবে অভাবের কাঠগোড়ায় দাঁড়িয়ে আজও ভবেশ—নির্বোধ! তবুও এই অভাবের মতোই ভবেশ চেয়েছিল শান্তির নীড় গড়তে, প্রকৃত বাঁচার তৃপ্তি কাণায় কাণায় ভরিয়ে দিতে।

দু'বছরের বিবাহিত জীবনের হতভাগ্য ভবেশ মীনার প্রতি ভালবাসার কুপলতা বা অভিনয়ের দ্বারা ভুলিয়ে রাখার অপচেষ্টা করে নাই। কিন্তু মীনা চেয়েছিল, সবকিছুর উর্দে কখনোই যৌবনের আভা / শারদীয়া সংখ্যা—১৩২

পরিপূর্ণ নিকাশ, সম্পদের দৃষ্টিভিত্তিই যার ভরসা, পরিপূর্ণতার চাবিকাঠি ; যা চলে গেলে আর ফেরানো যায় না, অতিক্রান্ত সময়ের পথ ধরে যৌবন এসে দেহমনকে আর জোয়ারের রঙে রাঙিয়ে দিতে পারে না ; পারে হয়তো. তবে তা'—অলীক স্বপ্নের রাজত্বে বাস্তবের চূড়ান্তসীমানায় নির্বোধের ছেঁড়া কাঁথার স্তরে দিবাস্বপ্নের মতোই ! তাই একদিন অসহিষ্ণু মীনা দাম্পত্য জীবনের ইতিটানার মাস দুয়েক আগে ভবেশকে বলেছিল, এসব খুঁটিনাটি ব্যাপারে নাক গলানো তোমার এক্তিয়ারের বাইরে বলেই মনে করি, যা করতে চাই আর করতে চলেছি, তা' স্মৃতি পাওনা বলেই মনে প্রাণে বিশ্বাস করি ।

ভবুও শাস্তকণ্ঠেই ভবেশ বলেছিল, এভাবে বিকাশের সঙ্গে মিশলে স্বামী-স্ত্রীর পবিত্র সম্পর্কটা যে শেষ পর্যন্ত—

মীনা সদন্তে জবাব দিয়েছিল এ কথার,—যে স্বামী দাসীর মতো খাটিয়ে নিয়ে হ' মূঠো অন্ন স্ত্রীর মুখে গুঁজে দিয়ে দায়িত্ব পালন করা বোঝে—সে স্বামী স্ত্রীর দেহের পবিত্রতার প্রশ্ন তোলে !

—মীনা ! আঁতকে উঠেছিল স্ত্রীর কথায় ভবেশ । এভাবে উলঙ্গ উত্তর সে আশা করে নাই । কিছুক্ষণের মধ্যেই ব্যঙ্গের হাসি ছড়িয়ে মীনা বলেছিল,

—বহুদিন তোমার এক্তিয়ারে কাটালাম, বিকাশবাবুর সঙ্গে একটু আধটু মিশে দেওয়া নেওয়ার হিসেবটা খতিয়ে দেখতে চাই !

—এত নীচে নামতে পারবে তা যে আমি—

—জীবনের শত শত প্রয়োজনের কতটুকু মিটিয়েছো, শুধু দেহটা নিয়েই টানাটানি করেছো, এর বেশী কিছু কি—

—আর্থিক অনটনের কথা জেনেও—

—বড় চাকরি পাবে ! হুঁটো বছর তো আর্থিক অনটনের দোহাই দিয়ে কাটল, এখন নতুন কিছু বাতলাও !

—শেষ পর্যন্ত—

—সামাজিকতার ভয় দেখাচ্ছে ? মুখে জুতো মেরে এখনো সম্পর্কটা চুকিয়ে ফেলিনি এটা তোমার সৌভাগ্য !

—ভোগের মধ্যে জীবনের কথাটাই শুধু ভাবলে, এরপরে—

—ভাগ, পবিত্রতা—নীতিকথা ! যেদিন যৌবনের প্রকৃত মর্যাদা দিতে পারবে সেদিন ভেবে দেখবো, শুধু সতীপনা দিয়ে জীবনটাকে তিলে তিলে শেষ করে জঘন্য জীবন নিয়ে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে বাঁচতে চাই না—চাইবো না !

—মীনা !

—প্রয়োজনে ওর সঙ্গে সবকিছুর বিনিময়েই ভেসে যেতে চাই—দেখতে না পারলে চোখ বুজে থেকো! কাপুরুষের এর থেকে বেশী চাওয়ার বা পাওয়ার অধিকার থাকতে পারে না!

আজও কথাগুলো ভবেশের কানে যেন স্পষ্ট ভেসে আসে। লজ্জা ঘৃণার মিলিত স্রোত কোন অজানা দিগন্তে ভাসিয়ে নিয়ে চলে। অব্যক্ত বেদনার ভারে মন্থর দেহমনের বোঝায় সে চায় একটু আশ্রয়, একটু বিশ্রাম। কিন্তু কোথায় সেই আশ্রয়? এখানেই সে যেন বেশ অসহায়—আশ্রয়হীন, স্থবিরতায় বধির!

নিষ্ঠুর সত্য হলেও সত্য সত্যই মীনা বিকাশের বাহুবন্ধনে ভোগের জোয়ারে ভেসে গেল! গভীর রাতের গাঢ় অন্ধকারে বিকাশের হাত ধরে মীনা কুলত্যাগিনী হ'ল ভবেশের সংসার হতে—বিকাশের কারখানার কাছাকাছি সুরমা অটালিকায় বিকাশের অঙ্কশাষিনী হতে! আইনের মার প্যাচ চুকিয়ে ডিভোর্স ও বিয়ে রেজিস্ট্রিভুক্ত হল—একরকম একতরফাতেই।

ভাটিয়ালি সুরে ভবেশের জীবন ভাটার টানে ক্রমশঃ বার্থতার ইতিহাস বুকে নিয়ে শুধু দীর্ঘশ্বাসের পাহাড় গড়া শুরু হল। দীর্ঘ তিন বছর পর—বিকাশের চিঠি, মীনা-বিকাশের আত্মপ্রকাশ।

বিকাশ ক্ষমাপ্রার্থী। কিন্তু ক্ষমা করার প্রশ্নটা কোথায়? ভবেশ তো নীরবে স্বচ্ছায় অক্ষমতা মেনেই নিয়েছে। যদি মীনা সত্যই সুখী হবার জন্য তার কাছ থেকে সরে গিয়েছে, তাহলে দোষ কোথায়? সে তো ঠিকই করেছে! তার ক্রটিতে যদি না বাধে, তবে অর্থাভাবে সমগ্র জীবনভ'র মীনা বিষাদের লবণ সমুদ্রে যন্ত্রণায় ডুবে থাকবে—তা ভবেশ কখনোই চায় নাই! যদিও সে জানে এর জন্য তাকে জীবনভ'র চরম মূল্য দিয়ে যেতে হবে! কিন্তু ক্ষমা করা বা না করা যে সমানভাবেই ভবেশের কাছে আজ অর্থহীন—ডানাকাটা জটায়ু! যা একদিন ছিল গুরুত্বপূর্ণ, তা আজ শুধু অর্থহীন বিলাসচিন্তা মাত্র—নৈতিকতার মাপকাঠিতে লোক দেখানো ভড়ং ছাড়া কিছুই নয়! এ শুধু তার কাছে আহত পাবীর বার্থ ক্রন্দনের অনুরণন ছাড়া আর কি! ভবেশকে যে একটিবারের জন্য মনে স্থান দিয়েছে বিকাশ, তা ভবেশের জন্য একদিকে দেখতে গেলে চরম লাভ। হোক না তা' বাথার, উসকানি ছাড়া আর কিছুই নয়। নীরবে ফোঁটা কয়েক চোখের জল ঝরে পড়ল ভবেশের ক্লান্ত চোখের কোণ বেয়ে। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে আবার পড়ল চিঠিটা। চিঠির মধ্যে একটা সুরই যেন খুঁজে পেল ভবেশ, তা'হল—মীনা নিশ্চিন্তে সুখের ঘর বাঁধতে পেরেছে, সুখী হতে পেরেছে! নিজের চাওয়া পাওয়ার রাজত্বে মীনা যে সুখী হতে পারে—সদর্পে চোখে আঙুল দিয়ে ভবেশকে দেখিয়ে দিল।

আবার কিছুক্ষণ স্থবিরের মতো বসেই রইলো। তারপর একসময় সমস্ত জড়তা কাটিয়ে সত্য সত্যই বিকাশের চিঠির উত্তর দিতে বসল ভবেশ—

বিকাশ,

দীর্ঘদিন পর তোমার পত্র পেয়েছি। ঈশ্বর তোমাদের মঙ্গল করুন।

তোমাদের স্মৃতি একজন বন্ধু হিসেবে নিজেকে ধন্য মনে করছি—ঈশ্বরের কাছে একমাত্র প্রার্থনা, তোমরা সুখী হও, সুখ শান্তিতে ভরে উঠুক তোমাদের জীবন।

পত্রের উত্তর দিতে দেরী হওয়ার জন্য দুঃখিত। নানারকম কাজের চাপে সময় মতো উত্তর দিতে পারি নাই, তারজন্য—ক্ষমাপ্রার্থী! বেড়াতে আসবে। এই কর্মবাস্তব কপর্দক শূণ্য মানুষের কাছ থেকে সবসময় পত্রের উত্তর না পেলো—ক্ষমা ক'রো। ঈশ্বরের কাছে তোমাদের মঙ্গলকামনাস্তে—

তোমাদের বন্ধু

ভবেশ

॥ পরিমণ্ডল ॥

শচীন দত্ত

ঘুম ভেঙ্গে দেখি জানলায়
শার্শীতে রোদ হাসছে
ভোর হয়ে গেল নিশ্চয়।

উঠে খুলে দেই জানলা
কাঁচা-সোনা রোদ ঢুকছে
এতে আর নেই বিষয়।

দ্রুত আসে দিন চলে যায়
সময় কি পারে রুখতে
পড়ে থাকে কাজ হাজারো—

আল্‌সেমি আসে কতো যে
পড়ে পড়ে চাই ঘুমাতে
সময় চাই যে তাহারও।

সময়ের স্রোতে ভেসে যাই
পারি না ওপরে উঠতে
তার চাপে চিড়ে চেপ্টে।

পৃথিবী বলছে ঘুরছে—
তার সাথে ঘুরি আমরা
ওতোপ্রোতো আছি লেপ্টে।

পৃথিবীর রঙ-মঞ্চে
অবসাদে সদা ভুগছি
তাই বুঝি চাই মুক্তি।

বিজ্ঞান ও সভ্যতার অবদান

মণিকা ঘোষাল

বিজ্ঞান তথা সভ্যতা মানুষের অনুভূতিশীল কোমল মনোবৃত্তিকে ক্রমে হৃদয়হীন রোবটে পরিণত করে দিচ্ছে, বিজ্ঞানের বিকল্পে এটা নিছক মিথ্যা অপবাদ হয়তো নয়।

ভবু বিজ্ঞান এগিয়ে চলবেই। পেছন দিকে হটবে কি? না-কি তাই কাম্য? ঘরে বসে দূরদর্শনে দেখা যাচ্ছে হাজার হাজার মাইল দূরে মহাকাশযানে বসে মানুষ পৃথিবীর মানুষের সঙ্গে কথা কইছে। শুধু বায়ু তরঙ্গ ভেসে আসা কখন নয়, অচেনাও নয়। ভারতেরই নাগরিকটিকে চোখে দেখা যাচ্ছে এবং সারে সাহাসে আচ্ছা বলছে। দূরকে কত নিকটে এনে দিয়েছে। পৃথিবী তো বটেই, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কত রহস্য উদ্ঘাটিত হচ্ছে বিজ্ঞানের দৌলতে আবার ক্ষয়ক্ষতিও হচ্ছে বৈকি।

সভ্যতা ও বিজ্ঞান যেমন নিচ্ছে অনেক কিছু আবার দিচ্ছেও অনেক কিছু। এই দেওয়া নেওয়া নিয়েই পৃথিবী এগিয়ে চলছে। চলবে।

পেছনটাই যদি একমাত্র ভাল হবে তবে তো পেছনেরো পেছন আছে। অতীতেরো অতীত আছে। অতীতের স্মৃতি মধুর বইকি। তা' বলে কি সেই অতীতে ফিরে গেলেই মঙ্গল হবে? এমন অভিযোগ তো ওঠেই যে বিজ্ঞান ও সভ্যতা জগতের সুখ-আনন্দ কেড়ে নিয়েছে। তা' নিলেও কান্নাও খানিকটা মুছে দেয়নি কি? টাইফয়েড-কলেবা-কালাজ্বর-ম্যালেরিয়া-বসন্ত ইত্যাদি মহামারীতে গ্রামকে গ্রাম জনমানবহীন হয়ে যেতো নাকি? মরা কান্না কাঁদবারো কেউ অবশিষ্ট বেঁচে থাকত না। নাকি ভুত হয়ে বিচরণ করত। যদি বা হ' চার জন রক্ষা পেতো গ্রাম ছেড়ে পলায়ন করত।

কত শিশু ডিপথেরিয়ার অকালে ঝরে পড়ত। পোলিও তে যারা মারা যেত, বাদ বাকি নুলো হয়ে বাপ মায়ের বিড়ম্বনা বাড়াত। সে সব আয়ত্বে আসেনি কি? গনোরিয়া-কুষ্ঠের মত দূরারোগ্য ঘৃণ্য ব্যাধি সমাজকে করে করে পঙ্গু করে ফেলেছিল তাকেও আয়ত্বে এনে হতভাগাদের অতল হতে টেনে নিরাপত্তার পৈঠায় তুলতে প্রায় সফল হতে চলেছে। 'যক্ষা নাই রক্ষা' সেই আতঙ্ক দূরীভূত হয়নি কি?

এ সবই বিজ্ঞানের অবদান বৈকি। তবে কি আশা করব, এইটুকু প্রতিরোধ করেই বিজ্ঞান থমকে থেমে থাকবে কিছু ক্ষয়ক্ষতির সম্ভাবনায়? কিন্তু আশা করলেও আর তা' হয় না। বিজ্ঞান বা সভ্যতার যে উন্নতিতে এসব অমঙ্গল রোধ করা সম্ভব হয়েছে সেই বিজ্ঞান থামতে জানে না।

বিজ্ঞানীর স্পৃহা তাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে থাকবেই। নব নব আবিষ্কারেই বৈজ্ঞানিকের আনন্দ ও তৃপ্তি। কোনটার জগতের উপকার, কোনটার বা ক্ষতি। ভালমন্দ ফলাফল যাই হোক আবিষ্কারের নেশা তাকে উদ্বুদ্ধ করবেই। যেমন জলের প্রবাহ থেমে গেলে বন্ধ জলাশয় পঁচে জীবানু ও আউড়াখানা হয়ে যায়, রোগপীড়ার আধার হয়ে দাঁড়ায়। তাই প্রবাহ বয়ে চলাই প্রকৃতির রীতি। বাঁচার পথও। আবার অতিরিক্ত প্রবাহে (বন্যায়) কত প্রাণ হানি হয়, কত কুটীর-ক্ষত-লস্টাদি ধ্বংস হয়। লাভ ক্ষতি দুই নিয়েই প্রকৃতির নিয়ম।

ক্ষোভ হতেই পারে সভ্যতা ও বিজ্ঞান প্রকৃতির সৌন্দর্য্য ধ্বংস করে দিচ্ছে, মানুষের শাস্তি হরণ করে নিচ্ছে। সভ্যতাকে দোষারোপ না করে এর কারণ অগুত্র অনুসন্ধান করলে হয় না?

প্রকৃতির শোভা ক্রমশঃ তো লুপ্ত হবেই। সেই প্রস্তর যুগে বা তারো আগে কয়টা মানুষই বা পৃথিবীতে ছিল। এখনকার তুলনায় গোনাগুনতি নয় কি? তাই আহাৰ্য্য ছিল প্রচুর। গাছ-গাছালি, ফলে ফুলে পূর্ণ ছিল বনুন্ধরা। আকাশ বাতাস পরিপূর্ণ ছিল বিস্তৃক্‌তায়। পরিবেশ দূষণ নামক কোন শব্দ জানা ছিল না তখনকার মানুষের। আবার প্রকৃতিরই নিয়মে জন্মহার বৃদ্ধি পেতে পেতে বর্তমানে এমনই অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে যে ঠাঁই নাই ঠাঁই নাই বিশাল এই ধরণীতেও। সেটাতো বিজ্ঞানের কুফল নয়। বরং বিজ্ঞান ও সভ্যতা রাশ টানতে ব্যস্ত হয়েছে। তা' সত্ত্বেও ভরাডুবি হতে খুব দেবীও হবে না। কয়েক দশকেই সম্পন্ন হবে যদি না—যদি না সমস্ত সভ্য জাতিই এ বিষয়ে সচেতন হয়। চীন তো আইন করেই রোধ করতে সচেষ্ট। যে সব দেশে জনগণের দোহাই দিয়ে এ বিষয়ে অবশ্য শিক্ষিত শ্রেণী পঞ্চাশ-ষাট বছর আগে থেকেই কিছুটা সচেতন হওয়ার সর্বনাশে কিঞ্চিৎ রক্ষা। সভ্যতা না এলে তো কটোলের প্রশ্নই উঠত না। এখনো যে ছিটেফোটা প্রকৃতির শোভা, ফুলের সুবাস বাতাসে পাওয়া যায় তাও কবে লুপ্ত হয়ে যেত পেটের জ্বালায়। কারণ মানুষ হাঙ্গার আর সেক্স নিয়েই জন্মায়। তারই তাড়নায় আহাৰ আর জন্ম দেওয়া কোনটাই রোধ করা সম্ভব নয়। তার? একদিকে জন্ম দিতে দিতে জন প্রাবন অবশ্যজ্ঞাবি। আবার খুল্লিবৃন্তির কারণে যত শ্যামসিমা নিশ্চিহ্ন হতে বাধ্য। সুতরাং সভ্যতা ও বিজ্ঞানের সহায়তায় জন্মনিয়ন্ত্রনের তাগিদও সমাধানের পথ দেখা যাচ্ছে।

জনতার ভাৱে যেমন একদিকে ভূমী জায়গা, গাছপালা নির্মূল হচ্ছে তেমনি বাঁচবার তাগিদেই মরুপ্রান্তরকে সুফলার রূপান্তরিত করার দিকে বিজ্ঞান ক্রমশঃই এগোচ্ছে। সভ্যতাও বিজ্ঞানের কুফল আছে সুফলও আছে। বিজ্ঞানের অপব্যবহারে পরমাণু বোমা হিরোসিমা-নাগাসাকি ধ্বংস করেছে। শুধু ধ্বংস করেই ক্ষান্ত হয়নি। পরবর্তী প্রজন্মেরও অপূরণীয় ক্ষতি করেছে বিজ্ঞানের অভিসাপ এর চেয়ে বেশী আর কি হতে পারে! তবে এর একটা অগুদিকও আছে।

সেই সর্বনেশে ধ্বংসের পরিণাম দেখে যুদ্ধবাজ কোন জাতিই কিন্তু এখন পর্য্যন্ত দ্বিতীয়বার আর সেই কুর্কর্য করতে সাহস পায়নি। জানিনা ভবিষ্যতে সেই হঃসাহস হবে কিনা। এই সর্বনাশা হুর্কুচ্ছি আর কখনো কারো না হয় ঈশ্বরের কাছে একান্ত প্রার্থনা।

খেয়োখেয়ি চিরকাল ছিল। এখনো আছে। ভবিষ্যতেও থাকবে। আত্মরক্ষার ভাগিদেই প্রকৃতির অস্ত্র আবিষ্কার থেকে আত্মকের এই আনবিক বোমার উদ্ভাবন। মহাদেশে-মহাদেশে, দেশে দেশে, রাজ্যে রাজ্যে, পাড়ায়-পাড়ায়, গৃহে গৃহে রেঘারেঘি বাড়ছে বই কমছে না। হুর্কলের প্রতি প্রবলের আক্রমণ সে তো সৃষ্টির প্রথম থেকেই। তিমিকে-তিমিঙ্গিল, তিমিঙ্গিলকে-তিমিঙ্গিল বধ করতে উদ্ভত। মানুষ থেকে হুনিয়ার যত জীবজন্তুর একই মনোবৃত্তি। অবশ্য মানুষের মত জীবজন্তুও মধ্যে নিজ জাতির প্রতি এই প্রবণতা কম দেখা যায়। সমানে সমানে না হলে পরস্পরে এঁটে ওঠা দায়। তাই বিজ্ঞানের সুবাদে সবাই সবল হলে তবে যদি খেয়োখেয়িটা কমে। হুর্কলের প্রতি অত্যাচারের সুযোগটা থাকে না। অত্যাচার বন্ধ করতে বাধ্য হয়। সেই আশা নিয়ে পৃথিবী থেকে বিদায় নেব যে সভ্যতা সত্যিই মানুষকে সভ্য করে তুলুক। বিজ্ঞান ও সভ্যতার ক্রমোন্নতি মানুষের সুবুদ্ধি জাগ্রত করুক। সভ্যতার অর্থ তো ভাব্যতা-কৃষ্টি-মানবিকতা। আক্ষরিক অর্থেই সভ্যতা যেন মানবিক উন্নতিসাধনে সক্ষম হয়। শুধুই সভ্যতার মুখোশ নয়।

“বিশ্রাম”

হরিচরণ দাস

বার বার ছুটে আসি,
অনেক আশা নিয়ে মনে।
হৃদয়টা মোর—
ধু ধু মরু প্রান্তরের মত,
খাঁ, খাঁ করে বৈশাখের ছপুর যেমন ॥

ফিরায়ো না আর—
শুণ হৃদয় রিক্ত করে।
তোমার ভালোবাসার আগ্নেয় হরে

আশার দিগন্তে দিক ডানা মেলে
আমার এই হৃদয় পাখিটা ॥

আভা / শারদীয়া সংখ্যা—১০৮

শুধু লতা মূলে
তোমার প্রীতির জল—
ঢেলে ঢেলে,
সুন্দর এক, মন মুগ্ধ কর

ফুটুক কুশুম,
ক্রান্ত এই জীবন আমার
পাইবে বিশ্রাম—সেখা
ফেলে আসা সব স্মৃতি ভুলে ॥

মডার্ন যুগের কড়চা

(রমা রচনা)

হরিপদ নন্দী

মডার্ন যুগের ফ্যাশানের যেন অস্ত নেই। “কাটিং আর ম্যাচিং” এর যেন জোয়ার এসেছে দেশে। প্রথমেই বলি আমার ফ্যামিলির কথা। হঠাৎ সখ হলো গিন্নীকে আমার পছন্দমত একটা শাড়ী কিনে দেবো। তাই সখ মেটাতে গিন্নীকে নিয়ে বাজারে গেলাম। তবে ই্যা, গিন্নীও সেদিন আমার সখটা কড়ার-গড়ার মিটিয়েছিল। আজ সেই ঘটনাটাই বলছি। গিন্নীকে নিয়ে রওনা হোলাম শাড়ী কিনতে। পছন্দ করে পিস্তি রঙের একটা শাড়ীও কিনে ফেললাম। শাড়ীটা গিন্নীর খুব পছন্দ হয়েছে জেনে, আমিও খুব খুশী হয়েছিলাম সেদিন। গিন্নীকে খুশী রাখতে কে না চায় বলুন? নতুবা সংসারটা যে রসাতলে যাবে। গিন্নী সন্ত কেনা শাড়ীটা হাতে নিয়ে চললো ব্লাউজের দোকানে। আমিও চললাম তার পিছু পিছু। গিন্নী ব্লাউজের দোকানে ঢুকতেই দোকানদার বললে,—“আমুন মেম-সাহেব,” কি চাই বলুন? ব্লাউজের সাইজ উল্লেখ করে ফট করে গিন্নী বলে বসলো,—“পিস্তি রঙের বগল কাটা ব্লাউজ দিন।” গিন্নীর কথা শুনে সঙ্গে সঙ্গে আমার পিস্তিটাও জ্বলে গেল। কিন্তু আমাকে খুশী মনেই দোকানদারকে বলতে হলো, ভাল জিনিষ দেবেন। দোকানদার বললে, আমার কাছে এক নম্বর জিনিষ পাবেন। নির্ভয়ে নিতে পারেন। দোকানদার অনেকগুলো ব্লাউজের বাঙিল সামনে রেখে, একটি একটি করে প্রায় সব বাঙিলই খুলে দেখাতে শুরু করলো। খুঁজতে খুঁজতে শেষে ‘বগল কাটা’ ব্লাউজ মিললো; কিন্তু পিস্তি রঙের মিললো না। অগত্যা অন্য দোকানের শরণাপন্ন হতে হলো। এইভাবে কয়েকটা দোকানে খুঁজে শেষে, সাইজমত ‘বগল-কাটা’ পিস্তি রঙের ব্লাউজ মিললো “অঙ্গ শোভা” নামে একটা দোকানে। বুঝুন ব্যাপারটা। ফ্যাশান বজায় রাখতে ‘বগল-কাটা’ ব্লাউজ চাই, আবার ম্যাচিং বজায় রাখতে শাড়ীর ব্লাউজ চাই। কি আর বলবো মশাই; সেদিন ব্লাউজের “কাটিং আর ম্যাচিং” মেলাতে, কমপক্ষে গোটা দশেক দোকান ঘুরে লাটুর মত ঘুরপাক খেতে খেতে হিমশিম খেয়েছি। উপায় নেই। গিন্নীর তালে তাল দিয়ে চলি বলেই, আমার সংসারে শান্তি বজায় আছে। ফলে আমাদের উভয়ের মনের মিলও আছে।

কেবল গিন্নীকে নিয়ে যে নাজেহাল হই তা বললে ভুল হবে / “তার ছেনা-পনারাও কম যায় না।” এবার মেয়ের কথা বলি, আমার মেয়ে বড় একটা শাড়ী পছন্দ করে না। শাড়ীর

বদলে মেয়েকে ক্রমে দিত হই, “চুড়িদার, মাসি, ফুলপ্যান্ট।” একদিন মেয়েকে কাছে ডেকে
প্রশ্ন করলাম ফুলপ্যান্ট তো ছেলেরা পরে, তবে তুমি কেন ফুলপ্যান্ট পরবে মা-মনি? তুমি বাঙ্গালী
ঘরের মেয়ে, বড় হয়েছে। এবার শাড়ী পরলেই ভালো লাগবে। জবাবে মা-মনি কি বললে
জানেন? বললে,—“আমি মডার্ন-গার্ল।” আমাকে ক্লাবে-পার্টিতে যেতে হয়। সুতরাং শাড়ী পরা
আমার পক্ষে অসম্ভব। পার্টিতে যাওয়ার কথা শুনে তখনই আমার দাঁত-কপাটি লেগে যাচ্ছিল।
কিন্তু নিজেকে সামলে নিয়ে বলতে হলো তা ঠিক কথা। এখানেও নিকরপায় হয়েছে একথা বলতে
হলো। একদিন দেখি, আমার গুণধর পুত্র একটা ঢলঢলে জামা পরে খুব খুশী মনে ঘুরছে।
পুত্রকে ডেকে বললাম, খোকা তোমার জামাটা এত ঢিলে কেন? হারামজাদা, নচ্ছার দর্জি জামার
ফিটিং করেছে দেখো? এদিকে মজুরীর ঠেলায় অস্থির। বলি,—“দর্জি ঘুমতে ঘুমতে মাপ নিয়েছে
না দর্জির চোখে ছানি পড়েছে?” স্রেফ ফাঁকি মেরে পরিসা নেওয়ার ধাক্কা। নিশ্চয়ই মাপ
নিতে ভুল করেছে। বাটা দর্জিকে আমি ছাড়ছি না সহজে। খানিকটা টেটিয়ে মনের ঝাল
মিটিয়ে চূপ করলাম। তারপরই পুত্রের জবাব শুনে আমার “চক্ষু-ছানাবড়া।” পুত্র বললে, তুমি
অসোখা আমার দর্জিকে গালাগাল করছো বাবা। বরং দর্জি আমার মনের মতনই জামা তৈরী
করেছে। “এর নাম ব্যাগি হাতা জামা।” তাই আমি খুশী হয়ে দর্জিকে মজুরী ছাড়া কিছু
বকসীসও করেছি। বেশ করেছে। তখন হঠাৎ পুত্র আমার গলাটা জড়িয়ে ধরে বললে, “বাবা,
সত্যি করে বলতো আমাকে হিন্দি ফিলিমের ফেমাস নায়ক জীতেন্দ্রর মতন মানিয়েছে কি না?”
সে আর বলতে ভালই মানিয়েছে তোমায়। এ কথাটাও নিকরপায় হয়েছে বলতে হলো। ফ্যামিলির
মধ্যে কেবল গিন্নীকে সন্তুষ্ট রাখতে পারলেই চলবে না। তার ছেনা-পনাদেরও সন্তুষ্ট রাখতে
পারলেই, “একটি সুখী পরিবারে পরিণত হবে।” শুধু এইটুকুর আশায় সবই চোখ-কান বুজে
সহ্য করছি মশাই। এ ঝামেলা আজ আমি একাই ভোগ করছি না। দেশের বহু জনকেই এই
ঝামেলা ভোগ করে হিম্মিশ্ব খেতে হচ্ছে। এটা কি কম দুঃখের কথা? সারা দেশটা জুড়ে
কুকুচিপূর্ণ পোষাকে ভরে গেছে। দিন দিন দেশটা যেন তলিয়ে যাচ্ছে আধুনিকতার জোয়ারে।
একে কখনো কে? কার হিম্মৎ আছে রোধার? এতো গেল পোষাক-আষাকের কথা। এবার
শুমন মনের ম্যাচিং এর কথা। দেশে আজ লাভ-ম্যারেজের সংখ্যা হ্রাস করে বেড়েই চলেছে।
এর অনেক কারণও আছে। আজকাল ছেলে-মেয়েরা পড়াশুনা নিয়ে ব্যস্ত থাকে। ফলে ছেলে-
মেয়েদের বয়স যায় বেড়ে। তাছাড়া দেশে বেকারের সংখ্যাও কম নয়। তাই ঠিক বয়সে বিয়ে
হয় না অধিকাংশ ছেলে-মেয়েদের। আর এই বয়স্ক যুবক ও বয়স্ক যুবতীরা রাস্তা-ঘাটে, হাটে-
বাজারে, স্কুল-কলেজে, অফিসে, সিনেমায়, পাড়ার ফাংশনে, পার্কে, খেলার মাঠে, নাটক অভিনয়ে
ইত্যাদি নানান স্থানে মেলামেশার সুযোগ পায়। এই মেলামেশার মাধ্যমে প্রায় দেখা যায়, কোন
কোন যুবক-যুবতীর মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে ওঠে ধীরে ধীরে। তাদের মধ্যে “মনের মিল অর্থাৎ

মনের মা'চি" হলেই তারা উভয়েই লাভ-ম্যারেজের কথা ভাবতে থাকে। বিষে না হওয়া পর্যন্ত তারা দুজনে কিছুদিন "মিনি-স্বামী স্ত্রী হিসাবে কাটায়ে।" মিনি-স্বামী স্ত্রী "অর্থাৎ তারা ঘরে বাাচেনার", আর ঘরের বাইরে তারা ঠিক বিবাহিত দম্পতীর মত নুরে বেড়ায় খুলী মত। অবশ্য অভিভাবকদের গোপনে।

মিনিবাস, মিনি মার্কেট দেখছি। আবার "মিনি দম্পতী"ও দেখছি। বর্তমানে এই মিনি-দম্পতীদের রাস্তা-ঘাটে উজনে উজনে দেখা যায়। কিছুদিন অপেক্ষা করার পর, মিনি-দম্পতীরা অবশেষে বিষের অনুমতি নিতে নিজ নিজ অভিভাবকদের শরণাপন্ন হয়। অভিভাবকদের অনুমতি মিললে ভাল, নতুবা সোকা কোটে যেয়ে উভয়ে রেজিষ্টারী করে বিষে করে ফেলে। কোর্ট-ম্যারেজের পরও কি নিস্তার আছে? যারা কোর্ট-ম্যারেজ করে, তাদের মধ্যেই আবার কেউ কেউ ডিভোর্স মামলা আনে। অর্থাৎ স্বামী-স্ত্রীতে ছাড়াছাড়ির মামলা। কি আশ্চর্য্য ব্যাপার বলুন তো? এটা কি জামা-কাপড়, না ছাতা-লাঠি যে, ইচ্ছেমত বদলাবে? এমনও দেখা যায়, একটি মেয়ে প্রথম বিষের পর স্ব-ইচ্ছায় কোন কারণ দেখিয়ে ডিভোর্স মামলা এনে, প্রথম স্বামীকে ছেড়ে দিয়ে, সে পুনরায় বিষে করে দ্বিতীয় স্বামীর ঘর করছে বেশ খুলী মনেই। এতদিন একাধিক স্ত্রী গ্রহণ করে আসছে কোন কোন পুরুষ। এখন দেখছি, এই মডার্ন যুগে মেয়েদের মধ্যেও কেউ কেউ একাধিক স্বামী গ্রহণে দ্বিধা করে না। এ যেন এক গোলেমেলে ব্যাপার। এই ছুনিয়াটা যেন রাতারাতি পাণ্টে গেছে। এসব ভাবতেও খুবই আশ্চর্য্য লাগে। এই আধুনিকতার জালে সারা দেশটা যেন জড়িয়ে পড়েছে। আজ একটা প্রশ্নই মনে জাগে,—“এই সভ্যতার শেষ কোথায়?”

নব নীড় (বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা আবাস)

৩০, অশোক এভিনিউ, কলিকাতা-৭০০০৪০

ও

১/২ শ্রাম বোস রোড, চেল্লা, কলিকাতা-২৭

কেবলমাত্র বৃদ্ধা মহিলাদের জন্যে, স্বল্পব্যয়ে

সর্ববিধ সুবিধাসহ থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা আছে।

পরিচালনায় :—

উদায়বস, কো-অর্ডিনেটিং কাউন্সিল

৫/১, রেডক্রস্ প্লেস, কলিকাতা-৭০০০০১

অর্জুন ও উলূপী

কালীশঙ্কর ঘল্লিক (নিউ দিল্লী)

অর্জুনের দ্বাদশ বর্ষ বনবাস তখনও হয়নি শেষ ।
 একদিন তিনি গঙ্গায় করিছেন অবগাহন,
 হেরিলেন এক অপূর্ব সুন্দরী রমণী
 গঙ্গা মধ্য হতে হলেন উদ্ভিত ।
 হেরিয়া সে মুষ্টি অর্জুন হলেন মুগ্ধ ।
 ধীরে ধীরে সেই রমণী অর্জুনের কাছে আসি
 রহিল চাহিয়া আকুল নয়নে ।
 অর্জুন হইয়া বিচলিত কহিলেন “হে সুন্দরী,
 কিবা তব পরিচয়, অঙ্গরা কিম্বদন্তী
 মৎস্যকন্যা, গন্ধর্ব্ব অথবা স্বর্গের কোন দেবী ।
 কোন মানব কন্যা হয়না এরূপ পরমা সুন্দরী ।”
 কহিল রমণী “আমি উলূপী,
 পাতালের নাগরাজ কৌরব্য নাগের কন্যা ।
 তব শৌর্য্য বীর্য্যো হয়েছি মুগ্ধ । চল অর্জুন,
 মোর সাথে নাগলোকে করিতে ভ্রমণ ।”
 কহিলেন অর্জুন “কম মোরে সুন্দরী,
 তব সাথে নাগলোকে যেতে প্রস্তুত নহি আজি ।
 যখন হইবে সময় তখন বাইব নাগলোকে ।”
 কহিল উলূপী “সে হয়না অর্জুন, এখনই উত্তম সময়
 প্রতীক্ষা করা স্বভাব নহে মোর ।”
 এত কহি উলূপী ধরিয়া অর্জুনের হাত
 কহিল “চলো অর্জুন, চলো মম সাথে
 তোমাতে করি মিনতি,”
 কহিলেন অর্জুন “ছাড় হাত সুন্দরী,

তব সাথে নাগলোকে যেতে অক্ষম আজি ।”
 কহিল উলূপী “অর্জুন, যদি মম অনুরোধ
 করহ প্রত্যাখ্যান, তবে বাহুবলে নিয়ে যাব তোমাতে ।”
 কহিলেন অর্জুন “হাসালে সুন্দরী, বাহুবলে
 নিয়ে যাবে অর্জুনে, জলে স্থলে অন্তরীক্ষে অজেয় যে ।
 কিন্তু এক নারীর সাথে সংঘর্ষ করা
 শোভা নাহি পায় মম ।
 ফিরে যাও সুন্দরী তব নাগলোকে ।”
 কহিল উলূপী “অর্জুন, স্থলে অন্তরীক্ষে
 হতে পার অজেয় তুমি
 কিন্তু জলে অজেয় আমি
 প্রয়োজনে দেখাইতে পারি মোর শক্তি ।
 কিন্তু বাহুবলে নয় প্রেমডোরে বাঁধিয়া তোমাতে
 নিয়ে যাব মম নাগলোকে ।”
 কহিলেন অর্জুন “সুন্দরী, করিনু আত্মসমর্পণ,
 নিয়ে চলো তব নাগলোকে ।”
 অর্জুনকে সাথে লয়ে উলূপী আসিল নাগলোকে ।
 রাজপ্রাসাদে অর্জুনকে হেরি
 কহিলেন নাগরাজ কৌরবানাগ
 “উলূপী, কে এই সুদর্শন যুবক ?”
 কহিল উলূপী “ইনি তৃতীয় পাণ্ডব, বীরশ্রেষ্ঠ অর্জুন ।”
 অর্জুনের পাইয়া পরিচয় তাহারে করিয়া স্বাগত
 কহিলেন নাগরাজ “অর্জুন, তব শৌর্য্য বীর্য্যের
 পরিচয় নহে অবিদিত জিলোকে ।

তব কাছে করি অমুরোধ
 তুমি মোর কণ্ঠ্য করহ পাণিগ্রহণ ।
 উলুপী সব দিক হতে যোগ্য তব ।
 সে মায়াবলে অজ্ঞেয় জলে ।
 তাহার রূপ তব আঁখি দিয়া হেরিয়াছি ।
 বংশ পরিচয়ে সে রাজকন্যা
 আশাকরি তব হবেনা অমত ।”
 কহিলেন অর্জুন ইতঃসুতঃ করি
 “কিস্তি বিবাহিত আমি, তাছাড়া
 দ্বাদশ বর্ষ বনবাসে নির্বাসিত আমি ।
 এ সময় কেমনে করিব বিবাহ ।”
 কহিলেন নাগরাজ “রাজপুত্র তুমি,
 রাজপুত্রেরা হয় বহুবিবাহে অভ্যস্ত ।
 তাছাড়া উলুপী রহিবে হেথায়
 তাহার যে পুত্র হবে সেই হবে
 মোর সিংহাসনের উত্তরাধিকারী,
 এই বিবাহে আর করো না অমত ।”
 অতঃপর অর্জুনের পাইয়া সম্মতি
 উলুপীর সাথে অর্জুনের হইল বিবাহ ।
 এক বর্ষকাল কাটিল আনন্দে
 অর্জুনের হইল পুত্রলাভ ।
 নাম রাখিলেন ইরাবান ।
 উলুপীর প্রশিক্ষণে অর্জুন হলেন অজ্ঞেয় জলে ।
 সকল জলজপ্রাণী হল অর্জুনের বশীভূত ।
 অর্জুন নাগরাজ্য হতে মর্ত্যে যেতে হলেন প্রস্তুত ।
 বাজিল বিদায়ের করুণ রাগিণী ।
 কহিল উলুপী “আবার কবে দেখা হবে প্রিয়তম ।”
 কহিলেন অর্জুন “যখন হইবে সময় তখন
 আসিব ফিরে ।”
 অতঃপর বহুবর্ষ গেছে কেটে

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের হয়েছে অবসান ।
 যুধিষ্ঠির বসেছেন রাজসিংহাসনে ।
 তিনি করিলেন অশ্বমেধ যজ্ঞ ।
 অর্জুন বাহির হলেন দিগ্বিজয়ে
 অশ্বমেধ যজ্ঞের অশ্ব সঙ্গে লয়ে ।
 বঙ্গদেশ জয় করি আসিলেন মণিপুরে,
 সেখা অর্জুন ও চিত্রাঙ্গদার পুত্র বক্রবাহন
 পিতার আগমন বার্তা শুনি
 আসিল পিতাকে করিতে স্বাগত ।
 কিস্তি অর্জুন কহিলেন পুত্রকে
 “বক্রবাহন, আমি আসিয়াছি
 তব রাজ্য করিতে জয় ।
 ক্ষত্রিয় তুমি, আক্রমণকারীকে বাধা দেওয়াই
 ক্ষত্রিয়ের ধর্ম । কিস্তি ক্ষাত্রধর্ম ত্যাগ করি
 আক্রমণকারীকে করিছ স্বাগত ।
 ধিক পুত্র ধিক । মোর পুত্র বলি
 পরিচয় দিতে লজ্জা করিছে মম ।”
 কহিল বক্রবাহন “পিতার সাথে যুদ্ধ করা
 পুত্রের নাহি সাজে ।”
 কহিলেন অর্জুন “হেথা পিতাপুত্রের সম্পর্ক নয়
 সম্পর্ক আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে
 দেশমাতৃকার স্বাধীনতা রক্ষাকারীর ।
 দেশমাতৃকার স্বাধীনতার চেয়ে বড় কি পিতৃভক্তি ?”
 বক্রবাহন হইয়া বিমূঢ় হলেন অচল ।
 অর্জুনের আগমনবার্তা শুনি উলুপী
 নাগরাজ্য হতে এসেছিল মণিপুরে ।
 কহিল “বক্রবাহন, আমি তব বিমাতা
 নাগরাজকন্যা উলুপী । তব পিতা যথার্থ বলেছেন
 অস্ত্রধর রক্ষা করো দেশের স্বাধীনতা ।
 ক্ষত্রিয় হয়ে ক্ষাত্রধর্ম করহ পালন ।

বীরশ্রেষ্ঠ অর্জুনের পুত্র তুমি
কাপুরুষের মত কবোনা আজ্ঞাসমর্পণ ।
অশ্বমেধের অশ্ব হরণ করি যাও সমরারণে ।”
সেই কথামত বক্রবাহন অশ্বমেধের অশ্ব
করিয়া হরণ বাধিয়া রাখিল রাতপ্রাসাদে ।
অতঃপর পিতাপুত্রে হল ভীষণ সংগ্রাম ।
উলুপীর মায়াবলে অর্জুন হলেন নিহত
পুত্র বক্রবাহনের হস্তে ।
বক্রবাহন অনুশোচনার হইয়া দগ্ধ
কহিল “মাতঃ একি পাপ করিলাম আমি
পিতৃহত্যা করি জগতে সকলের
ঘৃণার পাত্র হলাম আজি ।”
কহিল উলুপী “ভাগ্যের লিখন কে পারে ধুওতে ।
তুমি নিমিত্ত মাত্র, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে তব পিতা
শিখণ্ডীরে সম্মুখে রাখি পিতামহ ভীষ্মকে
নিধন করি যে পাপ করেছিলেন

তাহারই প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ পুত্রহন্তে হলেন নিহত ।
করিও না শোক পুত্র, তব পিতাকে
করিব পুনরুজ্জীবিত ।”
এত কহি উলুপী দিব্যমণি প্রভাবে
করিলেন অর্জুনকে পুনরুজ্জীবিত ।
অর্জুন নবজীবন লাভ করি বক্রবাহনকে
বক্ষে জড়ায়ে ধরি কহিলেন
“তব বীরত্বে মুগ্ধ আমি ।
পিতার উপযুক্ত পুত্র তুমি ।
চির আশ্রয়ান হয়ে করহ রাত্যশাসন ।”
বক্রবাহন অর্জুনের পায়ে হাত রাখি করিল প্রণাম ।
কহিলেন অর্জুন “উলুপী, আজি হতে মোদের
দীর্ঘ বিরহ যন্ত্রণার হোক অবসান ।
চলো মম সাথে হস্তিনাপুরে ।”
কহিল উলুপী “তাই চলো প্রিয়তম ।”

নিখিল ভারত মহিলা সম্মেলন

দক্ষিণ কলিকাতা শাখা

১১, পালিত স্ট্রীট, কলিকাতা-১৯

হঃস্বা মহিলাদের আইনগত সাহায্য এবং জীবনে
প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্য শিল্প শিক্ষার ব্যবস্থা আছে ।

‘মা’

(উপন্যাস)

জগন্নাথ মিশ্র

— ১ম পর্ব —

মা চলো এখান হতে চলে যাই।

কোথায় যাবিবে হুলো। তুই বড় হ, তারপর সে চিন্তা করব।

কথাটার ঠিকমত সার দেয় না হুলাল। চূপ করে যায়। একদম ভাল লাগে না তার এখানে। দিনরাত ফাইফরমাস খেটে খেটে কোনমতে স্কুলের আট ক্লাস পার করে ন’টাতে উঠেছে। বইপত্র ঠিকমত পায়নি। সরকার বাহাদুরের দেওয়া বইপত্রেই তার আটটা ক্লাস কেটেছে। এবারে সে পুণ্যোগ পায়নি। কিছু তার মনিবের টাকার আর কিছু তার মা লুকিয়ে সে ব্যবস্থা সমাপ্ত করেছে। বয়স বাড়ার সঙ্গে জ্ঞানটাও বাড়ছে। বয়সের ধর্মগুলো তার মনের কোনে উঁকি মারছে। তাই ইদানিং তার ম’য়ের সঙ্গে মনিবের কথাবার্তা কেমন যেন ঠেকছে। সেদিন রাত্তিতে হুলাল মায়ের গলা জড়িয়ে সারাদিনের ক্লান্তি মেটাতে বাস্তু। চোখ দুটোতে সবে নিদ্রাদেবী ভর করেছেন। হঠাৎ মনিবের ফিস্‌ফিস্‌ কণ্ঠস্বরে তার নিদ্রা ভেঙে যায়। শুনতে পায়—“এই স্বর্ণ রাত কত হগরে? কখন আসবি। তোকে কতদিন বলেছি হুলোকে আলাদা ঘরে থাকার ব্যবস্থা করে দে। হ’হ’টা পেট পুষতে হয় আমাকে। অথচ আমি যা চাই তা পাই না। একটু ফুঁসি করব তা না। তোর যদি ভাল না লাগে চলে যা এখান থেকে।”

কোথায় আর যাব বাবু। চাইলেই কি আপনি যেতে দেবেন।

দিলে তো অনেক আগেই চলে যেতিসু। যন্তোসব ওর লেগে রাত দুপুর পর্যন্ত হা পিস্তেশ করে আসে থাকা, মেয়ের যেন অভাব আছে। আর!

হুলো এখনও ভাল করে ঘুমোয়নি। ও ঘুমুলে যাব।

বেশ ঘুমিয়েছে। আর এবার। হুলালের গলা থেকে হাত দুটো সরিয়ে একরকম জোর করে উঠিয়ে নিয়ে টানতে টানতে তার শোবার ঘরের দিকে নিয়ে যায়।

মা চলে যাওয়ার পর হুলাল চোখ মেলে তাকায়। বুকটা মোচরায় কি যেন এক অস্থিহিতে। বাবুর সঙ্গে মায়ের আচরণের প্রতি তার সন্দেহ জন্মেছে। বাড়ীর চাকর গনাথের বিদ্বেষ এই এই সন্দেহের আগুন আরও একটু গণগনে হয়ে উঠেছে। এ বাড়ীতে কত ধরনের মানুষের আনাগোনা। বিরাট চারতল বাড়ীর বেশ কিছু কক্ষে তার যাওয়া নিষিদ্ধ। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এ সব কৌতূহল বাড়ছে হুলালের। মায়ের আজকের আচরণ তাকে আরও সন্দেহান করে তুলেছে। বিছানা হতে উঠে মায়ের পিছু নেয়। বিনোদবাবু ততক্ষণে তাঁর কক্ষে ঢুকিয়ে খিল এঁটে দিয়েছেন। দরজার কান পাতে হুলাল। কানে আসে মায়ের কণ্ঠস্বর “বাবু আপনার ছোটো পায়ে পড়ছি। সূযোগ পেলেই আমি চলে আসব আপনার কাছে, আর কোনদিন ছেলের কাছ হতে ওভাবে টেনে আনবেন না। বয়স যোল হতে চলল এবার সব বুঝতে পারবে!”

বুঝুকগে। একদিন সবই বুঝতে পারবে। আর বেশীদূর পড়ানো হবে না। বেশী লেখা পড়া শিখলে আমারই শত্রু হয়ে উঠবে। তার চেয়ে মস্তান ওগাদের দলে ভিড়িয়ে দেব। করে কন্মে খাবে।

কুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে স্বর্ণময়ী—বাবু একটাই ভিক্ষা আমার—আমাকে দিয়ে যা খুশী করান কিন্তু আমার হুলোকে ওসব পথে নামাবেন না।

আরে তাতে কি হয়েছে! খানা পুলিশতো আমার হাতে, ওসবের জন্তে চিন্তা করতে হবে না। ছোটো করে কন্মে খাবার ব্যবস্থা ঠিকই করে দেব।

না ওভাবে নয় মাধ্যমিক পাশ করিয়ে একটা চাকরীতে ঢুকিয়ে দেবেন। বহু ছেলের চাকরীতো করে দিয়েছেন।

তা দিয়েছি। সবগুলোকেই প্রয়োজনের খাতিরে। চার-পাঁচ বছর ধরে খানসামাগিরি করিয়ে, বোমাবাজি করিয়ে, সে তো তুইও জানিস।

জানি বলেই বলছি। আমি তো আপনার সারা জীবনের চাকর। আমার মুখ তাকিয়ে এটুকু আপনাকে করতে হবে।

কি যে বাজে বকিসু না এমন সূযোগের রাতটা পার হতে চলল।

মা ফিরে এলে হুলাল বলে আমাদের ক্লাসের শুভেন ওর মাও অনাথা আমাদের মত। ওর মা বাজারে একটা চায়ের দোকান করেছে। ওতেই ওদের পড়ার খরচা, সংসার সব চলে যায়। আমরাও তাই করব।

বেশ তাই হবে রে। হুলালকে সাহসনা দেয় স্বর্ণ। হুতনেই চূপ করে যায়। বেশ কিছুক্ষণ পর হুলাল ঘুমিয়ে পড়ে। স্বর্ণর চোখে ঘুম আসে না। বাবুর কথাটা বারবার তার কানে বাজে—হুলোকে এবার মস্তান-ওগাদের দলে ঢোকাব। তার ছেলে চোর ওগা হবে। হয়তো বা পুলিশের

গুলিতে প্রাপ্ত হইয়াছে। সকলে তাকে চোর বলবে। না না এ কিছুতেই হতে দেবে না। দণ্ডকার হলে এখান হতে চলেই যাবে। অনেক দূরে তার বাবুর পাতা জালের বাইরে। পরক্ষণে আরও একটা ভয়ও এস করে। তার বাবু তার উপপত্নীর অন্তর্ধান রহস্য যদি ভেদ করে ফেল। তাহলে হয়তো আবার এখানে ফিরিয়ে আনবে এমনকি হুগোকে গুলি করে শেষ করে দি:তই তার বেশীক্ষণ লাগবে না। ভাবতে শিউড়িয়ে ওঠে। না না ওপথে যাওয়া হবে না। এ বাড়ী থেকে তার মুক্তি নেই একথা স্বর্ণ ভালভাবেই জানে।

— ২য় পর্ক —

স্বর্ণময়ীর বাবু অর্থাৎ বিনোদবিহারী প্রামাণিক বর্তমানে এক বিশিষ্ট সমাজসেবী রাজনেতা। ইউনিয়নের নেতা হতে রাজনেতাতে রূপান্তরিত। বর্তমানে বিধানসভার সদস্য হতে চলেছেন আগামী নির্বাচনে। তাঁর পিতৃদেবের পৈতৃক ব্যবসা ছিল দাড়ি গোফ কামানোর। সেই সুবাদে তিনি ছিলেন এক বড় সেলুনের মালিক। সেটি ছিল সিউড়ীর সন্নিকটে মিনি ষ্টীল কারখানার পাশে। কারখানাটি চালু হওয়ার সাথে সাথে তাঁর সেলুন জমে উঠেছিল। এই কারখানার সব অফিসাররা ক্ষৌরকর্ম সারতেন তার সেলুনে। বিনোদবাবু মাধ্যমিক পাশ করলে এই সেলুনে তাঁর পিতৃদেব তাঁকে ঢুকিয়েছিলেন একা সামলাতে না পেরে। তাছাড়া চাকরীর যা বাতীর। কোনদিন হবে এ আশা করতে পারেন নি। যাই হোক জাত ব্যবসায় তার কীটিকা নির্বাহ হবে তাতেই বা মন্দ কি। সাত পাঁচ ভেবে এই সেলুনেই কাজে লাগিয়েছিলেন তাঁকে। কিন্তু বেশীদিন জাত ব্যবসা করতে হল না। এখানকার ইউনিয়নের এক নেতাকে বেশ কিছু অর্থ দিয়ে এই কারখানায় একটা চাকরীর ব্যবস্থা করে ফেললেন। সেই নেতার হাতেই রাজনীতির হাতেখড়ি বিনোদবাবুর।

চাকরী পাওয়ার পরদিন হতেই ইউনিয়নের খাতায় নাম লিখিয়ে চাকরীদাতা নেতার চালা বনে গিয়ে নেতার পর্যায়ে পৌঁছাতে দেয়ী হয়নি বিনোদবাবুর। অতিদ্রুত গুণ্ডামী, দালালী, হুন্সরীতে সিদ্ধহস্ত হয়ে বর্তমান রাজনেতা হবার সঠিক যোগ্যতা অর্জন করে দীক্ষাগুরু নেতাদাদাকে লাং মেয়ে নিজেই সে স্থান অল্পদিনের মধ্যেই দখল করে নিলেন। মাস কয়েকের মধ্যে এই শহরের প্রায় শতাধিক মস্তান গুণ্ডাকে হাত করে নিজেকে শহরের প্রায় সর্বজন পরিচিত বিনোদদা বানিয়ে ফেললেন। কারখানার ইউনিয়নের সব থেকে উঁচু নেতা সেজে বসলেন।

একদিন স্বর্ণময়ীকে নিয়ে হাজির হলেন, এই চারতল বাড়ীতে দিবারাত্রীর ঝি হিসেবে।

ওঁর স্ত্রী বকুল প্রথমে আপত্তি করে বলেছিলেন, ঠিকে ঝি রাখলেই হবে।

বাধা দিয়ে বিনোদবাবু বলেছিলেন না না, সংসারের জগৎ অনেক কষ্ট করেছে, তুমি এবার একটু আরাম কর।

বকুল বলে স্বামী ছেলেকে খাওয়াব। তাদের সেবা করব। এতে কষ্টের কি আছে গো ?

না ঠিক তা নয় বকুল। আমি এখন একটা সামাজিক পজিসনে উঠে গেছি। অনেক বড় বড় লোকের আনাগোনা এখানে। তোমাকে ঝিয়ের মত খাটালে আমারই মাথা নীচু হবে। মেয়েটাও অনাথা ওর একটা গতি হবে। আর বাধা দেননি বকুলদেবী। স্বামীর সঙ্গে মতানৈক্য ঘটুক এটা চান না। তাই নীরবে সাব্ব দিয়েছিলেন সেদিন। প্রায় দশ বছর সংসারে এসেছেন কোনদিন স্বামীর কোন আদেশের প্রতিবাদ করেন নি। তাছাড়া এতদিন স্বামীর প্রতি অগাধ বিশ্বাসও অটুট ছিল। সেদিন হতে স্বর্ণময়ী তার হৃদয়কে নিয়ে এখানেই আশ্রয় নিয়েছিল বাড়ীর দাসী হিসেবে।

স্বামীর ওপর অগাধ বিশ্বাসের ফাটল ধরল একদিন।

গ্রামের মেয়ে, বোমা বাঁধা কোনদিন দেখেন নি। একদিন বাড়ীর একটা ঘরে বোমা বাঁধা চলছে এমন অবস্থায় সেখানে হাজির হয় বকুল। কর্মরত লোকদের জিজ্ঞাস করেন কি করছ তোমরা ?

একটু সংকুচিত হয় কর্মরত লোকেরা। বলে মা আপনি এখানে কেন ?

ই্যা এখানে। তোমরা কি করছ। ওমা বাকুদের গন্ধ। তোমরা বুঝি বোমা তৈরী করছ। চূপ করে যাও লোকজনেরা। বকুল দেবী বুঝতে পারেন তিনি যা আঁচ করেছেন সেটাই ঠিক। বোমা বাঁধাই চলছে।

বিনোদবাবুকে একদিন বকুল বলে—বাড়ীতে বোমা বাঁধা হচ্ছে তুমি জান না ?

বোমা বাঁধা !

ই্যা, আমাকে গোপন করে লাভ নেই। আমি সব দেখেছি।

তাতে কি হয়েছে। আমি তো তোমাদের ভুলে করছি। তাছাড়া তোমার ও ধারণা ঠিক নয়। আমার কথাই এখন শহর চলে, এবার দেখবে দেশ চলবে। আমি আর ক'দিন পর মন্ত্রী হব।

মন্ত্রী হও আর যাই-ই হও অধর্ম করলে ঠকতে হবে।

আরে রাখ তোমার ধর্ম। কোন শালা এ যুগে ধর্ম নিয়ে বড় হয়েছে। যতসব সেকলে মনোভাব। ওসব ধর্ম টর্ম মন থেকে সরেও। নতুন ফ্যাসানে জীবন আরম্ভ কর। রাজার ঐশ্বর্য্য তোমার ঘরে।

— ৫৯ পর্ব —

পরের দিন রাত্রি দশটা। লোডশেডিং চলছে। বিছানা হতে জানালার বাইরে দিকে তাকাল বকুল দেবী। আজ যেন বড় বেশী আঁধার লাগে বারটাকে। তাঁর আপন ঘরে যে এত আঁধার

এতদিন টের পাননি বকুলদেবী। পাবার চেষ্টাও করেন নি। খাই-খালানি মানুষ তিনি। সংসারের কোথা থেকে কি হয় এতদিন খোজ রাখার প্রয়োজন মনে করেন নি। আজ তাঁর কাছে এ বাড়ী যেন ডাকাতির আস্তানা। তাঁর মনে হয় যেন তাঁর সংসার বাকুদের স্বপ্নের উপর দণ্ডায়মান। যে কোন দিন আশুন ধরতে পারে। স্বামীর উপর অশ্রদ্ধার তাঁর সাথে কথা বলার প্রবৃত্তি হয়নি। বকুলদেবী আসার আগেই বিনোদবাবু শুর পড়েছিলেন। বকুলদেবীর আজ আর ডাকতে ইচ্ছা হয়নি স্বামীকে। অর্ককে বুক জড়িয়ে ধরে শুর পড়েন। কিছুক্ষণ বাদে দরজা নোকার শব্দে ভেগে উঠে দেখেন তার স্বামী বাইরে বেরুচ্ছেন। এত রাতে বাইরে! তিনি উঠে পিছু নেন, দেখেন ও স্বর্ণমন্দির ঘরে গিয়ে ঢুকল।

পরদিন সকালে বকুলদেবী বিনোদবাবুকে বলেন, আমি অর্ককে নিয়ে আর এখানে থাকব না। ভাইয়ের কাছে থাকব। সে ব্যবস্থা করে দাও।

কেন আমার কাছে থাকতে তোমার ঘৃণা হচ্ছে?

তোমার প্রতি আমার যেমন ঘৃণা হচ্ছে! একদিন তোমার ছেলে অর্কেরও তেমনটি হবে।

এত ঐশ্বর্য্য করে দিয়েও অর্ক আমাকে ঘৃণা করবে?

হ্যাঁ করবে। অর্থ আর নারীর মোহে তুমি নিজেকে হারিয়ে ফেলেছে।

নারী কি বলছে তুমি।

আমি ঠিকই বলেছি। আশাকরি এবার ঠিকই বুঝেছ।

এসব কথা তোমার কে বললে?

কেউ বলেনি, অধর্ম আমাকে দেখিয়েছে।

‘তার মানে’ গলাটা একই কৈপে ওঠে বিনোদবাবুর।

পাপ কি কোনদিন চাপা থাকেগো। তার যা ধর্ম ঠিক তাই ঘটেছে। আমি তোমার পিছন পিছন গিয়ে সব কিছু দেখেছি। আজ এও বুঝলাম তোমার কাছে এত মেয়েদের আনাগোনা কিসের জন্ত? তুমি চরিত্রহীন।

‘বকুল’.....

ভয় দেখাচ্ছ। আমি আর ভয় করি না। আমার একান্ত আপন সম্পত্তি যখন বহুজনকে ভাগ করে দিয়েছ তখন আর তুমি আপন নও। তোমার কাছে ওরা যেমন আশ্রয় তেন। তাই তোমাকে বিশ্বাস করতে পারছি না। সেজগেই বাপের বাড়ী যাব।

কি বলছ তুমি বকুল—তুমি কি পাগল হলে।

“বলতে পার এ দৃশ্য দেখার পর কোন নারী স্তব্ধ থাকতে পারে? তোমার স্তব্ধের জন্ত আমাকে ছাড়পত্র দিতে বললে তাতেই রাজি আমি।

পারিস্থিতি সামান্য দেবার চেষ্টা করেন বিনোদবাবু। দেখ বকুল এমন তো কতজনের থাকে। আমার এইটুকু দোষ তুমি মানতে পারছ না ?

হয়তো পারতাম, যদি তুমি আমাকে গোপন না করত।

আরে এসব কাজ আভকের দিনে সমাজের উচ্চ স্তরের মানুষদের কাছে কিছুই নয়। একে অপরের স্ত্রীদের নিয়ে ঘরে পাটি দিয়ে রাতে একে অপরের স্ত্রীদের সান্নিধ্য উপভোগ করে। তুমি তো পাটিতে যাওনা আমার সঙ্গে, গেলে দেখতে পাবে এটাই বর্তমান দিনে সত্যতা।

আমি অসভ্য হয়েই থাকতে চাই। তুমি অনুমতি দাও, আমি অর্ককে নিয়ে বাপের বাড়ীতে থেকে একে মানুষ করব।

মানুষ এখানে থাকলে হবে। ওখানে থাকলে হবে না। একেবারে অজ পাড়ারগাঁ। না আছে ভাল স্কুল, না আছে ভাল টিউটর। এসব বাতিল তুলে কোন্ লাভ হবে না। আর জানো তো আমার কথার বাইরে কেউ এক পা চলতে পারে না, তুমিও পারবে না। একটু ধমকর স্বরে বিনোদবাবু কথাগুলি বলেন।

তর্ক নিরর্থক ভেবে বকুলদেবী চুপ করে যান আর কোনও কথা বলেন না।

বিনোদবাবু স্ত্রীর অভিমানের কোন ধারই ধারেন না। তাই বকুলদেবী অর্ককে বুকে জড়িয়ে স্বামীর দিকে পিছন ফিরে কোন রকমে রাত কাটান। ভোর হলেও তিনি বিছানা ত্যাগ করেন না। বিনোদবাবু শয্যা ত্যাগ করার পর স্বর্ণময়ী এসে গায়ে হাত দিয়ে ডাকে—“বৌদি”

কালকেউটের মত ফুসে ওঠেন বকুলদেবী। তুই আমাকে ছুঁসনে স্বর্ণ। তোকে ছুলে পাপ হবে।

বৌদি—ফুঁপিয়ে কেদে ওঠে স্বর্ণ।

বকুলদেবীর স্বর্ণময়ীর প্রতি এতদিন মমতার অন্ত ছিল না। অনাধিনীকে আপন বন্ধে স্থান দিয়েছিলেন। তাই অভিমানে মুখ থেকে বেরিয়ে আসে—স্বর্ণ তোকে এত ভালবাসি আর তুই কিনা এই প্রতিদান দিলি—আমার বুকে ছোবল মারলি।

স্বর্ণ বুঝতে পেরে বকুলদেবীর ছুঁপা জড়িয়ে কেঁদে ওঠে বলতে থাকেন—এ আমি চাইনি বৌদি, যদি পারেন আমাকে রক্ষা করুন বাবুর কবল হতে।

এতদিন তুই আমাকে বলিসুনি কেন ?

বলতে নিষেধ ছিল। দাদাবাবু জানিয়ে দিয়েছিলেন একথা প্রকাশ হলে পাড়ার মস্তান গুত্তারা তোকে জ্যান্ত কবর দেবে।

একটু থেমে যান বকুলদেবী। তিনি বিবেচক রমণী, বুঝতে পারেন স্বর্ণের দোষ নেই। তাই আর কথা বাড়ান না।

অশ্রুজলে বুক ভাসিয়ে পা দুটো ধরে পায়ের উপর মাথা কুঁড়তে থাকে স্বর্ণ।
 ওঠ, ওঠ, স্বর্ণ আমি সব বুঝেছি রে। তবে তোকে একটা কথা বলি। তুই এবার হাতে আমার
 কথায় চলবি বল।
 হ্যাঁ বৌদি আপনি যা বলবেন আমি তাই করব।
 শুধু আপনি আমাকে ক্ষমা করেছেন বলুন।
 হ্যাঁ করেছি। তুই আপন কাজে যা, পরে কথা হবে। চলে যায় স্বর্ণ।
 বকুলদেবী অর্ককে ভাগিয়ে কোলে নিয়ে শয্যা হতে উঠে পড়েন। বাইরের জানালা হতে শীতের
 মিষ্টি হ্রাদ ঘরটাকে আলোকিত করেছে।

— ৪র্থ পর্ব —

বকুলদেবীর পিতৃগৃহে অবস্থানকালে বিনোদবাবু তাঁর সেবাদাসী স্বর্ণময়ী ও হুগালকে নিয়ে
 একদিন দীঘায় বেড়াতে গিয়েছিলেন। অসীম সমুদ্র তরঙ্গ দেখে স্বর্ণের ছেলে হুগালের মনে, এতবড়
 সমুদ্রের নীচে কি আছে তা জানার জন্য কৌতূহল হয়েছিল। তাঁর মাকে জিজ্ঞেস করেও কোন
 সন্তুষ্টির পায়নি। তেমনি সেদিন রাত্ৰিতে তার মাকে বিনোদবাবু হাতে ধরে নিয়ে যাওয়ার রহস্যটারও
 কোন সন্তুষ্টির পায়নি। এই বাড়ীটা হুগালের কাছে দীঘার সমুদ্র। এতবড় প্রাসাদের দুতিনটে
 কক্ষছাড়া তার চোকার অধিকার নেই। একদিন একজন লোককে কয়েকজনে ধরে এনে একটা
 কক্ষে পুবে চাবুক মারতে দেখেছিল। একদিন প্রাসাদের ভিতর বিরাট বিস্ফোরণ ঘটেছিল। যেন
 বোমা ফাটার শব্দ। ছুটে গিয়ে মাকে জিজ্ঞেস করেছিল—মা উপর তলায় বোমা ফাটল কেন ?

মা ধমকে দিয়েছিল—সে খোঁজে তোর কাজ কি।

আমার জানতে ইচ্ছা করে মা। ঐ বোমা ডাকাতেরা ফাটিয়ে বাড়ীতে ডাকাতি করে না, মা।

চুপ এসব কথা বলতে নেই। বাবু শুনলে জাঙ্গ কবর দেবে। কেন মা বাবু কি
 ডাকাত ? বোমা ফাটার, পুলিশে ধরে না কেন মা ?

এবার ধমকে ওঠে স্বর্ণ, তুমি ছোট ছেলে এসব কোন কথা আর কোনদিন বলবে না।

হুগাল চলে যায়। স্বর্ণ রান্না ঘরে আসে।

বকুলদেবী ডাক পাড়েন—স্বর্ণ আনাজগুলো সব কাটা হয়েছে রে ?

হ্যাঁ বৌদি সকালেই কেটে রেখেছি।

নিশ্চয় আর রান্নাটা আমিই চড়িয়ে দি।

রান্নার খুস্তিটা নাড়তে নাড়তে জিজ্ঞেস করেন—হ্যাঁরে স্বর্ণ তোর মা বাবা এখন বেঁচে আছেন ?

না বৌদি।

বিশ্বের আগে বেঁচে ছিলেন ?

না কেউই বেঁচে ছিলেন না। মা আমাকে জন্ম দিয়ে আঁতুর ঘরেই দেহ রেখেছিলেন। সে শোক সহ্য করতে না পেরে বাবা নিক্রদেশ হয়েছিলেন। পরে নাকি তাঁর মৃত্যুর খবর পাওয়া গিয়েছিল। জন্মের পর হতে আমি মামার বাড়ীতে মানুষ। মামীমা মোটেই দেখতে পারতেন না আমাকে। বই কেনার টাকাটা পর্য্যন্ত মামাকে গোপন করে দিতে হত। সেবার ক্রাস নাইনে উঠেছি। মামীমার দূর সম্পর্কের এক ভাই মানব মামার বাড়ীতে থাকত। আমরা দুজনেই একই স্কুলে পড়তাম। বেশ কিছুদিন একসঙ্গে ষঠাবসার নিজেদের অঙ্কাস্তে দুজনে দুজনের প্রতি অনুরক্ত হয়ে পড়েছিলাম। উঠতি বয়সে একসঙ্গে ষঠাবসার যা হয় তাই হল। কিছুদিনের মধ্যেই মামীমার কাছে ধরা পড়ে গেলাম। মামীমা আমাকে সরানোর ষড়যন্ত্র লিপ্ত হলেন। মামাকে আমার প্রতি একেবারে বিরূপ করে দিলেন। মামা একদিন আমাকে ডেকে জানিয়ে দিলেন। স্বর্ণ তুই এখান হতে চলে যা। তোব খেয়াল রাখা উচিত ছিল এটা তোব নিজের বাড়ী নয়।

‘কোথায় যাব মামা।’

সে আমি জানি না। এই বয়সে এতদূর এগিয়েছিস। তোকে এখানে রাখার আর আমার ক্ষমতা নেই।

সেদিনটা আমি নীরবে রয়ে গেলাম।

মানবকে সব কথা বললাম।

মানব উত্তেজিত হয়ে ওঠে – চল এখান হতে চলে যাই।

কোথায় যাব আমরা ?

কেন আমার ঘরে ?

তোমার বাবা কি এই বয়সে বিয়ে মেনে নেবেন।

আমি যখন মেনেছি। বাবাকেও মানাব. চল। ভোরেই চলে যাব এখান হতে।

কাউকে কিছু না বলে পরদিন ভোরেই রওনা দিলাম স্বামীর সঙ্গে ঘর বাঁধতে পঞ্চপুরে। কিন্তু হুর্ভাগ্য যাকে ভর করেছে তার সুখ কি কোথাও হয় বৌদি ? আমাদেরকে ঘরে ঢুকতেই দিলেন না মানবের বাবা মা। মানব এতে ঘাবড়াল না, আমাকে নিয়ে রওনা দিল বক্রেশ্বর তার এক বন্ধুর বাড়ীতে। সেখানেই রাতটা কাটল। পরদিন বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে বক্রেশ্বরের সিংহর দান করে মানব আমাকে জুঁি করে নিল। কিন্তু সম্বল বলতে তো আমাদের কিছু ছিল না। বন্ধুর ঘরে মাসখানেক কাটল। ওখান থেকে নানা জায়গায় একটা চাকরীর চেষ্টায় ঘুরতে লাগল মানব। কিন্তু যেখানে হাজার হাজার শিক্ষিত বেকার সেখানে মানবের মত অল্প শিক্ষিত মানুষের চাকরীর আশা / শারদীয়া সংখ্যা—১৫২

কথা ভাবাই যায় না। বেশ কয়েকদিন ঘোরাফেরার পর ওই গ্রামে এক রাজনৈতা আমাদের ছবাবস্থার কথা চিন্তা করে মানবকে সঙ্গে নিয়ে দাদাবাবু কাছে হাজির হলেন। দু'দশ দিন আনাগোনাতেই একটা অস্থায়ী চাকরী করে দিলেন মিনি ষ্ট্রীট প্রান্টে। প্রথম মাসের বেতন পাবার পরই আমাকে নিয়ে ওখানকার কোয়ার্টারে তুলল। বহর হুয়েক বেশ ভালভাবেই কাটল, চাকরীটা পাকা হল। আমার হুলাল তখন তিন মাস গর্ভে। মানব সেদিন আমাকে নিয়ে বক্রেখুর পুজো দিতে যাবে। আমরা বাস ধরার জন্যে ট্যাঙ্ক দাঁড়িয়ে। এমন সময় দাদাবাবু ট্যাঙ্ক চড়ে ওখানটা পেরিয়ে যাচ্ছিলেন। মানবকে দেখে ট্যাঙ্ক দাঁড় করায়। ওকে জিজ্ঞেস করেন, কোথায় যাবে।

মানব জবাব দেয়, আমরা বক্রেখুর যাব পুজো দিতে।

দাদাবাবু আমার দিকে দৃষ্টি দিয়ে বলেন 'এটা কেবল মানব?'

মানব হেসে বলে 'আপনার বৌমা।'

আমি গাড়ীতে ওঠ, আমরা চল্লপুর যাব।

কোন কিছু চিন্তা না করে কৃতার্থ হয়ে ট্যাঙ্কিতে উঠি। বাবুর পাশে আমাকে বসতে হল। যতই হোক স্বামীর অফিসের ইউনিয়নের বড়বর্তা। সেদিন আর দাদা চল্লপুর যাননি। আমাদের সঙ্গে পুজো দিয়ে আমাদেরকে কোয়ার্টারে নামিয়ে দিয়ে ওখানে চা খেয়ে বাড়ী ফিরলেন। তারপর প্রায় আমাদের কোয়ার্টারে আসতে লাগলেন। সেদিন বুঝিনি বৌদি মেয়েদের মনের বাঁধন অত আলগা করতে নেই। তাছাড়া দাদাবাবুকে ধরলে স্বামীর প্রমোশন হবে, বেতন বাড়বে, এটা স্বামীর মুখ থেকেই শোনা।

বেশ কিছুদিনের মধ্যেই ওনার লোলুপ চাহনি আমাকে ভাবিয়ে তুলতে লাগল। মানবকে জানাতে পারিনি ভয়ে। হয়তো বা দাদাবাবুর সঙ্গে ঝগড়া বাধিয়ে বসবে। মনের মধ্যে অনুশোচনা জ্বলে, কি করলাম; কেন প্রথম দিনেই দাদাবাবুকে আসতে নিষেধ করিনি।

হঠাৎ একদিন মানব 'তখন রাত্রির ডিউটিতে। বাসায় একা। দরজায় ঢোকা মারার শব্দে দরজা খুলে দিই। দাদাবাবু ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দেন। কথাবার্তার টের পাই নেশা করেছেন। আমাকে হুহাতে জড়িয়ে ধরে বলতে থাকেন—তোমাকে যেদিন হাত দেবছি সেদিন হাতে বাত্রে ঘুম নেই। আজ আর ছাড়বনা তোমাকে। আমি হতভয় হয়ে পড়ি। কি করব ভেবে উঠতে পারি না। এও জানি ওনার কথার অবাধ্য হলে চাকরীটাও খোয়া যাবে। পৃথিবীটা যেন আমার চোখের সামনে বনবন করে ঘুরতে থাকে। প্রাণপনে বাহুবল্টেন হতে নিজেকে মুক্ত হবার চেষ্টা করি। বলি ছাড়ুন, আপনার পায়ে পড়ি।

এবার ধমকে উঠলেন তিনি। আমাকে ছাড়লে তোমাদের এখান হতে চলে যেতে হবে।

আর ছাড়তে সাহস হল না। আমার ইজ্জত লুটে নিলেন সেদিন। ঘন্টাখানেক পর বেদিয়ে গেলেন। আমার সারারাত ঘুম এল না।

ডিউটি শেষ করে রাত্রি তিনটের সময় ঘরে ফিরল মানব। ওকে দেখেই আমার চোখ দিয়ে জল করতে লাগল। স্বর ক্লান্ত হয়ে এল। মানব ক্রমাগত বের করে চোখ মুছিয়ে দিবে ভিজ্জেস করে কীদহ কেন কি হল তোমার ?

সবকিছু গোপন করে বলি "তুমি চলে যাওয়ার পর হতে আমার তলপেটে প্রচণ্ড বেদনা। একদম উঠতে পারি না।

তাই নাকি ? তাহলে তো ডাক্তারের কাছে নিয়ে যেতে হবে।

এখন কমে গেছে। আরও কিছুক্ষণ দেখি। বিশেষ কিছু না বলে, ঢাকা দেওয়া হুখের পাঞ্জটা হাতে ধরিয়ে আমি শুয়ে পড়ি। মানব হুখটা খেয়ে আলো নিভিয়ে পাশটিতে শুয়ে পড়ে তলপেটে হাত বুলিয়ে যন্ত্রণা কিছুটা লাঘব করতে চায়। কিন্তু ওর সোহাগে আসল যন্ত্রণা আরও বেড়ে গিয়ে নীরবে অশ্রু হয়ে ঝরতে থাকে। মানব টের পার না। ভাবে আমি ঘুমিয়ে পড়েছি। এক সময় রাত্রি জাগরণের ক্রান্তি ওকে ঘুম পাড়িয়ে দেয়।

এভাবে বছর চারেক-কাটল। হুলোর কন্ঠ হল।

মানবের রাত্রি ডিউটি থাকাকালীন প্রায় দিনই দাদাবাবু আমার কাছে আসতেন। এই চার বছর কাকপক্ষীও টের পেল না আমাদের সম্পর্ক। চার বছরের এই সম্পর্কটাও গা সঞ্চার হয়ে গেছে। মনের মধ্যে পাপ বোঝটাকে একরকম সরিয়েই ফেলেছিলাম। ইতিমধ্যে বাবুর দেওয়া অনেক সোনার গহনা আমার হাতে এসেছিল। সেগুলো বাবুর মধ্যে গোপনে রাখা ছিল। পাপ চাপা থাকেনা বলেই একদিন মানব সেগুলোকে দেখে ফেলে আমাকে ভিজ্জেস করে। বলি, গহনা-গুলো মামা আমাকে দিয়েছিল, তোমাকে বলিনি। ওর মুখ চোখ দেখে বুঝতে পারি কথাগুলো বিশ্বাস করেনি।

লজ্জার খাওয়া সেরে আমাকে দরজা বন্ধ করতে কলে বেরিয়ে গিয়েছিল মানব। আমি তখন বাথরুমে। ঘুশাকরেও বুঝতে পারিনা ও ডিউটীতে না গিয়ে আমাকে লক্ষ্য রাখবে। আগের দিন দাদাবাবুকে নিষেধ করার সময় পাইনি। যথাক্রমে দাদাবাবু এসে ভেজানো দরজা খুলে ভিতরে ঢুকেন। তারপর অল্পাধিক দিনের মত দাদাবাবুর সঙ্গে সঙ্গদান করে তাকে তৃপ্তি দিতে ব্যস্ত হয়ে পড়ি। এমন সময় আমাদের শোবার ঘাটের পিছন হতে মানব সামনে এসে দাঁড়ায়। দাদাবাবু ঋতমত খেয়ে ঘর হতে বেরিয়ে যান। বুঝতে পারি মানব ডিউটী বায়নি। ঘরের কোণায় লুকিয়ে ছিল।

আমার সামনের পৃথিবীটা যেন উলটিয়ে গেল। লজ্জার ভয়ে আমার উদভ্রান্ত মনটা হার হার করে উঠল। কোন কথা না বলে মানব আস্তে আস্তে বেরিয়ে যায়। বুঝফাটা আর্ন্তনাদে ওকে জেকে সব কথা বলব মনে করলাম কিন্তু পারলাম না। ওকে স্পর্শ করতে আমার সাহস হল না। কিছুক্ষণের মধ্যে ফিরে এস মানব। সোজা গিয়ে বৈঠকখানার দরজার খিল এটে দিল।

কিছুক্ষণ সামলে নিয়ে অনেক কাকূতি মিনতি করে মানবকে দরজা খোলাতে পারি না। সকালে ওঠেও অনেক ডাকাডাকি করেও কোন সাড়াশব্দ পাই না। বাবা হয়ে পাশের কোঠাটারে লোকজন ডেকে দরজা ভেঙে ভিতর ঢুকে দেখতে পাই মানবের নিশ্চয় দেহটা। পাশেই ঘুমের বড়ির প্যাকেট।

কথাগুলো বলেই স্বর্গের কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে আসে। কিছুক্ষণ সামাল দিয়ে আবার বলতে শুরু করে। মানবের শ্রদ্ধাশ্রুতি সেরে এখান হতে স্বপ্নবাড়ীতে চলে যাবার মনস্থির করে আমি ষ্টেশনে উঠি। দাদাবাবু ভানতে পেরে সোভা স্টেশনে হাজির হয়ে একরকম ভোর করে আমাকে এখানে নিয়ে আসেন। এখান হতে গেলে নাকি আমার পরিভ্রাণ নেই। একথাও ভানিয়ে দেন। আমিও আর অমত করিনি। আমাকে তো খেটেই খেতে হবে। সেই হতে আমি এখানে রয়ে গেলাম।

— ৫ম পর্ব —

হেমন্তের সকাল। শীত না পড়লেও তার আমেজ বাড়ছে। বিনোদবাবু হাফহাতা সোফেটার গায়ে দিয়ে তার ডুইংকমে বুদ্ধিদাবার গুটির চাল চালতে বাস্তু। এমন সময় গৃহভৃত্য গদাধর এসে ডাকে “বাবু নীচে বৈঠকখানায় একজন ডাকছে।”

নীচে নেমে আসেন বিনোদবাবু। ঘরে ঢুকে বলে ওঠেন, আরে শাসমসজী আপনি ?

হাঁ। বিনোদবাবু হামি। একটো তরুরী ব্যাপারে আপনার কাছে আসতে হল। আপ বৈঠে।

ঠিক আছে বলছি। এত কষ্ট করে আসার কি দরকার। টেলিফোনে বললেই তো পারতেন। চেয়ারে বসে কথাগুলো বলেন বিনোদবাবু।

না না বিনোদবাবু ফোনে ওসব কথা হোবে না। শালা টিকটিকির বড় উপদ্রব বাড়ছে। যাকগে ও কোথা। আমাদের মহলেত স্বর সর্বযে কা তেল আউর ফাটিলাইজার কা দাম একমাসমে হুগণা হোবে।

তা আমাকে কি করতে হবে।

কুহুতি নেহি। হামি মাল গুদামমে ভরিয়েছি। এতা দর বাড়লে পাবলিকভি হামলা করবে। বলবে মাল আগের রেটে দিতে। তোখন আপনি বলবেন ও মাল আপনি সপদা করিয়েছেন। তোখন আর কেউ হামলা করতে পারবে না। সোব পাবলিক আপনার বশে। এফিটে যা হবে ফিফ্টি ফিফ্টি।

ও এই কথা। সেই আগের বারের মত।

ঠিক ঠিক। সিবর পাবলিক হামলা করে নাই আপনার কুপায়। এই বিশ হাজার আন্তভাল। কাজ হাসিল হোবার পর বাকী দেগা।

কিছু শাসনসজী, যদি শেষটার আমার কথা না শোনে।

আরে ঠিক শুনবে। ওভি হামরা মালুম করেছি।

টাকার বাণ্ডিল ছোটো হাতে নিয়ে ড্রয়ারে রেখে বলতে থাকেন এবার একটু কফির ব্যবস্থা করি।

আরে না না হামি গণেশজীর পূজা না সে:র কুছভি খানা খাই না। ইবার উঠি। আবার মূলকাত হোবে। উঠে পড়েন শাসনসজী।

বকুন্দেবী জল খাবারের ভাড়া দিতে আসেন। কি গো এতবেলা হল কি ভাবছ বসে বসে। জলখাবার তৈরী। এস।

আরে জলখাবার? এইতো এক লাখের ব্যবস্থা হল সেই সঙ্গে ভোটে জেতার ব্যবস্থাও বুঝলে।

আমার বুঝে কাজ নেই গো।

আচ্ছা বকুল আমি তোমাদের জন্তে গাড়ী, বাড়ী, অর্থ কত কি করলাম তবু তোমাদের মন পেলাম না কেন বলতে পার?

তুমি আমার জন্তে করনি। তুমি করেছ তোমার জন্ত।

আমি কি এ সব একা ভোগ করছি।

ই! একরাস্তা তাই—তুমি একাই ভোগ করছ। তুমি আত্মস্বর্গী। প্রতিদিন নিতান্ত নূতন নারীতে আসক্ত হয়ে আমার বুকে হাতুড়ীর ঘা পেটাচ্ছ। আমার কি মনে হয় জান আমরা বাকুদের স্ত্রীর উপর বসে আছি। যে কোনদিন তাতে আগুন ধরবে। এর চেয়ে ছোটো শাকু ভাতে বেঁচে থাকা অনেক ভাল।

“তোমার বোধশক্তি বড় কম বকুল। টাকার পাথর কাটে।”

সেই পাথর ছুটে এলে টাকা ওয়ালারও মৃত্যু হয় এটাও খেয়াল রাখা দরকার গো।

আমার সব খেয়াল আছে। তোমরা মেয়েছেলে কতটুকু বুদ্ধি ধর।

সে ধারণাও তোমার ভুল। মেয়েরা দেশের প্রধানমন্ত্রী হচ্ছে। আমি বলে রাখছি তোমার মস্তানরাই তোমাকে একদিন শেষ করবে। এখনও সময় আছে আগুন নিয়ে খেলা ছাড়।

আমার পোষা মস্তানরা আমার বিশ্বস্ত। দেখতে গেলে ওরাই আমার উন্নতির মূল।

তোমার ভুল ধারণা। ওগো বদমায়েস লোকেরা কারো বিশ্বস্ত হয় না।

এবার বিরক্ত হয়ে ওঠেন বিনোদবাবু। বলে ওঠেন বেশ যাও তো, সাতসকালে তোমাকে আর জান দিতে হবে না। মেয়েছেলে মেয়েছেলের মত থাক। তোমার তর্কের অধ্যাসটা দিন দিন বাড়ছে।

এটাও তোমার ভুল ধারণা। তুমি যা করছ কর গে, আমাকে শোনালে কেন? আমি তো আর যেচে তর্ক করতে আসিনি।

বেশ তুমি এখান হতে যাও তো। জলখাবার ঠিক করে এখানে নিয়ে এস। এক্ষুণি বেরব।

আর কথা না বাড়িয়ে রান্না ঘরের দিকে রওনা দেন বকুলদেবী।

বিনোদবাবু আবার কর্মদাবার গুটির কুটচালে মগ্ন হয়ে পড়েন।

একটুপর বকুলদেবী চা জলখাবার এনে দিয়ে যান। কুটচালের সাথে সাথেই সেগুলো গলার্ধ করতে থাকেন বিনোদবাবু।

— ৬ষ্ঠ পর্ব —

ফাগুনের প্রথম সপ্তাহ। এমন সময় সিমুল গাছের শোভা বড়ই সুন্দর। পত্রবিহীন শাখার লাল ফুলে নয়নলোভা সমারোহ।

বকুলদেবী স্বর্ণকে জিজ্ঞেস করে অর্কের মাষ্টারমশাই আজ পড়াতে আসেনি ?

না দিদিমনি এখনও আসেননি ত।

বকুলদেবী আপনমনে গজরাতে থাকেন।

স্বর্ণ রান্না ঘরের দিকে চলে যায়।

বকুলদেবী অর্কের কাছে গিয়ে বসে। জিজ্ঞেস করেন, কাল স্কুলের পড়াগুলো হল।

না এখনো হয়নি, করছি।

বেশ কর, বকুলদেবী অর্কের পাশে বসেন পড়ার তাগিদ দেওয়ার জন্ত।

ভোটের আর মাত্র পনের দিন বাকী। বিনোদবাবুর নাওয়া খাওয়ার সময় নেই। প্রচারের খরচ কিছু পার্টির কাছ হতে নিয়েছে। শাসমলজীর কাছে বাকীটা পাবার কথা পেয়েছে। দেশের বেনিয়ামতেরেব জয় জয়কারের সুবাদে। বাবসাদার মহলের হোমরা চোমরা শাসমলজী। ওদের ভোটগুলোও বিনোদবাবুর পাওনার খাতায় উঠবে। প্রায় দশখানা গাড়ী ছুটেছে বিনোদবাবু প্রচারের জন্ত। বিনোদবাবুর রাত্রেও ঘুম নেই, কোথায় হরিজন পল্লীর মহোৎসব দিতে হবে; আবার কোথাও বোমা বর্ষণ করিয়ে মানুষের মধ্যে ভীতি ধরিয়ে ভোটে রিগিং করাতে হবে। এই চিন্তায় দিনরাত মগ্ন। এলাকায় এলাকায় মিটিং করে সূচত্বর বাক্যবাণে দীন হুঃখী মানুষদের জন্ত কুস্তীরাক্ষ বিসর্জন করে চলেছেন। নানা কৌশলে আপন ভোট-নৌকার পালে অনুকূলে হাওয়া লাগিয়েছেন। তাঁর জয়ের সম্ভাবনার বাতাস বইছে। তাঁর প্রধান সাগরেদ নাড়ু। এই এলাকায় লেডো বলে পরিচিত সে। ঘরে মদের ভাটি বসিয়েছে। রাত্রে মাতাল অবস্থায় তার গুরুকে প্রতিদিন জিতিয়ে ফেলে।

এভাবে বারদিন কাটে। সবার প্রচারপর্ক সমাধা হয়। এবার গোপন প্রচারের পালা আসে। তাঁর সাগরেদরা কেউবা টাকার খলি, কেউবা বোমার খলি হাতে নিয়ে আপন কর্তব্য সিদ্ধির জগু উদগ্রী। ঘুরিষা বুখে এখনও পর্যন্ত ওরা নাক গলাতে পারেনি। অথচ ওখানে ছোটো বুখে হুঁহাজার ভোট। প্রতিপক্ষের লোকজনদের এটা অভ্যুদগ। তবু ভোট করাতে হবে। কিছু না পারলেও অন্ততঃ ভীতি ধরিয়ে বুখটার ভোট দেওয়ার হার কমাতে হবে। সারারাত্রি পরামর্শের পর ঠিক করে ফেলেন বিনোদবাবু—স্বর্গর ছেলে হুলা নাবালক। ব্যাগ ভর্তি বোমা নিয়ে ভোট শুরু হওয়ার পরেই হুঁচারটে ছুঁড়বে। সঙ্গে সঙ্গে একে পুলিশ তুলে এনে থানার রাখবে। নাবালকের জগু তার দোষ বর্তমান আইনে প্রযোজ্য হবে না। পাগল বলে একে ঘরে ফিরিয়ে আনবে। এতে লোকজনের মধ্যে ভীতি ধরবে। অনেকেই ঝামেলার ভয়ে ভোট দিতে আসবে না। এটাই ঠিক হয়।

পরদিন কথাটা পারেন বিনোদবাবু স্বর্গর কাছে। বলেন “স্বর্গ তোর হুলাকে কিন্তু হুদিন আমাদের সঙ্গে ছেড়ে দিতে হবে।

স্বর্গর বুকাটা কেপে ওঠে, বলে ও ছেলেমানুষ, আপনাদের কি কাজে লাগবে ?

এমন কিছু নয়। একটা বোমের খলি থাকবে ওর হাতে ঘুরিষা বুখে যখন সবাই ভোট দেবার জগু জুটবে—তখনই হুঁচারটে এখানে সেখানে ছুঁড়বে। সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ একে তুলে নেবে গাড়ীতে। থানার আনাবে। আমি গিয়ে একে ঘরে নিয়ে আসব।

ওটুকু ছেলে ওর হাতে বোমের খলি থাকবে। আঁতকে ওঠে স্বর্গ।

এ আর এমন কি কাজ। আমার জগু কি ওটুকু করতে পারবে না।

ডুকের কেদে ওঠে স্বর্গ। বাবু আপনি পারবেন অর্কের হাতে বোমের খলি ধরাতে! না না এ আমি করাতে পারবো না কিছুতেই না।

এবার গর্জে ওঠেন বিনোদবাবু—জানিস্ তো আমার ইয়া কোনদিন না হয় না। যা তুই নিজের কাজ কর গে। কাল সকালেই একে সঙ্গে নেব। নির্দেশ জারি করেই ঘর হতে বেরিয়ে যান বিনোদবাবু।

স্বর্গ ছুটে এসে বকুলদেবীর হুপায়ে লুটিয়ে পড়ে কঁদতে থাকেন। এবার কি হবে বৌদি। কাল সকালে দাদাবাবু হুলায় হাতে বোমার খলি দেবে। ওকে সেগুলো ঘুরিষা বুখে ছুঁড়তে হবে। আমাকে বাঁচান বৌদি।

তাই নাকি!

ইয়া বৌদি, স্বর্গের অশ্রুজলে বকুলদেবীর পদতল সিক্ত হয়।

ভতফণে হুলা ছুটে এসে মায়ের কাছে দাঁড়িয়েছে।

স্বর্গ এবার উচ্চস্বরে কেঁদে ওঠে, বৌদি এবার কি করব আমি ?

বকুলদেবী স্বর্ণকে হুহাতে বুকে তুলে নিয়ে অশ্রু মোছাতে মোছাতে বলেন, আজ সন্ধ্যার আগেই
হুলোকে এখান হতে সরতে হবে। সব আমাদের গোপনে করতে হবে।

এবার কান্নায় থামায় স্বর্ণ।

কিন্তু কোথায় যাবে এইটুকু দুঃখর ছেলে দেশের হাল চাল জানে না।

সে আমি ব্যবস্থা করব। তুই মন খারাপ করিস না।

যদি ধরা পড়ে বৌদি তবে ওকে যে খুন করে দেবে দাদাবাবু।

সে চিন্তা তোব নেই। ওকে এ মূল্যেই রাখব না। কলকাতা পাঠাব। আমার এক
আত্মীয়ের কাছে। সেই ওখানে একটা কাজে ঢুকিয়ে দেবে। তোব হুলা অস্তিত্ব সংভাবে বেঁচ
থাকবে সেখানে। বয়স তো প্রায় সতের হাত চলল।

আমি কি করে কাটাব বৌদি। আমিও এর সঙ্গে যাব।

নাহে তা হয় না। তোব যৌবন এখনও য'য় নি। শুনেছিস তো আমাদের দেশে মেয়ে
বিক্রী হয়। তোব যা রূপ তোব পক্ষে একা বাইরে থাকা উচিত নয়।

আমি তো বিক্রি হয়ে আছি বৌদি। নতুন করে আর কি বিক্রি করবে।

এখানে তবু তো পদে আছিস। একা বাইরে বেরুগেই নরপশুর দলগুলো শকুনের মত
ছিঁড়ে ছিঁড়ে তোব যৌবন খাবে। এ দেশে মেয়েদের যে কোন নিরাপত্তা নাই যে।

হুলোকে বুকে জড়িয়ে ফোঁপাতে থাকে স্বর্ণ। হুলা তুই আমাকে ছেড়ে বাইরে থাকতে পারবি ?

কেন তোমাকে সঙ্গে নিয়ে যাব ?

বকুলদেবী বাধা দেন তুই ছেলেমানুষ হুলা, বড় হ ওখানে গিয়ে রোজগার করতে শেখ,
তারপর মাকে নিয়ে তোব কাছে রাখবি।

কিন্তু বড়মা কলকাতায় গিয়ে তোমার আত্মীয়ের বাড়ী কি ভাবে ঠিক করব।

সব বলে দেব। আমার কাছে হাজার দশেক টাকা আছে তাও দেব। কাজ যদি কিছু
না পাস তবে বাবসাতে লাগাবি।

মাকে সান্ত্বনা দেয়, মা দেখো আমি ঠিক রোজগার করতে পারব। তারপর হুবহুরে মধ্যে
তোমাকে নিয়ে যাব।

আরও নিবিড়ভাবে জড়িয়ে ধরে স্বর্ণ হুলালকে।

বকুলদেবী ঘরের ভিতরে যায়।

স্বর্ণ হুলালকে তার চলে যাওয়ার কারণ বলতে থাকে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই বকুলদেবী ছোট একটা পুরানো ত্রিফকেশ হাতে এসে দাঁড়ায়। বলে হুলাল তুই জামাকাপড়গুলো প'রে ফেল। এফু'নি বেরুতে হবে। অমানুষটা ঘরে এলে আর বেরুতে দেবে না। এই বারোটোর ট্রেনেই পাঠাব।

হুলাল মাকে ছেড়ে জামাকাপড়গুলো বদলিয়ে ফেলে। মা তুমি চিন্তা করোনা। হু হাতে মায়ের চোখের জল মোছাতে থাকে।

বকুলদেবী টাকাগুলো তার হাতে দেয়। এগুলো কোমরে বেঁধেনে। শুধু এই ক'টা টাকা বাইরে রাখ। রাস্তায় খরচ করবি। কোমরে বাঁধা টাকার কথা কাউকে বলবি না।

বড়মা কার কাছে উঠব বললে না।

রাস্তায় যেতে যেতে সব বলব। এই ত্রিফকেশটা নে। এতে অনেকগুলো কাপড় জামা আছে। হু বৎসর পেরিয়ে যাবে। ট্রেনে তোকে চড়িয়ে দেব। একেবারে হাওড়া ষ্টেশনে নামবি। ওখান হতে বেরিয়ে যেখানে স্ট্রিমার খামার ঘাট, সে ঘাটের বাঁ পাশে সাতখানা ঘরের পর আমার খুড়তুতো দাদার হোটেল আছে, ওর নাম “জয় মা তারা” হোটেল। সেখানেই উঠবি হু বছর ওখানে থেকে শিখে নিয়ে নিজের একটা হোটেল করবি। দেখবি তোর ভাত ভুতে যাবে। এই নে আমি চিঠি লিখে দিয়েছি এটা রাখ। তোর খবরাখবর আমার বাড়ীর ঠিকানায় চিঠিতে দিবি। তোর ঠিকানা দিস না তা নইলে জানাজানি হয়ে যাবে। এবার চল আর দেবী করলে ট্রেন পাবি না। স্বর্ণ এবার ছেড়ে দে।

মাকে প্রণাম করে বেরিয়ে পড়ে হুলাল। ঈশ্বর যেন তাকে সাহস জুগিয়েছেন। তা নইলে এতটুকু ছেলে এখান হতে চল যেতে বুক কাঁপল না! নয় তো কেঁপেছিল মায়ের সামনে তা প্রকাশ করল না।

বকুলদেবী ও হুলালকে নিয়ে ট্যাক্সিটা মিলিয়ে গেল।

স্বর্ণ “হুলালের” বলে ফুপিয়ে কেঁদে উঠে। টলতে টলতে আপন শয়নকক্ষে এসে বিছানায় শুয়ে অশ্রুজলে উপাধান সিক্ত করতে লাগল।

ট্যাক্সিটা এক সময় বোলপুর ষ্টেশনে এসে দাঁড়ায়। বকুলদেবী ও হুলাল আসে ষ্টেশন চত্বরে। একটা হাওড়ার টিকিট কেটে আনেন বকুলদেবী, সেটা হুলালের হাতে দেয়। ততক্ষণে ট্রেনটাও পৌঁছে গেছে। হুলালকে নিয়ে ট্রেনটা ষ্টেশন পরিত্যাগ করে। ট্রেনের জানলা হতে হুলালের হাতনাড়া তার বড়মা অশ্রুভজা চোখে আর দেখতে পার না। কি এক অজানা ব্যথায় বকুলদেবীর অন্তরটা মোচড়াতে থাকে। তার মনে হয় একটা ছুধের বালককে তিনি যেন অপমৃত্যুর দিকে ঠেলে দিলেন। জানা শোনা নেই, কলকাতার মত আজব শহরে কি করবে সে। মনকে সান্ত্বনা দেন ঘাই করুক এই নরককুণ্ড হতে সে মুক্তি পেল। চোখ দুটো মুছে ষ্টেশন পরিত্যাগ করে আবার ট্যাক্সিতে ওঠেন। ট্যাক্সি তাঁকে নিয়ে কিছুক্ষণের মধ্যে বাড়ীতে পৌঁছে দেয়।

ঘরে গিয়ে দেখেন স্বর্ণর কাছে অর্ক বসে আছে ।

মাকে ঢুকতে দেখে বলে ওঠে—মা স্বর্ণমাসী কঁাদছে কেন । জিজ্ঞেস করলেও কোন কথা বলছে না ।
ওর হলো হারিয়ে গেছে রে ।

খ্যাত হুলালদা বড় ছেলে । ও আবার হারায় নাকি ?

সত্যি হারিয়ে গেছে । আমি তো খুঁজতে গিয়েছিলাম কোথাও পেলাম না তাকে ।

বাপিকে বললে বাপি ঠিক খুঁজে বের করবে । মাসীকে কঁাদতে নিষেধ কর । স্বর্ণমাসীকে ধাবকা দিয়ে বলতে থাকে, মাসী কেঁদোনা, বাপি দাদাকে ঠিক খুঁজে আনবে ।

স্বর্ণ এবার অর্ককে হুহাতে জড়িয়ে ধরে বলতে থাকে “ও আর ফিরবে না বাবা ।” তুমি স্কুল হতে ফিরে কিছু খাওনি । যাও মাসের কাছে খেয়ে নাও ।

বকুলদেবী স্বর্ণর মাথার কাছটিতে বসে সান্ত্বনা দিতে থাকেন “স্বর্ণ একটু শক্ত হ । তোর হুলাল মুক্তি পেল । জ্ঞান হয়েছে ঠিক করে কন্মে যাবে । তুই ভাবিস না, ওঠ কিছু মুখে দিবি ।”

স্বর্ণর কান্না থামে না । বকুলদেবী একজন মা হয়ে এর কারণ উপলব্ধি করেন । আর কথা বাড়ান না । অর্ককে নিয়ে যান রান্নাঘরের দিকে । কিছুক্ষণের মধ্যে তাকে খাইয়ে খাবার আনে স্বর্ণর জ্ঞে । ডাকে, স্বর্ণ ওঠ, খেয়ে নে ।

কিছুক্ষণ বাদে বিনোদবাবু ফিরেছেন । ফিরেই স্বর্ণকে ডাকেন । এই স্বর্ণ তোর হুলোকে খাইয়ে দে এরা এসেছে এখনই সঙ্গ কর নিয়ে যাবে । রাতে ওখানে থাকবে ।

উত্তরটা বকুলদেবী দেন, বলেন—ওর হুলাল হারিয়ে গেছে । বিকেল হতে ওর সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে না ।

কি ! হারিয়ে গেছে ! ঠিক স্বর্ণর কারসাজি । স্বর্ণকে ধরে বিনোদবাবু ক্রুদ্ধ হয়ে তিরস্কার করেন ।

বকুলদেবী ঝাঁঝিয়ে ওঠেন । ছেড়ে দাও ওকে ! হলো ওর কাছ হতে হারায়নি । হারিয়েছে আমার কাছ হতে । আমি ওকে নিয়ে বাজারে কিছু জিনিস কিনতে গিয়েছিলাম । জিনিসগুলো কেনার পর দেখি ও আমার কাছে নেই । এখানে সেখানে খুঁজে কোন সন্ধান পেলাম না । স্বর্ণকে ছেড়ে যা করতে হয় আমার কর ।

ওই হারামজাদী সব জানে । হুঁচর ঘা মুষ্টিযোগেই সব কবুল করবে ।

আবার ওর গায়ে হাত দেয়, ছেড়ে দাও বলছি অমানুষ কোথাকার । তোমার জ্ঞেই ও স্বামীকে হারিয়েছে আবার ছেলেকে হারাল । তুমিতো ওকে বি গিরি করার জ্ঞ আনোনি এনেছো ওকে ভোগ করতে ।

আর কথা বাড়াল না বিনোদবাবু। ঘর হতে বেরিয়ে যেতে যেতে বলতে থাকেন—এত বছর ভুত
পুষে বিপদের দিনে নেই। ভোটের পর যেখানেই থাক খুঁজে এনে পেটাব। যতসব অকৃতজ্ঞের দল।
লেড়ো.....ও লেড়ো।

লেড়ো হাজির হয়, কি বলছ গুরু ?

অন্য কোন ফন্দি করতে হবে।

— ৭ম পর্ব —

বিনোদবাবু বলেন লেড়ো হারাধনকে ডাক।

লেড়ো হারাধনকে ডেকে আনে।

শোন হারা তোর পাড়ার রহিম তোর সঙ্গে জমি জমি করে ঝগড়া করেছিল, তোকে মেরেছিল—
এবার শোধ নিয়ে নে।

হারাধন বলে ওর ক্ষমতা বেশী, আমি ওর সঙ্গে পারবেক নাই।

ঠিক পারবি আমরা সাহায্য করবো। খালি তুই রাত্রি বারোটোর সময় চিংকার করে পাড়ার
লোকদের জাগিয়ে বলবি রহিম এসেছিল আমার বউকে ধরতে। চিংকার করতে ছুটে পালিয়ে গেল।
আমার লোকরা থাকবে, তোর চিংকার শুনে রহিমকে ধরে পিটতে আরম্ভ করবে। তারপর যা হয় আমরা
দেখব। এই নে এক হাজার টাকা। কাজ শেষ হলে আরও হাজার দেব।

টাকা আর প্রতিশোধের লোভে রাজি হয় হারাধন।

চল গুরু এখানকার কাজ শেষ। আমরা গ্রামের বাইরে অপেক্ষা করি। দাঙ্গা বাধলেই থানায়
খবর দেব। লেড়ো হুজুন লোক সঙ্গে নিয়ে রওনা দেয় তাদের অপেক্ষারত ট্যাক্সির উদ্দেশ্যে। ওখানে
গিয়ে গ্রামের দাঙ্গার হৈ-হট্টগোল শোনার জন্য কান পেতে থাকে। কিছুক্ষণের মধ্যে তা কর্ণগোচর হয়।
গ্রামের মধ্যে মারুমারু কাট্কাট্ শব্দ। দাঙ্গা বেধে গেছে। এবার বিনোদবাবু সকলকে নিয়ে ওখান
হতে কেটে পড়েন। তারপর ওনার লোক গ্রামের অধিকাংশ লোকের নাম লেখা একটা আসামীর লিস্ট
থানার মেজবাবুর হাতে তুলে দিয়ে আসে। সকাল হতে না হতেই হারাধন বাগ্দী ও আরও কিছু
লোক রক্তমাখা অবস্থায় থানায় আসে। রহিমের দলেরও কিছুলোক রক্তমাখা অবস্থায় আসে।

মেজোবাবু হু পক্ষকেই থানার লক আপে পুরে তালা বন্ধ করে সরেজমিন তদন্ত করতে যান
একগাড়ী ফোর্স নিয়ে। গিয়ে দেখেন গ্রামের হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে ঝগড়া চলছে। তখনও ঝগড়ার
জের মেটেনি। ঝগড়ারত অবস্থায় থাকে সামনে পেলেন তাকেই টেনে গাড়ীতে তুলে এনে থানার
লকআপে পুরে রাখলেন। গ্রামের শান্তি রক্ষার জন্য একগাড়ী ফোর্স ভোটের বুথে দেওয়ার ব্যবস্থা
আজ্ঞা / শারদীয়া সংখ্যা—১৬২

করে তাঁর প্রশাসনিক কর্তব্য পালন করলেন। এতে ঘুরিয়া বুধের ভোট একরকম বানচাল হল। আঠারোশো ভোটদাতার মধ্যে সন্ধ্যা ছটা পর্যন্ত ভোট পড়ল মোট তিনশটি। ভোট দিল কিছু মহিলা আর অল্পম বৃদ্ধরা। জোয়ান লোকেরা গ্রেপ্তারের ভয়ে কেউ আর বুধের দিকে এলেনা। এরকম ভাবে বিনোদবাবুর এলাকায় ভোট পর্ক সমাধা হল বিভিন্ন জামগায় বিভিন্ন কৌশলের মাধ্যমে। দীর্ঘ চারদিন অক্লান্ত পরিশ্রম করার পর ঘরে ফেরেন বিনোদবাবু। ভোটের হাওয়া তার দিকেই বইছে। নিজেকে বেশ বুদ্ধিমান মনে হয় তাঁর। সকল বুথেই তাঁর প্লান-মাফিক কাজ হয়েছে। কোথাও ব্যতিক্রম হয়নি। সাগরেদের নিয়ে রাত্রের আহালাদি পর্ক সাজ করে একটু নিশ্চিন্ত বিশ্রামের জন্ত শয়ান গা এলিয়ে দেন। কিছুক্ষণের মধ্যে দিনের ক্রান্তি তাঁকে নিদ্রাদেবীর রাজ্যে নিয়ে যায়।

— ৮ম পর্ক —

গত চারদিনের বিভিন্ন কলাকৌশলে জয়ী বিনোদবাবুর ক্রান্তি সারা রাত্ৰিতে মেটেনা। বিহঙ্গ কাকলি পর্ব সমাপ্ত করিয়ে সূর্যদেব লাল রশ্মি ছড়িয়ে ফেলেছে। খোলা জানালা দিয়ে সে রশ্মি তার গায়ে এসে পড়েছে। তবুও নিদ্রা ভাঙেনি তাঁর। স্বর্গ চা দিতে তার ঘর ঢুকতে সাহস করেননি। বকুলদেবী প্রাতে চা এনে ডাকে—তুমি কি আজ সারাদিন ঘুমবে ?

নিদ্রাভাঙ্গায় বিনোদবাবু জানালা দিয়ে রক্তিমসূর্যকে তিনি স্বাগত জানান। মনে মনে আশা পোষণ করেন আজকের সূর্য তারই জন্ত। আগামীকাল বেলা দশটা থেকে রাত্ৰি বারোটোর মধ্যে তার ভাগ্য ঘোষণা হবে। সে ভাগ্য হবে এই সূর্যের মত লাল। তার জীবনে সকল চাওয়ার সমাপ্তি ঘটবে। হবার চোখ কচলে বিছানায় উঠে বসে চায়ের প্লেটটা হাতে নিয়ে চুমুক দিতে থাকেন।

বকুলদেবী গৃহকক্ষ ত্যাগ করে প্রাতরাশ স্বর্গকে দিয়ে বলেন এটা দাদাবাবুকে দিয়ে আয়তো স্বর্গ ? স্বর্গ যেন একবারে চুপসে যায়—ক্ষীণকণ্ঠে বলে—আমি

ই্যা তুই গিরে ছাখনা কি বলে।

কথা ফেলতে পারেনা স্বর্গ, প্রাতরাশের প্লেট নিয়ে গুটিগুটি পায়ে রওনা দেয় বিনোদবাবুর গৃহকক্ষে।

ওকে দেখেই বিনোদবাবু ধমকে ওঠেন—এই হারামজাদী ছলোকে কোথায় সরিয়েছিস্ বল।

হাউহাউ করে কঁাদতে কঁাদতে বলে স্বর্গ—জানি না।

বকুলকে সব কথা বলে নিজে সতীলক্ষী সেজেছিস না। তুই এখান হতে আজই চলে যাবি। তোমার মত কত মেয়ে আমার পায়ে তলার পড়ে আছে। হুঁহুটো পেট যেন মাগনা পুষলাম এতদিন। অকৃতজ্ঞ কোথাকার !

আর ভয় করি না বাবু, আমার স্বামী গেল পুত্র গেল আর কাকে ভয় ? আমি চলে যাব এখান থেকে।

আজই চলে যা, বকুলকে ডাকতে থাকেন বিনোদবাবু।

বকুলদেবী আড়ালে দাঁড়িয়ে সব কথা শুনছিলেন। ডাক শোনামাত্র গৃহে প্রবেশ করেন—কিগো ডাকছে কেন?

তুমি স্বর্গকে আজই বিদেয় কর। কাল থেকে নূতন লোক আসবে।

স্বর্গর থেকে বেশী সুন্দরীর সন্ধান পেয়েছ নাকি?

কি যা তা বলছ? মস্ত্রী হতে চলেছি স্বর্গ থাকলে আমার কলঙ্ক বাড়বে।

কিন্তু পোষ্টারগুলোতে তো নামের আগে চরিত্রহীন কথাটা দিয়েই রেখেছে প্রতিপক্ষরা। কলঙ্ক যা বাড়ার বেড়েছে, আর নূতন করে কি বাড়বে?

ভোট ভাঙানোর জগে ও কথা লিখতে হয়। স্বর্গকে এখান হতে সরালেই আর কেউ কিছু বলতে পারবে না।

কিন্তু স্বর্গ যাবে কার কাছে? কালরাত্রে বলছিল ও নাকি যাবে মহিলা সমিতির সম্পাদিকা সাধনাদির কাছে।

তুমিই পাঠাবে নাকি?

সেটাই তো ভেবে রেখেছি। তোমার স্ত্রী হতে পারি, কিন্তু আমি তো একজন নারী। আমার নারীত্ব যে আমাকে তোমার বিপক্ষে ঠেলছে।

তোমার কি ব্যাপার বলতো বকুল। আমার প্রতি তোমার ভক্তি কি একেবারে উড়ে গেল?

আগেই বলেছি পাপ-পক্ষীটা সেই ভক্তি মুখে করে নিয়ে উড়ে গেছে।

তোমার ভুল ধারণা বকুল। আজকের ওপেন সেক্সের যুগে, লিভ টুগেদার-এর যুগে এটা পাপ নয়। ওদিকটার দিকে তুমি তাকিয়ে না।

তুমি স্বর্গর সঙ্গে আমাকেও বিদেয় করে তোমার নিত্য সঙ্গী বহু নারীর সঙ্গে তুমি লিভ টুগেদার কর।

সে তো পরের কথা। দরকার হলে করতে হবে।

সে ইচ্ছাও মনে মনে পোষণ কর নাকি?

না এতদিন করিনি। এবার করব, আমার প্রতি যখন তোমার এতই অবিশ্বাস!

বিশ্বাসী হওয়া অত সহজ জিনিষ না গো। অবিশ্বাসী হলে তাকে যে আর বিশ্বাস করা যায় না।

আর বেশী বকবে না। তোমার যা মন হয় করগে আমার যা মনে হয় করব।

হ্যাঁ করো আমাদের থেকে একটু বয়স কম, ও বেশী সুন্দরী দেখে।

এবার ধমকে ওঠেন বিনোদবাবু—বকুল।

কি ধমকাচ্ছ? মন্ত্রী হয়ে আমার মত ছুঁদশটা মেয়েছেলে খুন করিয়ে সামাল দেবার ক্ষমতা থাকবে এইতো? তা করো, তাতে আমার ভয় নেই। তবে জেনে রেখ স্বর্ণ আমার কাছে থাকবে এবং এতটুকু বাতিক্রম হলে আমরা ছুঁজনে মহিলা সমিতিতে দরখাস্ত করব তোমার অতীত ইতিহাস লিখ।

এক্ষুনি করগে। সাধনা আমার সঙ্গে আলোচনা না করে কিছু করবে না।

ভাহলে আমরা বিচার প্রার্থনা করব তোমার প্রতিপক্ষ হীরেন বাবুর কাছে। ও ঠিক ব্যবস্থা করবে তোমার।

বকুল তোমাকে শেষ কথা বলছি। এভাবে সংসারে অশান্তি আনবে না।

পাপ যখন ঢুকেছে তখন অশান্তি আসবে সেটা আমার ইচ্ছার বা অনিচ্ছার নয়। চলে আর স্বর্ণ তোকে কে সরায় এখান হতে আমি দেখব। অক্ষুণ্ণে বুক ভাসানো স্বর্ণকে নিয়ে বেরিয়ে আসেন বকুলদেবী বিনোদবাবুর কক্ষ হতে।

— নবম পর্ব —

হুলালের ট্রেনটা এসে থেমেছে হাওড়া স্টেশনে। এই প্রথম কলকাতার আসা তার। এখানকার হালচাল সে কিছুই জানে না। কোথায় যাবে, কি করবে। বড়মা ঠিকানা দিয়েছে সেখানে গিয়ে উঠবে, না অন্য কোথাও যাবে।

কিছুক্ষণের মধ্যে সকাল হয়। হাওড়া স্টেশন আস্তে আস্তে জনবহুল হয়ে ওঠে। হুলাল কঙ্গল গুটিয়ে বেরিয়ে পড়ে স্টেশনের বাইরে। কিন্তু কোথায় যাবে? বড়মার দেওয়া ঠিকানাতে যেতে সাহস হয় না। তাই সেখানে যাওয়ার মনস্থির করে না। স্টেশন হতে বেশ কিছু দূরে একটা হোটেল ও চায়ের দোকানে গিয়ে একটা চা ও কুটির অর্ডার করে। রাত্রে কিছুই খাওয়া হয় নি। কিছুক্ষণের মধ্যে এক বয়স্ক বেয়ারা এসে চা দেয়। কুটি ও চা হাতে নিয়ে জিজ্ঞেস করে এখানে কোন কাজ পাওয়া যাবে না?

বেয়ারা তার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করে, কোথায় বাড়ী তোমার।

বীরভূম জেলা।

বাড়ী হতে পালিয়ে এসেছ বুঝি।

পালিয়ে কেন আসব? একটা কাজের সন্ধানে এসেছি।

এখানে কাজের অভাব নেই। কি কাজ জান তুমি?

আমার মা বাবা নেই। লেখাপড়া বেশীদূর করতে পারি নি।

এখানেই একটা কাজের লোক লাগবে। তুমি বস। ভিড় কমলে মালিকের সঙ্গে কথা বলব। কত মাইনে নেবে বল।

আপনি আমার দাদার মত যা হয় একটা কিছু ঠিক করে দেবেন। •

তাহলে এস আমার সঙ্গে আমার ঘরে অপেক্ষা করবে।

হুলাল উঠে পড়ে, হোটেলের ভিতর একটা কক্ষে আসে। ভালাবন্ধ ঘরটা চাবি দিয়ে খুলে লোকটি বলে এখানে একটু গা গড়িয়ে নাও। সন্ধ্যার সময় কথাবার্তা হবে। পাশে টিউকল-এ স্নান সেরে নিও। মালিক দু'মাস হতে লোক খুঁজছে। লোক পায়নি। এই ক'মাস যত খাটনি আমার উপর দিয়ে চলছে। এবার হাঁফ ছেড়ে বাঁচব। লোকটা চলে যায়।

হুলাল চৌকিতে শুয়ে পড়ে। প্যান্টের নীচে কোমরটার হাত দিয়ে দেখে টাকাগুলো ঠিক আছে কিনা?

কিছুক্ষণের মধ্যে রাত্রি জাগরণের ক্রান্তি তাকে ঘুম পাড়িয়ে দেয়। হুপুর একটা নাগাদ দরজায় নক করার শব্দে তার ঘুম ভেঙে যায়। উঠে দরজা খুলে দিয়ে দেখে একটা পনের বছরের মেয়ে। হুলালকে বলে স্নান করে দরজা বন্ধ করে খেতে এস।

তোমার নাম কি?

আমার নাম খেঁদি। আমার মা এই হোটেলের কাজ করত। হু বছর হল মারা গিয়েছে।

অসুখ করেছিল বুঝি।

না হঠাৎ স্টোকে মারা গেল। মালিক বাবু বলেন মা মারা যাওয়াতে নাকি খুব ক্ষতি হয়েছে হোটেলের। তোমার নাম কি?

আমার নাম হুলাল।

আর দাঁড়াব না চান করে ঘরে তালি বন্ধ করে এস। মালিক বকাবকি করবে। চলে যায় খেঁদি।

হুলাল স্নান কোরে ঘরে তালিবন্ধ করে এসে দাঁড়ায়। তাকে দেখে বয়স্ক বেয়ারা বলে ওঠে ঘুমিয়ে গিয়েছিলে বুঝি। এবার খেয়ে নিয়ে কাজে লাগতে হবে। বাবু রাজি হয়েছেন। সন্ধ্যায় মাইনে ঠিক হবে।

হুলাল খেয়ে নিয়ে কাজে লেগে যায়। খুব তৎপরতার সঙ্গে কাজ করে হুলাল। রাত্রি দশটার সময় হোটেল ফাঁকা হয়ে আসে। কর্মচারীরা একে একে খেয়ে নেয়। হুলালের মাইনে ঠিক হয় দৈনিক সাত টাকা। হুলাল রাজী হয়। হুলাল জানতে পারে কর্মচারীটির নাম মনোরঞ্জন। সকলে মনাদা বলে ডাকে।

তুই মশারি বালিশ চাদর এনেছিস। ভিজেস করে মনোরঞ্জন? যদি না এনে থাকিস তবে আর আমার সঙ্গে নিয়ে আসবি।

আমার শুধু একটা মশারী লাগবে।

দাঁড়া আমি নিষে আসছি।

মশারীটা নিষে এসে বলে চল আমার ঘরে তোমার থাকার ব্যবস্থা হবে।

হুলাল তালি খুলে ভিতরে ঢোকে। পাশের চৌকিতে বিছানা পাতে। মশারী খাটিয়ে শুয়ে পড়ে।

জিজ্ঞেস করে মনোরঞ্জন কেমন লাগছে কলকাতা ?

বেশ লাগছে।

ই্যা, এ হল আজব কলকাতা। এখান সব হয় রে একে একে বুঝতে পারবি।

এর অর্থ ঠিক বুঝতে পারে না হুলাল। কেন মনাদা ? মানুষরা তো ভাল মনে হল।

ও রকম মনে হবে। কাউকে বিশ্বাস করবি না এখানে। অধিকাংশ মেকি মানুষ। আসল মানুষ নাইরে বুঝলি। নে এবার ঘুমো। আবার কাল ভোরে উঠতে হবে।

হুলাল আর কথা না বলে চুপচাপ শুয়ে পড়ে। দিনে একটু ঘুমিয়েছে। তার উপর মায়ের ভুলে নানান চিন্তা তাকে নিজ্ঞা রাজ্যে নিয়ে যায় না। বিছানায় শুয়ে এপাশ ওপাশ করতে থাকে। মাঝে মাঝে কান্না পায়। মায়ের পাশটিতে শুয়ে এতদিন রাত কেটেছে। আজ একা। নানান চিন্তার অক্টোপাস তাকে আট্টে পৃষ্টে বেঁধে রাখে। বাধন খুলতে প্রায় হুঁশটা লাগে। তারপর কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছে সে জানতেই পারেনি।

— ১০ম পর্ব —

পরদিন ভোর পাঁচটার হাঁক দেয় মনোরঞ্জন—এই হুলাল ওঠ ওঠ। হাত মুখ ধুয়ে চায়ের জলটা চড়িয়ে দে।

ব্রহ্ম হয়ে উঠে পড়ে হুলাল। হাত মুখে জল দিয়ে কেটলীগুলো মনোরঞ্জনের ধরানো উনুনে চড়িয়ে দেয়।

মনোরঞ্জন ততক্ষণে খেঁদিকে নিয়ে আনাজ কাটতে ব্যস্ত। ডাকে হুলালকে এবার এদিকে আর জলটা ততক্ষণে গরম হোক। তুই পিঁয়াজগুলো ছাড়িয়ে দে। আর খেঁদি তুই মেঝেগুলো একটু জল দিয়ে ধুয়ে দে।

খেঁদি উঠে গিয়ে মেঝে পরিষ্কার করতে থাকে।

মনোরঞ্জন বলে এই খেঁদির মা ছিলো হোটেলের লক্ষ্মী।

কেন লক্ষ্মী কেন ?

ওর যা চেহারা ছিল। যেমন রং তেমনি গড়ন। দিনের চাইতে রাতেই ইনকাম করত বেনী। কত লোক ওর জন্তে ধনী দিত এ হোটেলে। এখন খেঁদি সে জামুগাটা দখল করেছে। ওইটুকু মেয়ে রোত্তর কেশায় রোজগার পঞ্চাশ ষাট টাকা। ওতো আমাদের পাশের ঘরটাতে থাকে। সারারাত লোকের আনাগোনা ওর কাছে।

সব শুনে হুলাল ভিজেস করে—মনাদা—খেঁদি খারাপ মেয়েছেলে নয় ?

খারাপ কেন হবে রে। মা যা করত মেয়ে তাই করে।

হুলাল আর কথা বলে না। তার মায়ের কথা মনে পড়ে। তার মাকেও দাদাবাবুর বাড়ীর চাকররা খারাপ বলত। আজ তার অপরিণত বুদ্ধিতে মনে হয় ঝি চাকরদের জীবন বোধহয় এভাবে কাটে। মনোরঞ্জনর উপর তার রাগ হয় বলে মনাদা তুমি মেয়েটাকে খারাপ হতে দিলে কেন ?

আমার কথা শুনবে কেনরে খেঁদি। নগদ টাকার গন্ধ। তাছাড়া আমারও হুঁচার পরসী হয় ওর দৌলতে। খন্দের প্রথম এসে আমাকেই ধরে। আমাকে বলে দিতে হয় খেঁদিকে।

পরসার জন্ত তুমি এত খারাপ কাজ কর কেন মনাদা ?

হুনিয়ার কোন শালা ভাল কাজ করছে রে হুলাল। টাকার হুনিয়া চলছে। তুই ছোট ছেলে। বড় হু তারপর বুঝবি ?

হুলাল আর কথা বাড়াই না। চুপ করে যায়। তার শরীরের মধ্যে যৌবনের গ্রন্থি কুঁড়িগুলো পরিপুষ্টতা লাভ করতে শুরু করেছে। গোঁফের সুপ্পট রেখাগুলো ফুটে উঠেছে। খেঁদিকে প্রথম দেখতে তার মন্দ লাগেনি। শুধু ওর বৃত্তি জেনে খারাপ লাগল। তবু এই খেঁদির কথায় তার মাকে মনে পড়ে। তার মাও সেবাদাসী। বাবু জোর করে বিছানা থেকে টেনে তুলে নিয়ে যায় তাকে। বছর তিনেক আগের সে রাতের ছবি ভুলতে পারেনি হুলাল। তাই খেঁদিকেও দোষী সাব্যস্ত করতে পারে না।

বাস্তুতায় মধ্যে হুলালের দিনটা কেটে যায়। রাত্ত্রী দশটার পর হোটেল ফাঁকা হয়ে আসে। খেঁদি সেকেন্ডেজে এসে সকলকে খাইয়ে নিজে খেতে বসে।

হুলাল মনোরঞ্জন আপন কক্ষে আসে। বিছানা মশারি খাটিয়ে হুজনে শুতে যাবে এমন সময়ে খেঁদি এসে ডাকে—ঘুমুলে নাকি ? হুলাল ওঠে দরজা খুলে দেয়—খেঁদি এসে হুলালের বিছানাটিতে বসে।

ধমকে ওঠে মনোরঞ্জন—এ্যাই খেঁদি এত রাতে তুই এখানে ? হুলালের মাথাটা খেতে এসেছি সু বুঝি ?

হ্যাঁ মনাদা আমরাই তোমাদের মাথাটা খাই। আর তোমরা মাথাটা এগিয়ে দাও, না।

তা নয়তো কি। রাত হুপুরে ওর সঙ্গে কিসের গল্পোরে ? তুই তোমার ঘরে যা এফুনি তোমার লোক আসবে।

তা আনুক। এলে যাব। আমরা এক সংসারের লোক হগাম। সবার পরিচয় জানব না।
আচ্ছা হুলালদা মনাদা তো আমার কথা তোমাকে বলেছে না।

হ্যাঁ—বলেছে।

আমাদের মালিকের কথা কিছু বলেছে।

না তা বলেনি।

তা বলবে কেন মনাদা? মালিক বলে কথা। তবে শুনুন। ওই মালিকই আমার প্রথম
ইজ্জত নিয়েছে জোর করে। মা মরবার একমাস পর ও একদিন আমার ঘরে এল রাত্রে। এসে
বলল তোর মা যেমন ছিল তুই সেরকম থাক। আর প্রথম আমার কাছেই আর। আমি তোকে
পথ দেখাই।

যাকুগে ওসব কথা খেঁদি। তুমি তোমার ঘরে যাও খুব ঘুম পাচ্ছে আমার।

তাঁতো পাবেই। নুতন মনিবের দোষের কথা তুমিও বলতে পারবে না।

কিন্তু মোটেই না আমারও অনেক কথা আছে একদিন তোমাকে সব বলব।

একটু ক্রুদ্ধ হয়ে চলে আসে খেঁদি আপন কক্ষে।

— একাদশ পর্ব —

প্রায় বছর চারেক হতে চলল হুলাল হোটেলের কাজকর্ম বেশ মনোযোগ সহকারে করে
চলেছে। খেঁদির সঙ্গে একসঙ্গে কাজ করতে পেরে কাজের উৎসাহ আরও বেড়েছে।

কিন্তু বেশ ক'দিন থেকে মালিক এভাবে খ্যাচ্ছাচ্ছানি শুরু করেছে। বিরক্ত মনে সেও
ভাতের বাগতিটা নিয়ে পরিবেশন করতে থাকে।

সেদিন রাত্ৰিতে খাওয়া সেরে সকলে বিশ্রাম করতে যে যার কক্ষে যায়। মনোরঞ্জন দরজা
খিল দিয়ে শ্রীহরির নাম নিয়ে শয্যায় শরীর এলিয়ে দেয়। হুলালও শুয়ে পড়ে।

খেঁদি আপন কক্ষ বন্ধ করে হুলালকে ডাকে। হুলাল ঘুমিয়ে পড়লে নাকি।

হুলাল উঠে গিয়ে দরজা খুলে দেয়। কি ব্যাপার এত রাত্রে।

মনোরঞ্জন ভেগে ওঠে। কিরে খেঁদি এত রাত্রে জ্বালাতে এলি কেন?

দিনে তো আর অবসর পাই না। তাই রাত্ৰিতে একটু গল্প করব। তুমি তো সবই জান
দাদা। তুমি কিছু মনে করো না।

মনোরঞ্জন নিজ্জাদেবীর আরাধনায় মগ্ন হয়। কিছুক্ষণ যেতে না যেতেই বাইরের দরজার
ধাক্কা দেওয়ার শব্দ হয়। এ বিষয়ে ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী মনোরঞ্জন ভাড়াভাড়ি উঠে পড়ে খেঁদিকে
বলে এ্যাই খেঁদি তোর লোক এসেছে ওঘরে যা।

মনাদা তুমি আজ ওকে ঘুরিয়ে দাও। বল আমার শরীর খারাপ।

হুলাল খেদিকে বলে তুমি লোকটাকে ফিরিয়ে দিলে কেন ?

কারণ তো মনাদাকে বললাম ।

তুমি কি ঠিক করলে ?

ই।। করলাম । এবার তুমি চল আমার ঘরে !

তোমার ঘরে ?

ই।। খেয়ে ফেলব না নিশ্চয় । একরকম জোর করে টেনে নিয়ে যাব খেদি হুলালকে ।
ততক্ষণে মনোরঞ্জন নাসিকা গর্জন শুরু হয়েছে । ওদের দরজাটা বার থেকে শিকল খুলে আপন
ঘরে হুলালকে নিয়ে দরজার খিল এটে দেয় খেদি ।

খেদির মাথাটা হুলালের কোলে ঢলে পড়ে । হুলালের অন্তর যেন ভাঙের ভরানদী ।
চকুল পর্যন্ত জল কিন্তু কুল ছাপিয়ে যায় নি । সংযত হয়ে খেদির মাথার হাত বুলুতে থাকে ।
এমন মধুর রাত তাদের আগে আসেনি, আজ এসেছে । নতুন সম্ভাবনা নয় ভবিষ্যতের রঙীন
মায়াজাল বুনে বুনে রাতটা কখন পার হয়ে গেছে তারা টের পায় নি । মনোরঞ্জনের ডাকে
তারা টের পেল । “হুলাল, খেদি তোদের ঘুম এখনও ভাঙল না । ছ’টা বাজতে চলল ।” হুজনে
উঠে পড়ে । হুলাল এসে মনাদার ঘরের শিকল খুলে দেয় ।

দাতন সেরে মুখ হাতে জল দিয়ে যে ঘর কাজে লেগে যায় ।

টিকু টিকু করে দেওয়াল ঘড়ির কাঁটা দশটার ঘরে এসে ঢং ঢং করে দশটা ঘন্টা বাজায় ।

হুলাল মালিকের কাছে এসে বলে আমাদের হুজনের ব্যাপ্ত একটু কাজ আছে ।

হুজনের ? একটু আঁতকে ওঠে যেন মালিক বিস্ময়বান ।

ই।। আমার আর খেদির । ততক্ষণে খেদিও হাজির হয়েছে ।

না ছুটি হবে না । এত ভিড়ের সময়ে ছুটি হবে না । মনা একা সবটা সামাল দিতে পারবে না ।

তাহলে আমাদের একেবারে ছুটি দেন । এখানে আর কাজ করব না আমরা ।

জেনে রাখিস্ একমাস সময় না দিলে জবাব হয় না । গেলে বাকী বকেয়া কিছু পাবি না ।

তার আর দরকার নেই !

বটে এতবড় সাহস ।

হুলাল গর্জে ওঠে—এতে সাহসের কি হল ?

সাহস নয় ? ভিকিরীর মেয়েকে ঠাঁই দিয়ে অপরাধ করেছি যেন !

খেদি এক রকম চিংকার করে ওঠে—শুধু ঠাঁই দেননি গো বাবু আমার ইজ্জতও নিয়েছেন ।
সেদিন কত কেঁদেছিলাম আপনার কাছে । আপনার দয়া হয়নি ? আর ভয় করি না ।

এক্ষুনি বেরো। তোরা হুজনেই বেরো। তোরা মত ভিকিরীর মেয়ের আবার ইজ্জত ?

মনোরঞ্জনর মুখটা বিবর্ণ হয়ে যায় অশ্রু ঝরিয়ে বলতে থাকে—খোঁদি, হুলাল তোরা তাহলে সত্যিই চলে যাবি ?

হুলাল বলতে থাকে তুমি কেঁদোনা মনাদা। আমরা সংসার পেতে তোমাকে আমাদের কাছে নিয়ে যাব।

মুখে বল্গি এটুকুই যথেষ্ট। তোরা সুখী হ। চিঠিতে খবরাখবর জানাসু।

খোঁদি বসনপ্রাপ্ত দিয়ে অশ্রু মুছিয়ে বলে দাদা এবার আসি।

হ্যাঁ বোন আর। এ অভাগা দাদাকে যেন ভুলে যাসু না।

জীবনে কোন দিন ভুলব না দাদা।

হুজনে রওনা দেয়।

মনোরঞ্জন অশ্রুগিক্ত নয়নে এক দৃষ্টে তাঁদের দিকে তাকিয়ে থাকে। খোঁচিয়ে ওঠেন হোটেল মালিক বিষ্ণুবাবু—এই মনো, হাঁ করে দেখছি কি। যেন ঠাকুর দেখছে। তুঁ ব্যাটাও কম বদমাস নোসু। সব খবর জানতিসু। আমাকে ঘুণাকরে জানাসু নি।

কোন কথা বলে না মনোরঞ্জন। মাথা হেঁট করে আপন কর্মে লিপ্ত হয়।

বিষ্ণুবাবু আপন মনে গজরাতে থাকে। শালা হুনিয়াটা এই রকম। কোন শালাকে বিশ্বাস নেই।

— দ্বাদশ পর্ব —

বিনোদবাবু এসে হাঁক পাড়ে—কই বকুল। খেতে দাও। এক্ষুনি আবার বেরতে হবে। বিনোদবাবুর বর্তমানে গৃহ স্থিতি কম। সব সময় দেশের সমস্যা সমাধানে মেতে থাকেন। ভোটে বিপুল ভাবে ভরী হয়েছেন। কিন্তু মন্ত্রী হতে পারেন নি। খুঁসি গ্রামে যে দাঙ্গা তার অদৃষ্ট ইঙ্গিতে সংঘটিত হয়েছিল, সেদিন সেখানকার অধিকাংশ লোকই ছিল তার শত্রু। কিন্তু বর্তমানে সকলেই ভয়ে ভক্তিতে মিত্রে পরিণত হয়েছে। তার সাগরেদগুলো এখন আর খড়ো বাড়ীতে বাস করে না। প্রত্যেকে বর্তমানে একটি করে ঝকঝকে দ্বিতল কক্ষের মালিক হয়েছে বিনোদবাবুর কল্পনা প্রাপ্ত হয়ে। শুধু বঞ্চিত হল স্বর্ণ। বকুলদেবী না থাকলে হয়তো স্বর্ণকে এতদিন তার স্বামীর রাজ্যে পাঠাত।

খাবার তাক্সা শুনে বকুলদেবী বিনোদবাবুকে ডাইনিং টেবিলে খাবার সাজিয়ে ডাকেন ‘এস খাবার দিয়েছি।’

খেতে বসেন বিনোদবাবু—

খাবার মুখে দিয়ে স্বর্ণকে উদ্দেশ্য করে ধমকাতে থাকে—শালী হারামজাদীর রাজ্য আর মুখে দেওয়া যায় না।

বিদ্রূপ করে ওঠেন বকুলদেবী—ও তাই নাকি! আবার এক্ষুণি যদি স্বর্ণ তোমার গলা ভড়িয়ে ধরে আদর করে তখন স্বর্ণের রান্না ভাল লাগবে না?

তার মানে?

মানে পরনারীর ইজ্জত পেলেন খারাপ রান্নাও ভাল লাগে তোমার।

বকুলদেবী বেশ কিছুটা উত্তেজিত দেখে আর কিছু বলেন না বিনোদবাবু। আহার সামগ্রী কিছুটা উদরে পরে হাত মুখ ধুয়ে বেরিয়ে যান গৃহ হতে দেশ উদ্ধার কার্যে।

— ত্রয়োদশ পর্ব —

হুলাল ও খেদি সেদিন কালীঘাটে সিন্দুরদান পর্ব সেরে সেদিনই তার পৈতৃক ভিটে পঞ্চপুরে এসেছে। সেখানে মানব মিত্র এর পুত্র পরিচয়ে তার কাকা পরেশ মিত্রের বাড়ীর ঠিকানায় গিয়ে পরেশবাবুর খোজ করেছিল।

ওকে দেখে ওর কাকা পরেশ এরকম ভূত দেখেছিল যেন? জিজ্ঞেস করেছিল তোর বাবা এখন কোথায়?

হুলাল সব কথা বলেছিল।

কিন্তু কি করে বিশ্বাস করব তোকে তুই মানবের ছেলে?

কিন্তু মা তো আমার বেঁচে আছেন। দিন কয়েক পর তাকে এখানে নিয়ে আসব।

হুঁ? সেতো একটা নষ্ট চরিত্রের মেয়ে। তাকে এখানে আনলে কুলেকালি পড়বে। সে সম্ভব নয়? তোরা অন্য কোথায় ঘরবাড়ী করে বাস কর।

পাশে এক বৃদ্ধা দাঁড়িয়ে হুলালের মুখের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে তার কথাবার্তা শুনছিল। এবার সে মুখ খোলে ইয়ারে পরেশ কি কাণ্ড তোর। তোরই ভাইপো। তুই ওকে বাড়ীতে টাই না দিয়ে ওভাবে বিদেয় করে দিচ্ছিস।

ও যে ভাইপো তা আমি জানব কেমন করে? দিনকাল যা পড়ছে—অচেনা লোকদের ঘরে জায়গা দিয়ে আমি মরব বুঝি?

দেখতে পেচিস না ওর মুখের আদলটো ঠিক মানবের মতন। আহা ঠিক যেন সেই ঘুরে এসেছে। আরও বাছা তোরা আমার ঘরে আস। আমি তোর বাবার পিসী হতাম রে। তোর বাবা আমার কোলে মানুষ। সেই যে ভালবেসে বিয়ে করে বউ নিয়ে চলে গেল ইখান থেকে আর কোনদিন এল না, বলতে বলতে বৃদ্ধার চোখ ছটো জলে ভরে ওঠে? আহা—এ মেয়েটি আবার কে রে?

ও তোমার নাতবৌ দিদা।

ও তাই নাকি—কি মিষ্টি মুখ !

খোঁদি ও হুগাল বুড়াকে প্রণাম করে ।

বুড়ী—খোঁদিকে বুকে জড়িয়ে ধরে বলতে থাকেন—খুব ভাল, খুব ভাল—জাত ঘরের মেয়ে । আর মা ভিতরে আর ।

ঘরের ভিতরে নিয়ে গিয়ে একটা কয়ল বিছিয়ে বসিয়ে খোঁদির সব পরিচয় জেনে সরবৎ এনে ওদের হাতে ধরিয়ে দিয়ে বলতে থাকেন তোরা খেয়ে নিয়ে বিছানায় একটু গা গড়া । ভেতে পুড়ে এলি আমি ততক্ষণে ছোটো রান্নার ব্যবস্থা করি ।

আপনাকে করতে হবে না । আমি করব আমিাকে কোথা কি আছে বলে দিন ।

আ মরণ—তু কাল থেকে করবি । এখন একটু বিশ্রাম কর । তারপর ঐ পুরে গা ডুবিয়ে চান্ন করে আসবি ।

কাপড় বদলে বিছানায় গা এলিয়ে দেয় হুগাল । খোঁদিকে বলতে থাকে, ঈশ্বর আমাদের সহায় খোঁদি । আর কোন চিন্তা নেই । এখানে আমাদের জমা টাকা একটা দোকান খুলে বসব ।

বেশ তাই হবে । তোমার ইচ্ছাই আমার ইচ্ছা । আমি তাহলে পুকুর হতে স্নানটা সেরে আসি ।

গ্রামের পুকুর তুমি ডুবে যেতে পার । চল আমিও যাব । এটাচি হতে তেল সাবান বের করে পাশের পুকুর হতে হুজনে স্নান সেরে আসে ।

স্নান সেরে খোঁদি তার দিদার সঙ্গে যোগ দিয়ে রান্নাটা সেরে নেয় ।

তুমি বসতো দিদা ? বুড়ো বয়সে আর তোমাকে বাটতে হবে না ।

নাহে এই বয়সে একটুকুন না বাটলে দেহটা তো ভাল থাকবে না তাই ।

সে পরে করবে এখন ।

ইহা জাব্না এই বয়সেও আমি কত শক্ত আছি । আহা-হা-দাদা আমার মানবার লোকেই মারা গেল । জানিস দাছ মানবকে আমি তোরাই মত রাখতে চেয়েছিলাম । তা হতচ্ছাড়াটা না বলে আমাকে ছেড়ে চলে গেল আর জীবতে এল না । দাদাকে বলেই আমি কাছে রাখতাম ওকে আর ওর বউকে । আমারও তো একটা হেল্লা হত । কিন্তু এমনভাবে গাঁ ছাড়লে ঠাই ঠিকানাও দিলে না । ঐ পরশাকে কতবার কেঁদেছেটে বলেছিলাম ওরে মানবাতো মরেই গেছে ওর বউটাকে কাছে এনে দে । সি কথা কানেই দিলে না । আনবে কেনে ? আনলে বিষয় সম্পত্তির ভাগ চলে যাবে না । এইবার । সে মানবার বেটাটারে কি করে ফাঁকি দিস্ দেখব আমি । মানবা বুঝি বাপের ছেলে নয় ?

সে এখন পরের কথা দিদা । মা আসুক তারপর যা ভাল হয় করবে ।

খোঁদি ভাক দেয় দিদা ওকে নিয়ে এস খাবার দিয়েছি ।

বেশ পরিতৃপ্ত সহকারে তিনজনের রাতের আহার সাঙ্গ হয়। দিদা নীচের ঘরে আপন বিছানা পেতে নিয়ে একটা ছোট টিমটিমে আলো জ্বলে নিয়ে বাইরের দরজা বন্ধ করে বলেন তোরা উপরে যা এই হারিকেনটা নিয়ে। বিছানা মাচানের উপর তোলা আছে। পেতে নে গা।

হুলাল খেঁদি দিদার আদেশ পালন করে সিঁড়ির দরজা বন্ধ করে উপরে আসে। বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হুঁতলা মাটির ঘর। জিনিস পসরগুলোও বেশ শুষ্কিয়ে রেখেছে দিদা। একটা কাঠের চৌকিতে বিছানাগুলো পেতে নিয়ে খেঁদি বলে মনে আছে তো আজ বাসর জাগার পরদিন। কাল রাত্রি পার হয়ে গেছে কাল।

মনে আছে ডে দিনটা পেরুতেই চাইছিল না। এই নাও বিছানার ছড়িয়ে দাও।

ওমা আমার বলনি। এই ছাখ আমিও এনেছি। আঁচল হতে একটো বেগি আর টগর ফুল বিছানার ছড়িয়ে দেয় খেঁদি।

তুমি গোলাপ কোথায় পেল। গোলাপ ঐ যে একবার পুকুরের পাড় দিয়ে গেলাম। ঐ সময় নিয়ে এসেছি। কি সুন্দর বাগান করেছে লোকটা।

খেঁদি আজ মনের মত সেজেছে। বিকেলে চুল বাঁধা পর্ব সেরে, বাসর হতে মাঝের বিষের পুরানো বেনারসীটা পড়েছে। নিজের ভাগাকে আজ যেন সে বিশ্বাস করতে পারছে না। বিছানার হুলালের পাশটিতে শুয়ে হুলালকে জড়িয়ে ধরে বলে—আমার বড় ভয় করছে গো।

হুলাল আরও নিবিড়ভাবে জড়িয়ে ধরে বলতে থাকে কেন একথা বলছ তুমি খেঁদি।

কলকাতার ফুটপাথের ভিকিটরী মাঝের অনাথা মেয়ে আমি। আমি সংসার পাব এ যে কোনদিন ভাবি না। তুমি আমাকে স্ত্রী করলে কিন্তু তোমার মা এসে আমাকে যদি মেনে না নেন। তিনি যদি কষ্ট পান তুমি আমাকে বিয়ে করতে।

সে যে তোমার মাঝের মতই দুঃখিনী খেঁদি। ওর জন্তু তোমাকে চিন্তা করতে হবে না। আজকের দিনে মন ধারাপ করতে নেই। জেনে রেখো আমি তোমার আছি চিরদিন তোমারই থাকব। আরও নিবিড়ভাবে কাছে টেনে নেয় হুলাল।

হুজনের কথাবার্তার জড়তা আসে। বেশ কিছুক্ষণ পর হুজনে মিলন সাগরে অবগাহনে তৃপ্ত হয়ে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। ততক্ষণে পূর্বের জানালা দিয়ে কৃষ্ণক্ষেত্রের সপ্তমীর চাঁদ ওদের পরিতৃপ্ত আসনে তার স্নিগ্ধ হাসি ছড়িয়ে তাদের প্রহার প্রায় আধ ঘণ্টা থাকে। তারপর অন্তর্মিত হয়ে সমুদ্রে তলিয়ে যায়।

— চতুর্দশ পর্ক —

হুঁ চারদিনেই বাইরের ঘরটার দোকান সাজিয়ে ফেলেছে হুলাল। সকালে জিনিস পত্র কিনতে যায় এখান হতে মাইল তিনেক দূর আখা শহর লাভপুরে। ফিরতে প্রায় দুপুর হয়ে যায়।

প্রাণের ভিতর দিয়েই পাকারান্ত। বাসে চড়িয়ে মাল আনতে কোন অসুবিধা হয় না। ততক্ষণে খেঁদি দোকানটা চালায়। ফর্দ তৈরী করে মালের বিক্রি দাম হুলাল ভাঙে দিয়ে খায়। নিভা প্রয়োজনের এমনকি তরী তরকারী পর্যন্ত দোকানে রেখেছে। প্রায় হাজার খানেক টাকার মত বেচাকেনা হয় সারাদিনে।

দেখে শুনে হুলালের দিদা খুব খুশী। হুলালকে বলে মন দিয়ে কর। ব্যবসার লক্ষ্যী আসবে। ভোদের দাহুর মুখে শুনেচ্, ইনজেররা বেবসা করেই এদেশ কিনেছিল।

হেসে ওঠে হুলাল—দিদা ইনজের নয় ইংরেজ বল।

ঐ হল রে ভাই। তবে একটো কথা জেনে রাখ। তোর দোকানে এত বেচাকেনা দেখে তোর ভেঠার খুব হিংসে। তুই ছিলি না আমাকে বাইরে ডেকে বললে কোথা থেকে অচেনা একটী ছেলে এনে ঘরে ঠাঁই দিয়ে আমাদের বংশের মুখে কালি লেপছে বুঝতে পারচ না। ওলট কোনের দোকান করে নাই করেছে মেয়েছেলের দোকান।

হেসে উড়িয়ে দেয় হুলাল ও ভাই নাকি ?

তা আমি কি বললাম শোন। চাঁচিয়ে বললাম। তু করে। ভাত দেবার ভাতার নয় কিল মারবার গোসাই। আমার নাতবৌ হিসেব নিকেশ নেকাপড়া সব জানে। আর তু তো ছারকেবন বাদ সাদবি আমার সনগে। খারাপ করার খোঁচা দিয়ে লাভবৌকে এখান হতে তাড়াবি ভেবেচিস্। কিছুতিই পারবি না। তু বেরো ইখান থেকে।

বলুক না দিদা বলতে দাও ওদের।

হঁ বলবে! আমার নাম জ্ঞানদা। ভালকে খারাপ বললে ওর ওই মুখ আমি মাটিতে ঘষুরে দোব।

হুলাল আর কথা বাড়ায় না। দোকানে গিয়ে ফুরিয়ে যাওয়া মালগুলোর একটা ফর্দ তৈরী করতে থাকে।

এভাবে ছমাস পেরোয়। হুলালের দোকান বেশ চালু হয়ে উঠেছে। মাসের কথাটা প্রতিদিন মনে পড়ে। খেঁদি অনেকদিন হতে বলছে মাকে এবার নিয়ে এস। হুলালও ঠিক করে ফেলেছে আগামীকাল মাকে আনতে যাবে। এবটু চিন্তাম্বিত হয়। কিভাবে আনবে মাকে? সিংহের গহ্বর থেকে তার মাকে উদ্ধার করতে হবে। বাবু টের পেলে তাকেও হয়ত ভাস্কর রাখবে না। তাই মনস্থির করে আগে তার বড়মার ভাইয়ের বাড়ীতে উঠে গোপনে খবর পাঠিয়ে বড়মার সঙ্গে মাকে আসতে বলবে। ওখান হতেই মাকে ঘরে নিয়ে আসবে। রাত্রে খাবার সময় ওর দিদার কাছে কথাটা ভোলে হুলাল—দিদা কাল মাকে আনতে যাব। দোকানটা তো বেশ চালু হয়েছে। আর আমাদের চিন্তা নাই।

আমি কবে থেকে বলছি তোকে। তুই যেচিস্ না। কালই যা। জীবনে একবার দেখে-
ছিলাম। এখন মুখটোও মনে পড়ে না।

হ্যাঁ কালই যাব দিদা।

যাওয়া দাওয়ার পর্ব শেষ হয়। খেঁদি দিদাকে বিছানা পেতে পায়ের একটু তেল মালিশ
করে উপরে আসে।

হুলাল আগেই এসেছে। খেঁদিকে আজ যেন একটু চিন্তান্বিত দেখে হুলাল জিজ্ঞেস করে
কি গো তুমোর আজ কি হল বলতো—মুখে হাসি নেই।

হুলালের পাশটিতে শুয়ে ফুঁপিষে কেনে ওঠে বলতে থাকে তুমি একা যাবে মাকে আনতে ?

তাতে কি হয়েছে। হুলাল খেঁদিকে নিবিড় ভাবে কাছে টেনে নেয়।

আমার ভয় করছে গো ?

কিসের ভয় খেঁদি।

তোমাকে হারাবার ভয়।

কোন ভয় নেই। আমি বড়মার বাপের বাড়ী পলাশপুরে উঠব। ওখান থেকে খবর
পাঠাব বড়মাকে। বড়মাই সঙ্গে নিয়ে আসবে মাকে।

তবুও আমি তোমার সঙ্গে যাব।

তুমি থাকলেই কি আমি বাঁচব।

মরলে আমিও মরব তোমার সঙ্গে।

বেশ তাই হবে আমরা একসঙ্গেই যাব।

খেঁদি হুলালকে আরও নিবিড়ভাবে জড়িয়ে ধরে।

ভোর তিনটে হতে না হতেই জ্ঞানদাময়ী চিংকার করে ডাকতে থাকেন ওদের—হুলাল
ওঠ্, ওঠ্, স্তকতারা উঠেচে। ট্যানের আর দেরী নাই বাবা।

প্রথম ডাকেই খেঁদি জেগে ওঠে প্রায় নগ্ন বেশবাস সংযত করে হুলালের গায়ে হাত দিয়ে
নাড়া দেয় হুলালকে এ্যাই ওঠো দিদা ডাকছে। হুলাল জেগে মাথার নীচে রাখা ঘড়িটার দিকে
তাকায় দেখে তিনটে বেজে গেছে। তাড়াতাড়ি উঠে পড়ে হুজনে। নীচে নেমে এসে চা পর্ব
সমাধা করে কাপড় বদলিয়ে রওনা দেয় বন্দিনী মাকে উদ্ধার করতে পলাশপুরের দিকে। জ্ঞানদা
দেবী হুগ্গা হুগ্গা নাম নিয়ে ওদের সঙ্গে বাইরে আসে। ততক্ষণে পূর্ব আকাশ কিছু ফরসা
হতে চলেছে মাত্র। আঁধার কাটেনি।

হুজনে যখন ষ্টেশনে পৌঁছাল তখন ট্রেনের ঢোকার ঘণ্টা হয়ে গেছে। তাড়াতাড়ি দুটো টিকিট কিনে আনে হুলাল ট্রেনটা ঢুকে পড়ে হুইশেল বাজিয়ে। ট্রেনে উঠে জানানার ধারে সিঙ্গেল সিটে হুজনে হুপাশে সামনা-সামনি বসে।

— পঞ্চদশ পর্ব —

শেষ চৈত্রেবর সকাল। সূর্যদেব তখন লাল আভার খোলশ বদলিয়ে কিছুক্ষণের মধ্যেই প্রবরতা বাড়তে থাকে। মোরাম ছড়ানো রাস্তা বেয়ে যখন তারা পলাশপুর পৌঁছাল তখন আটটা বেজে গেছে। একজন লোককে জিজ্ঞেস করে বকুলদেবীর পিতৃগৃহের সামনে হাজির হয়। দরজার কড়া নাড়ে। বকুলদেবীর সহোদর কাজলবাবু বেরিয়ে আসেন। হুলালকে দেখেই বলে—একি তুমি ?

হ্যাঁ আমি মামা।

এস ভিতরে এস। সঙ্গে এটি কে।

হুজনে প্রণাম করে এটি তোমার বউমা।

সেটা আবার হল কখন ?

সে অনেক কথা মামা। পাকৈচক্রে ঘটে গেল। আমি এখন আমার বাবার গ্রামে একটি নটকোণা দোকান খুলেছি। এবার মাকে নিয়ে ওখানে রাখব। হোটেলে আর ফিরব না। তুমি বড়মাকে সব কথা বলে মাকে এখানে নিয়ে এস। এখান থেকে মা'কে ঘরে নিয়ে যাব।

বেশতো দেখছি। মা তোমার জন্যে আধ পাগলী। তোমরা বস্। তোমার মামীমাকে ডেকেদি ? “পাকুল” দেখো কে এসেছে।

পাকুলদেবী কাছে আসেন। হুলাল ও খেঁদি পায়েব ধুলো নেয়। পরিচর কবিয়ে দেয় কাজলবাবু, ওমা তাই নাকি বেশ সুন্দর বউ হয়েছে। তোমাদের মামার কাছে তোমার কথা শুনেছি। তোমার নাম হুলাল তাই না।

হ্যাঁ মামীমা।

এস ভিতরে এস। পাকুলদেবী ওদের ডেকে নিয়ে গিয়ে ভিতর ঘরে বসাল।

কাজলবাবু জামা কাপড় বদলিয়ে হুলালকে বলে। আমি চললাম ইলামবাজার। একুনি ট্রেন পাব। তোমরা এ বেলাটা থাক। দিদি রাজী হলে তোমার মাকে সঙ্গে করেই নিয়ে আসব।

সাইকেলে চড়ে রওনা দেন কাজলবাবু ষ্টেশনের দিকে। পাকুলদেবী ওদের আপ্যায়ণ পর্ব সমাধা করতে করতে হুলাল ও হুলালের মায়ের জীবনের কতক ট্রাজেডি—মনোযোগ সহকারে শুনতে থাকেন। এই আলোচনাতেই বিকেল পাঁচটা বাজে। একটী ট্যাক্সি দরজার খামার শব্দে বেরিয়ে যান পাকুলদেবী।

কাজলবাবুর সঙ্গে স্বর্ণ ও বকুলদেবী দুজনকে দেখে আপ্যায়ণ করে ঘরে আনেন। স্বর্ণ হুলালকে দেখেই আনন্দে আতিশয্য বক্ষে টেনে নেয়। অশ্রুজলে হুলালের শরীর সিক্ত করতে করতে বলতে থাকে। তুই যে ফিরে আসবি আমি কোনদিন স্বপ্নে ভাবিনীয়ে। আজ আমার কোন দুঃখ নেই।

খৈদি ততক্ষণে স্বর্ণ পা ছুঁয়ে প্রণাম সেরে বলতে থাকে মা আমি তোমার মেয়ে।

স্বর্ণ হুলালকে ছেড়ে খৈদিকে বক্ষ বেষ্টনীতে আবদ্ধ করে।

হুলাল বলে ইয়া, ও তোমার বোমা। তোমার মত ওর মাও দুঃখিনী। তোমার কথা ভেবে ওকে আমি বিষে করেছি মা। হোটেল একসঙ্গে কাজ করতাম।

হুলাল বকুলদেবীকে প্রণাম সেরে বলতে থাকেন, বড়মা ভাল আছো তো। ভাই কেমন আছে?

খৈদি এসে বকুলদেবীকে প্রণাম সারে। বকুলদেবী একটা আংটি খৈদির হাতে পরিয়ে দিয়ে বলতে থাকেন—ভাই ভালো আছেন হুলা। তাকে অর্ক ভোলেনি। আজও তোর কথা জিজ্ঞেস করে। তোর সুন্দর বউ হয়েছে। সুখী হ তোরা।

তুমি না থাকলে আমার যে কি হত কে জানে। তুমি আমাকে বাঁচিয়েছ বড়মা।

নারে আমি নই ওই ঈশ্বর।

না না তুমি। এবার আমার মাকে তুমি আমার কাছে পাঠিয়ে দাও। একে একে অতীতের কথা বলতে থাকে হুলাল।

সব শুনে জিজ্ঞেস করে ইয়ারে হুলাল তাদের গ্রামে গাড়ী ঢুকবে। রাস্তা ভালতো।

ইয়া বড়মা। একবারে পাকা রাস্তা।

চল তাহলে তাদেরকে ঘরে পৌঁছে দিয়ে আমি ফিরব।

বাধা-দেন পাকুলদেবী, সেকি দিদি আপনারা কি এসেই চলে যাবেন।

ইয়া বোন। তোমার ভাগ্যকে একা রেখে এসেছি। টিউশনি মাষ্টার আসবে। হারান-সেকেণ্ডারীর ফাইনাল পরীক্ষার তো আর পনেরদিন। পরে একদিন এসে থাকব। তোমরা যেও একদিন।

ইয়া যাব। আবার এসো।

বিদায় পর্ব শেষে বকুলদেবী স্বর্ণ, হুলাল ও খৈদিকে নিয়ে ট্যাক্সিতে ওঠেন। ট্যাক্সি একরাশ ধূঁয়া ছেড়ে রওনা দেয় পঞ্চপুরের দিকে।

ওখানে যখন ট্যাক্সি পৌঁছাল তখন প্রায় সাড়ে ছটা। বাড়ীর সামনে ট্যাক্সিটা থামায় হুলাল। ভাড়াভাড়ি ঘরে গিয়ে দিদাকে ডাকে—দিদা কাকে এনেছি দেখ।

আহ্লাদে আটখানা হয়ে জ্ঞানদাদেবী বেরিয়ে আসেন ! তখন বকুলদেবী স্বর্ণময়ী । খেঁদিকে নিয়ে ট্যাক্সি হতে নেমেছেন । প্রায় চৌঁচিয়ে ওঠেন জ্ঞানদাদেবী, কই আমার স্বর্ণ কই রে ? স্বর্ণ এসে প্রণাম করে । ওমা তুই এ-কি চেহারা হয়েছে লো তোরা । সেই বিষের পর একবার দেকা দিয়ে চলে গেলি । কি সেন্দার লাল টকুটেকে চেহারা ? তা এতদিন মনে পড়ল বুঝি !

লজ্জার অপমানে আসতে পারিনো পিসীমা ।

সব স্তনেচি তোরা হুলোর কাছে । তাই'টি কে ?

স্বর্ণ বলে, আমার দাদাবাবুর স্ত্রী ।

ও তাই বুঝি আর মা তোরা জন্মে আমার হুলো বেঁচেচে । সব স্তনেছি আমি । আর ঘরে আর ।
না পিসীমা আমার থাকলে চলবে না । তোমাদের স্বর্ণকে ফিরিয়ে দিয়ে আমার স্বামীর পাপের প্রায়শ্চিত্ত করে গেলাম ।

হিঃ উ কথা বলতে নাই মা । এই সনসারে ছারদিন ভালমন্দ লোক আছে । আর তোরা মতন ভাল লোক আছে বলে এই সমসার চলচে ।

তাহলে চলি পিসীমা !

কি আর বলব আকন । একা মেয়ে মানুষ এতটো পথ ঘাবি ?

ও তুমি চিন্তা করো না । ট্যাক্সিতে এখান হতে দেড় ঘণ্টা লাগবে, ডাইভারকে ট্যাক্সিটা ছাড়তে বলে উঠে পড়েন বকুলদেবী ।

স্বর্ণকে বলেন তোরা আমার ঘরে ঘাসনা এখানে আসি বরক একদিন আসব অর্ককে সঙ্গে নিয়ে । ট্যাক্সিটা ছেড়ে দেয় একবাশ ধোঁয়া ছেড়ে । স্বর্ণ আপসা নেত্রে চেয়ে থাকে ট্যাক্সিটার দিকে । এক সময় যেটা তার দৃষ্টির অগোচরে চলে যায় ।

হুলাল খেঁদি জ্ঞানদাদেবী স্বর্ণকে সাদর অভ্যর্থনার ঘরে নিয়ে গিয়ে একসাথে বসে চাঁদের হাট বসায় ।

— ষোড়শ পর্ব —

বকুলদেবীর যখন গৃহে পৌঁছান তখন প্রায় রাত্রি আটটা । যিনোদবাবু তার আগেই পার্টি অফিস হতে গৃহে ফিরেছেন । অর্ককে জিজ্ঞেস করে বকুলদেবীর স্বর্ণকে নিয়ে পিতৃগৃহে যাত্রার খবর তার কান পৌঁছে গেছে । গৃহ শিফক একটু আগেই অর্ককে পড়িয়ে চলে গেছে । অর্ক ব্রিডিক্রমে অধ্যয়ন রত । অর্ককে রেখে বকুলদেবীর পিতৃগৃহে যাত্রায় একটু ঘেন আশ্চর্য হন যিনোদবাবু । তিনি অর্কের পাশটেতে বসে তার পড়াগুলো অগ্রগতির খবরাখবর জিজ্ঞেস করছিলেন । এমন সময় বকুলদেবী অর্কের অধ্যয়ন গৃহে পদার্পণ

করে অর্ককে জিজ্ঞেস করেন ইয়ারে, অর্ক বিকেলের খাবারটা ঢেকে রেখে গিয়েছিলাম ওগুলো খেয়েছি সু তো।

ইয়া মা খেয়েছি ?

তোর পরীক্ষা কবে হবে রে ?

দিন পনের পর হবে।

আরতো বেশী সময় নেই। এবার একটু বেশী পড়। কাল হতে ভোরে ডেকে দেব।

ইয়া, পড়ব তুমি ডেকে দিও। বাপি, তুমি যে বলছিলে কলকাতায় গিয়ে সাজেশান এনে দেবে।

ইয়া, বেরুনো এনে দেবে আমার সব লাইন ঠিক করাই আছে। ওর জন্যে চিন্তা করতে হবে না। একবারে প্রশ্ন পত্রের নকল।

কিন্তু আর যে সময় নেই।

কাল পরশুর মধ্যাহ্নে চলে আসবে।

বকুলদেবী ইতিমধ্যে কাপড় বদলাতে অন্য কক্ষে গিয়ে ঢুকেছেন। বিনোদবাবু বকুলদেবীর কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করেন—স্বর্ণকে তোমার ভাইএর কাছে রেখে এলে বুঝি ?

না তাকে মুক্তি দিয়ে তার ছুলালের কাছে রেখে এসেছি।

ছুলাল, সে শালা এখনও বেঁচে আছে নাকি ? থাকলেও তাকে বাঁচতে দেওয়া হবে না। থাক স্বর্ণকে ছুলালের কাছে পৌঁছে দেওয়ার আগে আমাকে এক কথা জিজ্ঞেস করার কি প্রয়োজন মনে করলে না

না প্রয়োজন মনে করিনি।

সে কি। আমার গোপন কার্যকলাপ কিছু জানতে বাকী নেই ওর। সব কথা যদি ফাঁস করে তাহলে আমার পিছনে ভিজিলেন্স লাগতে পারে তা জান।

জানি কিন্তু এও জানি লেগেও কিছু করতে পারবে না। তোমরা মন্ত্রী লেবেলের লোক। দেশের শাসন কর্তা হব কে লব্ব করলেও সাধারণ মানুষের কিছু করার নেই। তাছাড়া স্বর্ণ সে রকম মেয়েই নয়। কিছু করবে না। শুধু নিজে বাঁচতে চায়।

কিন্তু আমি অত রিস্কের মধ্যে যাব কেন ? তুমি তো জান আমার গোপন কার্যকলাপে যারা যুক্ত তারা কেউই আজ পর্যন্ত এখান হতে বেরুতে পারেনি শুধু একজন বেরিয়ে গিয়েছিল। তার লাশ কাকপক্ষীও টের পায় নি। কোথায় দিয়ে এলে স্বর্ণকে। আমি আবার তাকে এখানে নিয়ে আসব।

ছুলাল ছাড়বে না। সে এখন নিঃশ্বাস নেয়। মাঝারী নটকোনা দোকানের মালিক। পঞ্চপুরে বাবার টিপেতে সে এখন স্বনির্ভরশীল।

হোক গে আমি কালই ওকে ফিরিয়ে আনব এখানে।

আনতে গেলে তোমারই ক্ষতি হবে। জেনে রেখ ওঠা তোমার এলাকা নয়।

সেটা তোমাকে ভাবতে হবে না। আমার নাম বিনোদ প্রামাণিক। আমার সব কথা জানে এমন একজন লোককেও আমি আমার কাছ ছাড়া করব না। আজ বাইশ বছর তার ব্যতিক্রম হয়নি এখনও হবে না।

ট্যাক্সি ড্রাইভারটা বিনোদবাবুর প্রাসাদের একটি ছোট কক্ষ থেকে। তাকে জানিয়ে দেন কাল শোর পাঁচটার পঞ্চপুর রওনা হবার জন্য।

বকুলদেবীর সঙ্গে বিনোদবাবুর আর কোন কথা হয় না। নিশীথ ভোজনপরী সমাধার পর বকুলদেবীর উপর অতিমানে শয়নকক্ষে একাই দরজা এঁটে দেন বিনোদবাবু। বকুলদেবীও এই অতিমান ভাঙানোর প্রয়োজন মনে না করে অর্কের পাশটিতে শুয়ে পড়েন। কিন্তু নিদ্রা আসে না তাঁর। কাল যে কি অবটন ঘটবে কে জানে। হয়তো তখনতে পাবে হুলাল ও স্বর্ণ হুজুনকেই এ জগত থেকে বিদায় দিয়েছে তার স্বামীর অনুগত সাগরেন্দ্রা। দিনকাল বদলাচ্ছে। এম. এল. এ হবার পর স্বামীর শত্রু সংখ্যা অনেক বেড়েছে। এতবড় ঘটনা যদি অর্ক কোন ভাবে জানতে পারে স্বামীর প্রতি তার অশ্রদ্ধা বেড়ে যাবে। এরকম নানান দৃষ্টান্তের মধ্যে রাতটা শেষ হয়।

শোর পাঁচটার বিনোদবাবুর জেগে উঠেছেন। দরজা খোলার শব্দে বকুলদেবী তা টের পেয়ে চা তৈরী করে স্বামীকে দেবার জন্য তার সামনে দাঁড়ান। রিভালবারটা পকেটেপুরে বিনোদবাবু সেদিকে ভ্রক্ষেপ না করে নীচে নেমে আসেন। ড্রাইভার ট্যাক্সি বের করে বিনোদবাবুর ভগ্নে অপেক্ষা করছিল। বিনোদবাবু ট্যাক্সিতে উঠে পড়েন। নিমেষের মধ্যে ট্যাক্সিটা উধাও হয়। বকুলদেবী সঙ্গে সঙ্গে নেমে এসেছেন বিনোদবাবুকে কি যেন বলবার জন্যে। কিন্তু তাঁকে রাগান্বিত দেখে কিছু বলার সাহস হল না। মনের মধ্যে প্রচণ্ড অস্বস্তি ভোগ করতে থাকেন তিনি। ভাবতে থাকেন স্বর্গকে পাঠান তার ঠিক হয়নি। স্বর্গ ও হুলালকে তিনি যত্নের দিকে ঠেলে দিয়েছেন। স্বর্গ নেই এ উৎকর্ষের বসে থাকলে তো চগবে না। অর্কে কুলে যাবে তার জন্য রান্না চড়াতে হবে। বাধ্য হয়ে অস্থির মন নিয়ে রান্নার কাজে বাস্ত হতে পড়েন।

হুলাল দোকানে বসেছে। দোকানের সামনে গাড়ী এসে দাঁড়ায়। হুলাল দেখে তার পূর্ব পরিচিত বাবুকে ট্যাক্সি হতে নামতে। দোকান ঘরের দরজার শিকল জুড়ে আপ্যায়ন করেন—
আমুন, আমুন ভাল আছেন তো?

সে কথার কোন জবাব না দিয়ে বিনোদবাবু জানতে চায় তার মা কই।

খৈদি ও স্বৰ্ণ ট্যাক্সিৰ শব্দে খিড়কি খাট হতে বিনোদবাবুৰ সামনে দাঁড়িয়েছে। বিনোদ বাবুকে দেখেই স্বৰ্ণৰ মুখটা বিবৰ্ণ হয় ওঠে—ক্ষীণকণ্ঠে বলতে থাকেন আপনি

ইয়া, তোকে নিতে এলাম। তাড়াতাড়ি তৈরী হয়ে নে এক্সুনি যেতে হবে।

হুলাল জবাব দেয়—আর মায়ের যাওয়া সম্ভব হবে না। তাছাড়া আমরা এই নটকোণ দোকানটা খুলেছি। এতে আমাদের সংসার চলবে।

সারাক্ষণ তোর মাকে পুষলাম তাই আমারও একটা দাবী আছে। তোর মাকে আজই নিয়ে যাব। আর স্বৰ্ণ ... স্বৰ্ণৰ হাতটা ধরে বিনোদবাবু ট্যাক্সিতে তুলতে চায়।

গৰ্জে ওঠে হুলাল ছাড়ুন বলছি।

বটে এতবড় সাহস? পকেট হতে রিভলভাৰ বের করে হুলালের দিকে উচিয়ে ধরেন—

একবারে ককিয়ে ওঠে স্বৰ্ণ হুলাল সরে যা সরে যা ওকে বিশ্বাস নেই।

হুলাল এসে ঝাঁপিয়ে পড়ে বিনোদবাবুৰ হাতটাকে বেকিয়ে ধরে যাতে কাউকে গুলি করার সুযোগ না পান। বিনোদবাবুৰ আঙুলে রিভলভাৰের ট্রিগারে চাপ পড়ে। রিভলভাৰটা গৰ্জে ওঠে গুলিটা বিনোদবাবু বক্ষের মধ্যে কয়েকবার ঘূৰপাক খেয়ে বক্ষের মধ্যোই খেমে যায়। মাটিতে লুটিয়ে পড়েন বিনোদবাবু। রিভলভাৰটা হাত হতে পড়ে যায়।

স্বৰ্ণ ছুটে এসে রিভলভাৰটা হাতে নেয়—হুলোকে আন্তে আন্তে বলে তুই সরে যা এখান হতে। তাহলে পুলিশ আসবে তোকে ধরে নিয়ে যাবে। তুই জেল খাটবি। নানা এ আমি সহ্য করতে পারব না। আমি বন্দী ছিলাম এই শয়তানের ধরে এবার থাকব সরকারের ধরে এতে আমার বিন্দুমাত্র কষ্ট হবে না। তু পালা এখান হ'তে। পরক্ষণেই স্বৰ্ণৰ হাতের রিভলভাৰ হতে আর একটা গুলি বেরিয়ে বিনোদবাবুৰ শরীৰে ঢোকে। স্বৰ্ণ ক্রুদ্ধ নাগিনীর মত বিনোদবাবুৰ দিকে চেয়ে চিৎকার করতে থাকে—তোরা সব সরে যা। ও আমার ইজ্জত নিয়ে স্বামীকে খুন করিয়েছে, আজ হুলোকে খুন করতে এসেছে ওকে আমি খুন করব, তোরা সবাই সরে দাড়া। এভাবে একটানা চিৎকার করতে থাকে স্বৰ্ণ।

পরপর দুটো গুলি ও চিৎকারের শব্দে গ্রামের অনেকেই ছুটে এসেছে। জ্ঞানদাদেবী পুকুর ঘাটে স্নান সারছিলেন। তিনিও সিন্ধু বসনে ছুটে এসে স্বৰ্ণকে থামাতে তার হাত দুটোকে ধরতে চায়—স্বৰ্ণ ঝাঁকি মেয়ে তাঁকে সরিয়ে দিয়ে বলতে থাকে—তুমি সরে যাও পিসী, আমাকে শোধ নিতে দাও। এই শয়তানটা আমাকে পথের ভিখারী করেছে।

পাশে দাঁড়িয়ে থাকা হুলাল চিৎকার করে ওঠে—মা এ তুমি কি বলছ?

ইয়া ইয়া আমি ঠিক বলছি। সরে যা তোরা। আমি গুলি করে মনের জ্বালা মেটাই।

গ্রামের লোকজনেরা হতভয় হয়ে পড়ে। অনেকের কাছে অপরিচিত স্বর্ণকে এই অবস্থার মধ্যে। গ্রামের চৌকিদার এ ঘটনা চাক্ষুষ করে কাটকে কিছু না বলে গ্রামের শেষপ্রান্তে পুলিশ ফাঁড়িতে খবর দেয়।

দশ মিনিটের মধ্যে পুলিশ আসে। স্বর্ণর হাতে হাতকড়া পড়ায়। স্বর্ণ ততক্ষণে চিংকার করে চলেছে—খুন করেছি বেশ করেছি যে আমার সংসার খেল, স্বামী খেল, তাকে খুন করব না তো করব কাকে ?

স্বর্ণকে গাড়ীতে তুলে মৃতদেহটাকে গাড়ীতে তোলে। দারোগাবাবু সামনে দাঁড়িয়ে হৃৎকনের কাছে বিবরণ জেনে লিখে নিয়ে তাতে সই করিয়ে নিয়ে গাড়ীতে ওঠেন।

হুলাল ফুপিয়ে ফুপিয়ে কেঁদে মাকে বলতে থাকে—মা এ তুমি কি করলে।

আমি ঠিকই করেছি বাবা। আমি তোমার মা তোমার হৃৎক যে আমি সইতে পারব না। তাই তোমার শত্রুকে শেষ করলাম। তোরা সুখী হ' বাবা।

আবার ডুকরে কেঁদে ওঠে হুলাল—ওঃ আর পারছি না। পারলাম না দিদা আমার বন্দিনী মাকে আমি উদ্ধার করতে পারলাম না। হুলাল মুহূর্তে যায়। যদি জ্ঞানদাদেবী হৃৎকনে অশ্রুসিক্ত নয়নে তাকে ধরাধরি করে ঘরের ভিতরে এনে তার জ্ঞান ফেরাবার চেষ্টা করতে থাকে।

সুসাহিত্যিকা (শোভনা) সেন-এর

পুরুষোত্তম শ্রীচৈতন্য (মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের ৫০০তম আবির্ভাব স্মরণে)	মূল্য ২০ টাকা
সাধক মালিকা (মহাপুরুষগণের জীবনী পণ্ডে)	মূল্য ২০ টাকা
ছোটদের শ্রীরামকৃষ্ণ (পণ্ডে)	মূল্য ৫ টাকা
মাটির প্রদীপ (কাব্য গ্রন্থ)	মূল্য ৫ টাকা
ওরা কাজ করে (গল্প)	মূল্য ১৫ টাকা

প্রকাশক : কৃষ্ণ কিশোর সেন, ১৮৩, বেচারাম চ্যাটার্জী রোড, কলিকাতা-৬৯

প্রাপ্তিস্থান : এম সি সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাঃ লিঃ, ১৪, বক্সিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩

ক্রাচ

(ত্রৈটোন্ট ত্রৈখট)

অনুবাদ : দ্বিগম্বর দাশগুপ্ত

ক্রাচে ভর ছাড়া হাঁটেতে পারি না হবে তা বহর সাত
দেখাতে গেলাম ডাক্তার এক, আছে বেশ নাম ডাক
আমাকে দেখেই প্রশ্ন তাঁহার : “মিছে কেন হুই হাত
রাখিয়াছো জড়ো লাঠি জোড়া নিরে” শুনে আমি হতবাক,—
হয়ে বলি তাঁকে, “রেখেছি কি সাথে ? মিছে এই লাঠি জোড়া,
হাঁটেতে পারি না স্বাভাবিক ভাবে, পা দুটি আমার খোঁড়া।”
শুনে তিনি কন : এ আর এমন নুতন কি কথা হলো ?
পায়ে ভর করে হাঁটা শুরু করো, ওদের ভরসা ভোলো।
একথা বলেই পরম যতনে পা দুটি আমার দেখে
জোর করে কেড়ে লাঠি ‘জোড়াখানি’ বগলের তলা থেকে,
দানবের মতো সেকী বিভৎস অট্টহাস্ত হেসে
ক্রাচ, জোড়াখানি ভাঙিলেন তিনি আমারই পৃষ্ঠদেশে।
তারপর সেটা ছুঁড়ে ফেলে দেন, ফলতঃ এখন আমি
হাঁচি, চলি বেশ স্লুহু হয়েই মূলে তাঁর ঐ হাসি
কেবল যখন চোখে পড়ে কাঠ, তখন-ই একটু খাম্মি’
কিছুটা সময় ঈষৎ খোঁড়াতে, সেই ক্ষণে ভালোবাসি।

প্রাক্তর ডাঃ জি. সি. মুখার্জী ও ডাঃ (মিসেস) কবীর প্রণীত—

“ডায়াবিটিসের জীবন ও চিকিৎসা”

(দ্বিতীয় সংস্করণ)

মূল্য—১০ টাকা

ডায়াবিটিস রোগী, নার্স, সেবিকা, প্যারা-মেডিকেল কর্মীদের জন্য সাবলীল সোজা বাংলায় লিখিত।

প্রাপ্তিস্থান—‘আভা’ কার্যালয়, ৭০সি, শরৎ কন্ঠ রোড, কলিকাতা-৭০০ ০২৬

টেলিফোন : ৪৭৫-৮১৭২

বি. বি. কেন্দ্র

ঋতা বন্দ্যোপাধ্যায়

সুরজিৎ আর শাস্তা মিটার রাজধানী থেকে কলকাতা এসেছে,—মানে পশ্চিম থেকে পূবে এসেছে। স্বাভাবিকভাবেই সঙ্গে এনেছে আনুষঙ্গিক উন্নাসিকতা। সুরজিৎ বিদেশী সংস্থায় মোটা অঙ্কের কাজ করে। দশ বছর পর হঠাৎ এই মহানগরীর মহাবিস্তৃত বদলী হয়ে এসে মানসিক ঝাপ-ঝাওয়ানোর লড়াই চালাতে বাস্তু। সুরজিৎ উত্তর কলকাতার অধিল মিস্ত্রী লেনের অতি ছা-পোষা ঘরের কুতী ছেলে। শাস্তার এলাহাবাদে জন্ম-কন্ম, সেই স্বেবাদে বাঙালী বলে পরিচয় দিতে রীতিমত কুঠা বোধ করে। তার বিবেচনার এলাহাবাদও যা, লখন বা ওয়াশিংটনও তা।

পরিপাটি সাজানো সংসার, ‘হম দো হমারা দো’ পদ্ধতিতে দুটি লাখা-প্রশাখা—তবে একটি ছেলে ও একটি মেয়ে নয়, দুটিই ছেলে। ভোতন আর ঘোতনের পোষাকী নাম ইল্লজিৎ আর অরিজিৎ।

আজকাল অবিসম্বাদিতভাবে নারী-পুরুষের সমানাধিকার, কর্তব্যকর্মও সব আধাআধি। তা সেই আধাআধির কারণে সুরজিৎের ভাগে পড়ল ভালো পাড়ার ঝক্ঝকে ফ্লাট জোগাড় করা, এ ছাড়া গ্যাস (ডবল সিলিণ্ডার) এবং ক্রম অদৃশ্যমান নির্ভরযোগ্য একটি কাজের লোক সংগ্রহ তা বলতেই হয় যে সুরজিৎ কুতীত্বের সঙ্গেই এই সামান্য ক’টি দায়িত্ব পালন করল। পাণ্ড ভাগে পড়ল, ছেলেদের ভল্লো ভাল স্কুল, তার মানে অবশ্যই তা ইংরিজি মাধ্যমের ও তৎসহ অবশ্য প্রয়োজনীয় গুটিকর প্রাইভেট টিউটর সত্তর জোগাড় করা।

এই প্রাইভেট টিউটর সম্বন্ধে হুঁচকার কথা না বললে খোলসা হবে না ব্যাপারটা। এরা এক বিশেষ প্রজাতির মানুষ যারা গত দশ বছরে সংখ্যায় হু হু করে বেড়ে গেছে। এরা সগাই, কোন না কোন স্কুলের বেতনভুক শিক্ষক-শিক্ষিকা নামে পরিচিত। এরা নামকরা ডাক্তারদের মত কেবল একটু হাতে রেখে জ্ঞান-বিতরণ ক’রে বাকীটুকু প্রাইভেট কোচিংয়ের মাধ্যমে বিলিয়ে থাকে। এটাই দস্তর, এই-ই এখন প্রথা। এর বাইরে যদি কেউ চিন্তা করে, অর্থাৎ কি না মনে করে স্কুলে নিয়মিত যে যাচ্ছে এবং জড়বুদ্ধি যখন নয় তখন ক্লাশের পড়া নিজেই পারবে; তবে তাকে মানসিক ভারসাম্যহীন বলে চিহ্নিত করা ছাড়া উপায় নেই।

পালের ফ্লাটের মিসেস দফাদারকে শাস্তার বেশ আলাপী আর উপকারী মনে হয়। সবচেয়ে সুবিধে যে একটাও বাংলা কথা বলতে হয় না ওর সঙ্গে। হিন্দী আর ইংরিজির বিদ্যুটে মিশ্রণ

‘হিনরিজি’তেই দিবি কথোপকথন চলে। সেদিন শাস্তার মত সাজানো ডুইংকমে হুজনের কথাবার্তা হচ্ছিল।

শাস্তা—হাই অল্কা—

অলকা—হাই শাস্তা। জাস্ট লাইক ছাট ড্রপ ইন্ কিয়া। টেক ইট্ ইজি, ফিকর মং করো, নো ফরম্যালিটিজ প্রিজ্।

শাস্তা—ফাইন। ক্যান য়া বেকমেণ্ড এ গুড কোচিং ক্লাশ অর এ প্রাইভেট টিউটর ফর দ্য বয়েজ? হ্যাভ সলভ্ ড দ্য প্রবলেম অফ্ এ গুড স্কুল অলরেডি। থাঙ্ক গড্ ওয়ান বিগ্ হেড এক ইজ ওভার। অব প্রাইভেট টিউটর ফিট কর দেগা তো বাস্ নো বদারেশন ফর দ্য বয়েজ্।

অলকা—দেয়ার ইজ্ ছাট রিপুটেড বি বি কেন্দ্র—এ গ্রেড ফর অল টাইপস্ অফ্ প্রাইভেট কোচিং। যো ভি ক্লাশকে, যো ভি স্ট্রিমকে, য়ারসা ভি ক্যালিবরকো হো—দে কোচ ভেরি ওয়েল্।

শাস্তা—ওয়াটারফুল। নাও আই ভোল্ট হেট ক্যালকাটা সো মাচ্। বাট্ ইজ দিস্ প্লেস বহোত দূর হমারা বিল্ডিং সে?

অলকা—নো, নো মাই ডিয়ার, স্টোনস্ থ্রো ওনলি।

শাস্তা—ও রিইয়েলি। আনন্দে একেবারে হাততালি দিয়ে ওঠে সে।

আরও কিছু খবর লেনদেনের পর ‘বাই’ বলে অলকা দফাদার গাত্রোথান করল। শাস্তা দরজা অবধি এগিয়ে দিয়ে সুর করে টেনে “বা—ই অল্কা” বলল। শাস্তা যথেষ্ট স্নেহশীল ও দায়িত্বপূর্ণ মা। কালবিলম্ব না করে কোচিং ক্লাশের উদ্দেশ্যে রওনা হল। ‘স্টেশ ফরওয়ার্ড’ স্কুলে ভোতন ঘোতনের ভর্তি হওয়াটা প্রায় পাকাই করে ফেলেছে সে। ডোনেশনটা হুজনের মিলিয়ে মাত্র হাজার দশেক হবে। আজকের এই মুদ্রাস্ফীতির দিনে এত রিকনএবল ভাবাই যায় না।

বি বি কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা ও অধ্যক্ষ স্টেশ ফরওয়ার্ডেরই প্রাক্তন শিক্ষক শ্রীমহারাজ রায়। গ্যারান্টি দেন, ছেলেরা যে বোর্ডেই পড়ুক ভাল করবে। শাস্তা তাত্ক্ষণিক সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলে ছেলেনের ভর্তি করায়। অত্যন্ত অমায়িকভাবে মহারাজবাবু বলেন—আমাদের ব্রেট খুব কম, ভর্তি হতে মাথা পিছু মাত্র হু’হাজার করে। উঁচু ক্লাশে প্রতি বিষয়ের জুড়ে মাসিক সাড়ে তিনশো, আর নীচু ক্লাশে সায়েন্স আড়াইশো, অন্যান্য বিষয় হুশো করে। বাংলা পড়ানো হয় না। আগামী শিক্ষা বছর থেকে বাড়বে। চেক বইটা শাস্তার ব্যাগেই থাকে আজকাল। সেটা বের করে খস্ খস্ করে চেক লিখে মহারাজ রায়ের হাতে দিয়ে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেন।

সবই তেল দেওয়া চাকার মত আরামে গড়াতে লাগল। খালি কলকাতার হাওয়া লেগে সুরজিং যেন কেমন পাল্টে যেতে লাগল। থেকে থেকেই ওর আদি বাড়ি যেটা এখন ঝরঝরে একেবারে, আভা / শারদীয়া সংখ্যা—১৮৬

সেখানে যাতায়াত শুরু করল। একদিন বিস্তৃত বাংলার শাস্ত্রকে জিগেস করল—‘আচ্ছা, এই বি বি কেন্দ্রের আসল মানেটা কি? শুভলোকের নামের আশ্রয় তো শুনছি ম? একদিন সময় করে যাবো ওখানে।

এরপর মাসাধিক কেটে গেছে। সুরঞ্জিতের খাঁটি বাঙালী হয়ে যাওয়ার সমস্যাটা ছাড়া আর কোন মুস্কিল নেই শাস্ত্রার আপাততঃ।

সেদিন ধুমকেতুর মত বিকল বেলাতেই সুরঞ্জিত বাড়িতে উদয় হল, শাস্ত্রার তখনও মেকআপও শেষ হয়নি। এত তাড়াতাড়ি তো অফিস থেকে ফেরে না কখনও। শাস্ত্রার উদ্বেগতা বর্দ্ধিত হয় স্বামীর হাঁড়ির মত মুখ দেখে।

‘কি ব্যাপার? এনি প্রবলেম ইন অফিস?’ শাস্ত্রার গলায় উৎকণ্ঠা ঝরে পড়ে।

‘না, না।’

দেন? ফিলিং সিকু? শ্যাল কল্ এ ডকু? মাথা টিপে দেব?

‘না না না। আজ আমি তোমাদের ঐ চমৎকার বি বি কেন্দ্র গেছিলাম। অধ্যক্ষের সঙ্গে দেখা করে জানলাম বি বি’র আসল মানেটা কি। জানো, দাঁত বের করে ঐ মহারাজ না যমরাজ কি বলল আমাকে?’

‘কি?’ শাস্ত্রার গলা ভার্যার্ত শোনাল,—যেন কিছু আটকে যাচ্ছে।

‘বি বি কেন্দ্র মানে হল বিত্তা বিক্রয় কেন্দ্র। আমি ব্যাটার বিক্রয়ে কেস করব। তোতন ঘোতনের নাম একদম কেটে দিতে বলেছি।’

‘এঁয়া! ও মাই গড্ আর যু ক্রেইজি? বিত্তা বিক্রয় কেন্দ্র তো সো ওয়াট ডার্লিং? আজকের দিনে সব কিছুই যখন বিক্রি হয় তখন বিত্তাও হলে ওয়াট ইজ্ রড্? নাও, বি ব্যাশশ্যাল। ডোন্ট বি সিলি লাইক এ রিয়েল ইমোশনাল বেঙ্গলীবাবু। ছেলেদের ফিউচার সম্বন্ধে ভাবো প্লিজ’। শাস্ত্রার মাথা ঘুরছিল, কোনমতে কাছের সোফাটার চট করে শুয়ে পড়ে।

মাথার চুল ধরে টানতে টানতে সুরঞ্জিত ব্যাপার মত চোঁচাতে থাকে—‘না, বিত্তা, ভালোবাসা এ সব কিছুতেই বিক্রি হতে দেব না।’



অপূর্ণতা

রায়স্রনাথ মল্লিক

পূর্ণের পটে অপূর্ণতার কতই না তুলি আঁচড় কেটে চলে
নানান ছলে বলে—

সাগর শুধু ঢেউয়েই বুঝি ঢেউয়েই যেন ফেনার রেখা এঁকে
বালির ভেঁটে খেলার মোহে থাকে কি আর বৈকে ?

সমতলে তুলছে যে এক—ধ্বজা

আসছে কত ভাসছে কত দেখতে লাগে মজা

ভাগছে শুধু ফেনার পরে ফেনার ওঠা পড়া—

নিভাস্ত এক চড়া

মেজাজ নিয়ে থাকলে তবু ভাবতে ভালো মনে ;

হয়তো সংগোপনে

আজকে যদি দেখলে চোখে যেটুকু যার কালো

ভাবনা থেকে ভালো—

দূরের পথে দূরের পথে হটিয়ে দিয়ে চলতে থাকা যার

নিশ্চয় জানি ফুলের শোভা মানতে কেন চায় !

কারণ বুঝি চোখের দেখা মনের দেখা হলে

নিজের মতো হাজারো খুশি দলে

হারিয়ে যাবে অচেনা দরবারে,

নিঃস্ব রূপ স্বরূপ বুঝি থাকবে না সংসারে ।

কি জাতি কি হয়

শৈলজা চৌধুরী

—‘মাসীমা, আমাদের নিয়ে একটা গল্প লিখুন না।’

—দক্ষিণ কলকাতার এ. সি. কেবিনে শুয়ে শুয়ে শুনি নন্দার কথা।

—আমাদের বড় ছুঁখের জীবন।

—মুখ দেখে তো তা মনে হয় না। বয়স কত তোমার ?

—এই বাইশ।

—ও তবে তো জলন্ত আগুন।

—হি হি করে হেসে গড়িয়ে পড়ে নন্দা। মাসীমা তারি মজার কথা বলে। হাসতে হাসতে ছুটে যায় অন্যান্য সেবাকারিণীদের কাছে।

—মাসীমা কি বলেছে শোন, বাইশ বছর—জলন্ত আগুন। নার্সিংহোমে আসার সঙ্গে সঙ্গেই নন্দা গানে, গল্পে, কথার সবাইকে মশগুল করে রাখে।

—জানেন মাসীমা, কেউ মুখ তার করে রাখলে আমার ভাল লাগে না। ওই যে কোণের ছেলেটি, যার জড়িস হয়েছে, সে আর মোটে হাসে না। তাই হাসাতে যাই আমি।

—আমি হাসি।

—মাসীমার হাসিটা কি মিষ্টি।

—মিষ্টি আমার হাসি নয়, তোমার বাইশ বছরের বসন্তের মধু।

—আবার হাসির পালা। ছুটোছুটির খেলা। আর গুনগুনিয়ে গান।

—কোথা থেকে আস নন্দা ?

—সে অনেক দূর মধ্যমগ্রাম ছাড়িয়ে আরও দূরে।

—কটার বেরোর ?

—৬টার বাস ধরি। উঠতে হয় কাক ভেঁরে। তবু মা দিদি আছে। তারাই খাবার করে দেয়। টিফিন করে দেয়।

—কি নিয়ে আসে ?

—কুটি তরকারী, ভাত, ডিমসিদ্ধ, ভাজা—সকলো সব। না হলে আনবো কেমন করে ?

—গতকাল সন্ধ্যাতে তোমার সাদা ড্রেস ছেড়ে যে ছাপা হাক্কা নীল টেরিভয়েলটা পরেছিলে, সেটা পরে এসেছিলে না ? ঐ শাড়ীটার তোমায় খুব মানিয়েছিল।

—হ্যাঁ স্নান সেরে বেরোই, আবার গিয়ে স্নান করি।

—কতক্ষণ আসতে লাগে ?

—তা হ'লটা আসতে, হ'লটা যেতে। আবার পথে জট পাকলে আরো দেরী হবে যাব। রাত দশটার আগে কোনওদিন পৌছই না। গিয়েই দাদার সঙ্গে দিদির সঙ্গে খুনসুটি করি। মা বলে—নন্দাটা বাড়ি ছিল না। বাড়ি ছিল চূপচাপ। যেই এল অমনি বাড়ি সরগরম।

—একটু চোখ বুজিয়ে ভেবে নিই। সাধারণ মেয়েদের চেয়ে মাথা ছাড়ানো তব্বী মেয়েটির শ্রামা মুখে কিসের আবেশ !

নন্দা বলে—ভাগ্যে বাবা ঐ বাড়িটা করে গিয়েছিলেন আম, জাম কত্ত গাছ। যাবেন মাসীমা ?

—বুঝতে পারছি আশেপাশের গাছপালার শ্রামতী মেয়ে কাঁঠালী চাঁপার গন্ধে নেয়ে তুমি বাইশ বছরের বসন্ত ভরে নিয়ে আস।

—উঃ দাক্ষণ মাসীমা। আবার ছুটে চলে যাব। দূর থেকে শুনি হাসির শব্দ।

আবার কখনো এসে বলে—ওই যে ছেলেটা, যার জন্মসময় থেকে, সে কি বলে জানেন ?
—কাজ ছেড়ে দেব। আমি বলি—কেন ? বলে কি—অসুখ হল যে। বলি—অসুখ কি কারো হয় না ? তা বলে কাজ ছাড়বেন ? আসলে আটবোনের এক ভাই তো ? বড় আদরের।

নাইট নার্স এসে পৌছয় আটটার আগেই। ড্রেস বদলে আসতে আটটা বেজে যায়। একটু বয়স হয়েছে। এসেই একটা বই নিয়ে বসে।

—কি পড়ছো ?

—দেনা-পাওনা।

—শরৎচন্দ্রের।

—হ্যাঁ। আমি, আমার মেয়ে দুজনেই পড়তে ভালবাসি।

—মেয়ে কি পড়ে ?

—এই সেভেনে, আর ছেলে ক্লাস ফোর্থে।

—স্বামী ?

—সেন্ট্রাল গার্ডমেন্টে আছে ।

কি কাজ আর জিজ্ঞাসা করি না ।

—কোথা থেকে আস ?

—সাঁতরাগাছি ।

—বুঝতে পারি জীবনযুদ্ধে নেমে পড়েছে । তাই কর্তব্যে ক্রটি নেই । তবে প্রাণও নেই ।

—নন্দা এসে পৌছয় সকাল আটটার সময় । হয়তো কোনও দিন একটু দেৱী হয়ে যার ।

—নাইট নার্স আরতি রাগ করে । বলে আমি আসি সাড়ে সাতটায়, তুমি এলে আটটার পৰ ।

নন্দা বলে—রাস্তায় জাম ছিল ।

—সকালে ।

—হ্যাঁ বিশ্বাস করুন ।

—না এ হ'তে পারে না । নাইট নার্স রাগ করে ।

বেশী কথা বাড়ায় না নন্দা । আমার কাছে এসে বলে—

দেখলেন তো আমার ওপর কেমন করলো ?

—একটু পরেই আবার যে কে সেই । নন্দা হাসছে, গান গাইছে । —ছুটে ছুটে এখানে ওখানে যার ।

—মাসীমা, দেখুন, এই বাজারে ছেলেটা তার নার্সকে ছাড়িয়ে দিল । বেচারা, টাকাটা তো পাচ্ছিল । আবার বলে কি—আপনি আমার কাছে থাকুন । কেন, আমার পেশেটে নেই ?

সেদিন সকালে আসতে বলি,—নন্দা কাল আমার ছুটি হয়ে যাচ্ছে ।

নন্দা বলে—আমারও ছুটি ।

—কেন সঙ্গে সঙ্গে পাবে না কাজ ?

—না । তাছাড়া তিন চার দিন বিশ্রাম নেব । কাপড় চোপড় ধোবো । খাব, ঘুমাবো । পরে আবার আসবো ।

—ওর মুখের দিকে চেয়ে দেখি বাইশ বছরের বসন্ত টগবগ্ করে ফুটেছে ।

আবার কিছুক্ষণ পর ঘুরে এসে বলে—কাল দাদার জন্মদিন । আমি ঠিক করেছি একটা চাবির রিঙ দেব । দাদার দোকান আছে । কাজে লাগবে । কেমন হবে মাসীমা ?

—ভাল হবে ।

—মাসীমা আমার ভুলে যাবেন না তো ?

—ভোলা কি এতই সহজ ?

—আসবেন একদিন আমাদের বাড়ি ।

হেসে বলি—সেটা বলতে পারছি না । যোগাযোগ হলে যেতেও পারি ।

—আমি আমার ঠিকানাটা রেখে দিলুম । সে বলে । ছোট্ট একটা কাগজে ঠিকানা লিখে রেখে দিল । বালিশের নীচে ।

বলতে পারলুম না—হয়তো হারিয়ে যাবে ।

আবার খানিকক্ষণ ঘুরে ফিরে—মাসীমা, আমাদের নিয়ে লিখবেন তো ?

হেসে বলি—লিখবো ।

অমনি আনন্দে চিৎকার করে ছুটে যায় । অশ্রু নার্সদের বলে—মাসীমা বলেছেন আমাদের নিয়ে লিখবেন ।

মনে মনে বলি—লিখবো তোমার বাইশ বছরের মনে যে অশোক কিংসুক ফুটে উঠেছে ।

—তার কথা নিশ্চয় লিখবো । কিন্তু তারপর ?

তারপরের কথা তো আর জানি না । বাইশ বছরের ফুলটা আরও ফুটেবে না শুকাবে—কে বলবে ? বসন্তের শেষে তো গ্রীষ্ম—কে জানে কি হয় ।

যাবার সময় দেখি—ছোট্ট কাগজের লেখা ছোট্ট ঠিকানাটা কোথায় উড়ে গেছে ।

সাহিত্যিক স্রীজ্যোতির্ময় বাল্যাপাধ্যায়ের

“সাম্যবাদী রাজপথ” (নিবন্ধমূলক উপন্যাস)

সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে । মূল্য ৩০ টাকা

প্রকাশক : স্রীমতী গৌরী বাল্যাপাধ্যায়

জয়দীপ প্রকাশন ; ১/৮৩, নাকতলা, কলিকাতা-৭০০ ০৪৭

প্রাপ্তিস্থান : শৈবা পুস্তকালয় ; ৮/১সি, শ্রীমাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩ ।

“লাল জরির ঘাগরা”

(ছোট গল্প)

অনিমা মুখোপাধ্যায়

আমার এক ছোটবেলার বন্ধু ছিল, নাম তার “বসন্ত কুমারী”। সে আর আমি পাশাপাশি বাড়িতে থাকতাম। দুই বোন, ছোট বোনের নাম “মীনাকুমারী”। ওরা রাজস্থানী। কিন্তু আমরা দুজনে, ছোট থেকে হেসে খেলে বড় হয়েছি। ওদের পরিবারের সঙ্গে আমাদের এত সম্পর্ক ভাল ছিল বলার নয়। বসন্ত ও তার বাবা জগদীশবাবু ও মা চিত্রাদেবী এত ভালো ও সুন্দর বলা যায় না। বসন্তকে বরাবর কনভেন্টে পড়িয়েছিলেন। তাকে বর্তমান যুগের শিক্ষা দীক্ষার বড় করেছিলেন। রাজস্থান থেকে এসে, কলকাতায় আমাদের পাশের বাড়িতে থাকতো। ওর বাবার, কলকাতায় রত্নর ব্যবসা ছিল। মাঝে মধ্যে, ওরা কেউ না কেউ রাজস্থানে চলে যেতো। যা হোক, বসন্ত ক্রমে বড় হোল। তখন, তার রূপ যেন ছোট ফুলের কুঁড়ি থেকে আস্তে আস্তে ফুল হয়ে ফুটে উঠছে। যখন তার, সত্তেরো বছর পূর্ণ হয়। জন্মদিন উপলক্ষ্যে খুব আনন্দ উৎসব হোল। কিছু পরে, জানতে পারলাম, জগদীশবাবু বসন্তর বিষের সংস্কর্ষ খুঁজছেন। কিন্তু, কেন কি তিনি বসন্ত বিষে করতে নারাজ। তাকে কারণ ভিজ্ঞাসা করি।

সে বলে-বিষে করতে আমার ইচ্ছে হয় না। দু-তিন জায়গা থেকে আমার দেখে গেছে। তারা কেউ অপছন্দ করেনি। কিন্তু দেনা-পাওনা তাদের অভ্যস্ত বেশী। তা-ছাড়া, বাবা মায়ের খুব একটা পছন্দ নয়। কিন্তু, সম্প্রতি, আমাদের এক আত্মীয় একটা সংস্কর্ষ এনেছে। তারা দেখে পছন্দ করে এখনি বিষে দিতে চায়। ওরা থাকে রাজস্থানে। বাবা-মাতো বেশ রাজি হয়ে গেছেন। তবে, বাবা বলেছেন আমার আঠার বছর পূর্ণ হোলে তবে বিষে দেবেন। কারণ আমাদের বংশের ধারা অনুযায়ী এই ব্যবস্থা হয়ে আসছে। রাজস্থানে, ছেলের ব্যবসা আছে। অবশ্য, বাবা সব খোঁজ-খবর নেবেন বলেছেন। ওরা তিন ভাই। বাড়ী জমি সব আছে। সব শুনে, বললাম ভালই তো হোল। তবে তার আপত্তি কোথায় বল? বসন্ত বলে—কেন তা, আমি নিজেই বুঝতে পারছি না তো বলবো কি? মোট কথা, আমার একটুও ভাল লাগছে না। এর আগে, যারা দেখে গিয়েছে তখন আমার মনটা এত খারাপ হয়নি। মতুন ঘরে যাব, আমার নতুন সংসার হবে। কত মধুর রঙীন স্বপ্নও মনে জেগে উঠেছিল। তবুও, তার পরেই, আবার মতের পরিবর্তন যখন হয়, তখন আর ইচ্ছে হয় না।

যাক্কে এখানে বাবা-মায়ের এই সম্বন্ধ যখন মনের মতো, তখন নিশ্চয় ভাল। মেয়ে হয়ে জন্মেছি যখন, তখন পরের ঘরে যেতেই হবে। আমি আর কতটুকু বুঝি বল, জিজ্ঞেস করি—তোদের বাড়ীর সকলে, ছেলেকে দেখেছে? তাদের আত্মীয়দের? বসন্তর জবাব—হ্যাঁ, এইতো সাতদিন আগে, বাবা রাজস্থান থেকে সব খবর নিয়ে ফিরলেন। চিত্রাদেবীর কাছে শুনিলাম বটে জগদীশবাবু রাজস্থানে গেছেন। যাক্ বসন্তর আঠারো পূর্ণ হতে দু-মাস বাকী। বিয়ের বেশ তোড়-জোড় চলছে। চিত্রাদেবী বিষেতে আমাকে রাজস্থানে নিয়ে যেতে চান। বসন্তরও খুব ইচ্ছে। বসন্তরা, রাজপুত বলেই, ওর বাবা, এই রাজপুত পরিবারে বিয়ে দিতে রাজী হয়েছেন। শেষে, ওঁদের সঙ্গে চলে গেলাম। বিষেও হয়ে গেল খুব ধুমধাম করে। কিন্তু, বসন্তর মুখখানি বড়ই মলিন। ওকে, কত বোঝাতাম। কিন্তু, ও নিজে কি বুঝেছিল জানিনা। আমার বোঝা নয়, শুধু একটু মলিন হাসি দেখতাম। স্বস্তর বাড়ী যাবার দিনে, সে কি করণ দৃষ্ট। বাবা-মায়ের গলা জড়িয়ে আমার গলা জড়িয়ে তার আকুল কান্না, চোখে দেখা যায় না। সকলকে, অশ্রু সাগরে ভাসিয়ে, বসন্ত, স্বামীর সঙ্গে ঘোড়ার চড়ে স্বস্তরবাড়ী চলে গেল। আমাদের মতো, বৌভাতে অনুষ্ঠান ওঁদেরও হয়। দেখলাম, মুখটি বিষন্ন করে, সেজে-গুজে বসন্ত বসে আছে। বলি—একটুখানি, আজকের দিনে তোর ঐ সুন্দর মুখখানা হাসিতে ভরিয়ে-দে-বসন্ত। আজ তোর ফুলশয্যা। নতুন জীবন শুরু। বিষাদ হেসে, আস্তে-আস্তে বলে—হাসবো কি? এবার তো, আমার জীবনে কান্না শুরু হোল। বাবা-মায়ের কাছে, যা হেসে খেলে, স্নেহে দিন কাটিয়েছি এখানে আসার আগে তাকে মুহু ভৎসনা করে বলি-বসন্ত, কি যে তুই একটা বাজে ভাবনা মাথায় রেখেছিস্ জানি না। আজকের দিনটা শুধু আমার কথা রাখ। স্বামীর সঙ্গে, স্নেহে ফুলশয্যার রাত কাটা। সে যা বলবে শুনবি ভাই। বুঝলি? এই সুন্দর দিনটা, প্রত্যেক মেয়ের সারাজীবনের স্মৃতি হয়ে থাকে। আমার কথা রাখবি তো ভাই? কাল তোর কাছে সব শুনবো কিন্তু। একটু হেসে, মাথা নেড়ে সম্মতি জানায়।

আমরা চলে এলাম। মানে, রাজস্থানেই ছিলাম। কারণ, বসন্ত দিরাগমনে ফিরলে ওকে নিয়ে কলকাতায়, কয়েকদিন থাকবে। আটদিন পর, বসন্ত ও তার স্বামী “কুমার” এল। সত্যি কথা বলতে কি, প্রথম থেকে কুমারকে দেখে একটুও ভাল লাগেনি। কথা জিজ্ঞেস করলে একটা ছোটো জবাব দেয়। দেখে মনে হয় অসুস্থভাব। মুখ, সব সময় গোমড়া হয়েই আছে। আড়ালে, বসন্তকে, ফুলশয্যার রাতের কথা জিজ্ঞাসা করি। বসন্ত, আমার মুখের দিকে চেয়ে এক সেকেণ্ড পর, বলে—ফুলশয্যা, সে যে কেমন হয় জানলাম না। খাট ফুলে সাজানই ছিল। যখন, ফুলশয্যার ঘরে ঢুকতে যাব, আমার খাণ্ডী, আমার আড়ালে, সতর্ক করে দিলেন—ওঁদের বংশের প্রথা অনুযায়ী, প্রথম ফুলশয্যার রাতে, স্বামীর সঙ্গে এক বিছানায় শুলে না-কি অমঙ্গল হয়। আমি যেন, সে চেষ্টা না করি। স্বামী বললেও যেন আমার আপত্তি থাকে এক বছর পালন করতে হবে এই

নিয়ম। তাঁর নির্দেশে মনে প্রথম ধাকা লাগলো। পরে, ঘরে গিয়ে স্বামীর প্রতিশ্রুতি বসেছিলাম। তিনি একটু পরে ঘরে এলেন। চূপচাপ বসে পড়লেন ইতিহাসে। আমার সঙ্গে কোন কথা বার্তা বললেন না দেখে, আমার হৃ-চোখ ভরে জল এল।

খানিক বসে থাকার পর উনি আমার সেই শুভ্রাতে তাঁর নিজের কথা যা শোনালেন। বলেন—শুয়ে পড় তুমি। আমি এখানেই শুয়ে রাত কাটাব। প্রথম কথা—তিনি পুরুষত্বহীন। দ্বিতীয় শরীরে না-কি অনেক রোগ। তাঁর মা খুব ছোটবেলায় মারা গেছেন। বাবা না-কি তার সম্পত্তির তিন ভাগ তাঁর নামেই উইল করে দিয়ে গেছেন। উপস্থিত যে মা-কে দেখলে সংমা। ওর দুটি ছেলে। বাকী একভাগ বাবা ওদের তিনজনের নামে দিয়ে গেছেন। সংমা জানে আমি আর বেশীদিন বাঁচবো না। আমার নিজস্ব কথা কেউ জানে না। শুধুমাত্র সংমা জানে। আমি বিষে করতে একেবারেই চাইনি। কিন্তু, আমাকে মেয়ে ফেলার ভয় দেখিয়ে ভোর করে বিষে দিয়েছে। লোকে যদি মনে করে, বড় ছেলের বিষে না দিয়ে ছোট ছেলের বিষে হোল। লোকের কাছে ও তোমার বাবা মায়ের সঙ্গে এমন মধুর ব্যবহার করেছেন। তাঁরা বাইরে থেকে ভালই ভেবেছেন। অতএব, আমি মরে গেলে সম্পত্তির অধিকারী হবে। আসল কথা আমার ওরা তিনজন ছাড়া সকলেই ভালবাসে। ছোট ভাইদের কেউই পছন্দ করে না। স্বামীর কাছে তাঁর বৃত্তান্ত শুনে সব ব্যাপারটা আমার কাছে পরিষ্কার কুটে ওঠে। আমি বলি—তাই বলে একটা মেয়ের জীবন এইভাবে ওরা নষ্ট করে দিল? তাকে কিছুই বললি না? কি লাভ? এখন যা হবার সবইতো হোল। পরে, সামনে আরো কি সাংঘাতিক দিন আসছে, তারই অপেক্ষা। বাবা মাকে, আমি কিছুই বলতে পারবো না। আমার যা ভাগ্য আছে তাতো হবেই। যাক সেই দিবাগমণে বসন্ত এল, আর এক বছরের মধ্যে যাযনি। মানে, শান্তি নিয়ে যাননি। শোনা যায় কুমার না-কি বেশ কিছুবার কলকাতায় চিকিৎসার জন্য এসেছিল কিন্তু বসন্তের সঙ্গে দেখা করেনি। বসন্তও মনে হয়, কুমারকে আর মনে রাখেনি। ভবুও জগদীশবাবু এতদিন অপেক্ষা করে, অনেক চিঠিপত্র দিয়েও কোন জবাব না পেয়ে, ওঁদের বংশের প্রথার বাইরে (মেয়েকে নিতে না এলে যাবেই না) মেয়েকে নিয়ে রাজস্থানে পৌঁছলেন বসন্তের খণ্ডরবাড়ী। আমিও বসন্তের মুখ চেয়ে সঙ্গে গেছিলাম। শুনলেন, কুমার তখন মরণাপন্ন। ডাক্তারের মতে, চিকিৎসার বাইরে। কলকাতার বড় হাসপাতালে, আজ ভোরে মারা গেছে। এবং এখনই তার মৃতদেহ নিয়ে এসে পৌঁছবে। প্রচুর লোক জমে আছে। জগদীশবাবু ও চিত্রাদেবী পাখর হয়ে গেছেন। ভাবেন, কুমারের এমন কি অসুখ হয়েছিল, যাতে সে মারা যেতে পারে? কিন্তু বসন্ত তো সবই জানে। সেইজন্য সে বাকশূন্য হয়ে গেছে।

তাকেই সবাই দোষী করছে, শান্তিীর প্ররোচনার। বলছে সবাই, এমন অলক্ষণে মেয়ে, খণ্ডরবাড়ীতে এসেই, স্বামীকে খেয়ে ফেললে। বসন্তের চোখে হুনিয়া তখন অন্ধকার দেখছে।

স্বামীর ঘর, অনেকদিন আগে থেকেই তার কাছে অর্থহীন হয়ে গিয়েছিল। বসন্তর, হৃৎ বেদনাযুক্ত মন, আমার বড়ই কষ্টে দিচ্ছিল। তখন তো, জানিনা, এর পরে, আরও কত সাংঘাতিক পরিস্থিতিতে পড়বো বা দেখবো। মৃতদেহ এসে, পৌঁছবার পর, শান্তি সম্বন্ধে প্রচার করলেন যা, আমিও বসন্তর মা-বাবা সবাই আতঙ্কিত হয়ে উঠলাম। অলক্ষণযুক্ত, যে মেয়ে, শান্তর ঘরে পা-রেখেই, তার স্বামীকে গ্রহচক্রের দ্বারা, স্বামীকে অসুস্থ করে মেয়ে ফেলে। সে মেয়ে নয় “ডাইনি”। অতএব, স্বামীর সঙ্গে, এ পৃথিবী ছেড়ে চলে যেতে হবে। সেই সঙ্গে, সবাই একবাক্যে সাব্ব দিল। বসন্তর, বাবা-মা জোর প্রতিবাদ করেন। কিন্তু, সে প্রতিবাদ টেকলো না। অবশ্য ওদের দিকে প্রচুর লোক। তাদের সপক্ষে সাব্ব দিচ্ছে। দেখি, বসন্তর মুখ ভয়ে সাদা হয়ে গেছে। দেখি সে, আস্তে আস্তে পেছন দিকে গিয়ে বসলো। তারপর, ওদের সহমরণের ব্যবস্থা তড়িঘড়ি চলতে লাগলো।

প্রচণ্ড গোলমাল, চাঁচামেচি। বহু বছর পর আবার সতীদাহ হবে। সোচ্চারে সবাই শুরু করে “সতিমাইকি জ্বর”। ওদের সোচ্চার শোনার পর, পেছন দিকে তাকিয়ে দেখি, বসন্ত সেখানে নেই। আমিও, সেখান থেকে, বেরিয়ে এসে, কোথাও তাকে খুঁজে পেলাম না। ভাবি, তাহলে কি সে জগদীশবাবুর বাড়ী চলে গেল? কিন্তু সে তো বেশ খানিকটা দূর। শেষে, একটা টাক্সি করে, ওদের বাড়ী এলাম। ঠিকই তাই! বেচারী, প্রাণের ভয়ে এসে লুকিয়ে আছে। দেখে মনে হয়, স্বাভাবিক অবস্থাতেও সে নেই তখন। আমি ভাবছি, সহমরণ থেকে, তাকে কি করে বাঁচান যায়। কিন্তু এরকম, পরিস্থিতিতে, চট্‌করে ভেবেও কিছু ঠিক করা যায় না। শেষে তাকে বুঝিয়ে, ওদের মালীর ঘরে নিয়ে যাই। মালীকে, বলে বুঝিয়ে, হুজনে লুকিয়ে থাকি। বেশ খানিকক্ষণ পরে, একটা গোলমালের শব্দ কানে আসে। মালীকে, সাবধান করে দিবেছিলাম, সে যেন না বলে। বসন্তকে, খুঁজতে আসছে। ক্রমশঃ এসে পৌঁছল। কিন্তু বিধির বিধান সে তো সঙ্গেই আছে। বসন্তদের বাড়ী, তোলপাড় করে খুঁজে, হুজনে এসে বাগানে খুঁজতে থাকে। মালীর ঘরের সামনে দাঁড়ায় মালীর বোঁ দাওয়ায়, রান্না করছে। তারা কিছু জিজ্ঞাসা করায়, ওরা জানায়—না সে রকম কেউ আসেনি। তবুও তারা ছাড়েনা। ঘরে ঢুকতে চায়। তখন আমি বেরিয়ে আসি। আমার দেখে একজন চলে যাচ্ছে অন্যজনকেও যেতে বলে। কিন্তু, সে ঘরের মধ্যে উকি দিয়ে কিছু দেখে আন্দাজ পায়। আমি ভয়ে ঘরের ভেতর চাইনি। কারণ, তাহলেই বুঝতে পারবে। কিন্তু, দ্বিতীয় লোকটি, বসন্তর লাল ঘাগরার সামান্য অংশ। (পরে বুঝলাম) সে, ইসারা করে, আরেকজনকে, আসতে বোলে, জোর করে মালীর ঘরে ঢুকে পড়ে। তাকে, বাজের পেছনে লুকিয়ে রেখেছিলাম। কিন্তু হায়, বসন্তর জরি দেওয়া, লাল ঘাগরা বাজের বাইরে প্রমাণ রেখেছে।

শেষে, তাকে হুজনে, জোর করে ধরে বার করে, হৈ ছল্লা করে নিয়ে চলে গেল। বাধা দিলাম, কিন্তু ওদের কাছে আমার শক্তি কতটুকু! আমার ফেলে দেয় মাটিতে মাঝালীর কাছে

যখন পাঁঠাবলি হয়। মরণের সময় তার গলার স্বর যেমন বিকৃত হয়। তেমনি, ইঁা, বসন্তরও, সেই বিকৃত স্বর, তার বাঁচার জন্য, আঁর্-চিংকার, আমার প্রাণটা হাহাকার করে ওঠে। আমিও টাঙ্গায় চড়ে ছুটলাম। কিন্তু গিয়ে দেখি, বসন্তকে, তার স্বামীর চিতায় ফেলে দেয়া হয়ে গেছে। তার বাবা-মা হুজনেই অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছেন। সারা আকাশটা যেন বসন্তর লাল জ্বর দেয়া ঘাগ্রা। যেন দেখতে পাই, বসন্ত তার স্বামীর হাত ধরে আস্তে আস্তে চলে যাচ্ছে। আমি চিংকার করে ওঠায়, বসন্তর মা-বাবার জ্ঞান ফেরে। ওঁবা, তাঁদের আদরের মেয়েকে খুঁজছেন, এদিকে-ওদিকে! কিন্তু, তার পরিবর্তে সামনে স্থলছে, জলন্ত চিতার লেলিহান লাল শিখা। তার সঙ্গে, চটপট্ আওয়াজ। লাল ঘাগ্রাটা, পুড়ে কালো হয়ে গেছে। কালো ধোঁয়ার বেশ। আর তার সঙ্গে সতীমায়ের জঙ্ঘনি। হঠাৎ, সেই আওয়াজে, ওঁদের চেতনা ফিরে আসে। ভাঙাগলার চিংকার করে ওঠেন—বসন্ত.....বসন্তকুমাবী। বারবার, বহুবার ওই নামে ডাকা সত্ত্বেও, বসন্তর সাজা পাওয়া গেলনা। হুজনে, ছুটে গিয়ে চিতার পাশে কঁদে লুটিয়ে পড়েন। তঁতনে, মাথা খোঁড়েন। বুক চাপড়ে হাহাকার করেন। কিন্তু সবই বৃথা, সবশেষ। শুধু বসন্তর জ্বর দেয়া লাল ঘাগরার কিছু অংশ আধপোড়া হয়েও চিতার পাশে পড়ে, জ্বরগুলো চিক্‌চিক্‌ করছে।

প্রাচীন ভারতের পটভূমিকায় লেখা

চিত্রিতা দেবীর

অসাধারণ রোম্যান্টিক উপন্যাস একটি সুন্দর মুহূর্ত

রবীন্দ্র সাহিত্যে বুদ্ধ চেতনা

চিত্রিতা দেবী

রবীন্দ্রনাথ বুদ্ধ ধর্ম সম্বন্ধে কি বলেছিলেন, বুদ্ধ সাহিত্য তাঁকে কি প্রেরণা দিয়েছিল। প্রৌঢ় বয়সে তিনি এশিয়ার পূর্বপ্রান্তে বুদ্ধধর্ম প্রভাবিত দেশে মৈত্রী ও সংস্কৃতির বাণী প্রচার করেছিলেন।

প্রকাশক—সাহিত্যিকা, ১৬১/২/১, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-১৯

আভা / শারদীয়া সংখ্যা—১৯৭

যত্র নার্যন্তু পূজ্যন্তু

(প্রবন্ধ)

কৌশিক ভট্টাচার্য্য (গোপালপুর)

‘যত্র নার্যন্তু পূজ্যন্তু রমন্তু তত্র দেবতাঃ।’ —মনু ।
নারী যেখানে পূজা পান সেখানেই দেবতারা এসে হন ।

কফি হাউস থেকে বিশ্ববিদ্যালয় চত্বর—সর্বত্রই এখন আলোচনার বিষয় নারীবাদ বা নারীমুক্তি । মেয়েরা তাঁদের দাবি এবং অধিকার নিয়ে অনেক বেশি মুখর হয়ে উঠছেন । পাশ্চাত্যের সঙ্গে ভাল মিলিয়ে আমাদের দেশেও নারীমুক্তি আন্দোলনের সূচনা হয়েছে । গড়ে উঠেছে বিভিন্ন প্রগতিশীল সংগঠন । একথা অনস্বীকার্য যে পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার যুগ যুগ ধরে নারী হয়েছে বঞ্চনার শিকার । বিংশ শতাব্দী পার হয়ে আমরা একবিংশ শতাব্দীর দ্বারে । অথচ নারী নির্যাতন নামক হুরারোগ্য এই ক্যানসার রোগটি আমাদের ক্ষতিমুক্ত সমাজ জীবনকে আঁটেপুটে বেঁধে রেখেছে । বৈদিক যুগে মৈত্রেয়ী, ঘনা, লীলাবতী, অপালা, অরুন্ধতী প্রমুখ নারীরা সম্মান ও প্রতিষ্ঠার প্রেক্ষায় ভারতবর্ষের গৌরবময় নারী । বৌদ্ধযুগেও সজ্জমিতা, সূজাতা, আত্মপালী, সুপ্রিয়াদের ভারতীয় সমাজ যথাযোগ্য মর্যাদা দিয়েছে । তুর্কি আক্রমণের পর থেকেই নারীর সম্মান ক্ষুণ্ণ হ’তে হ’তে ব্রাহ্মণ্য প্রভাবে নারীরা হলেন চরম উপেক্ষিতা । ভোগাবস্ত । বাজারের পণ্য । ঊনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণের আলোকে কৌলীশপ্রথা, বালাবিবাহ, সতীদাহ প্রভৃতির নাগপাশ থেকে মেয়েরা মুক্তি পেলেও নারীসমাজ আজও লাক্ষিত, অপমানিত এবং সর্বোপরি বাজারের পণ্য হিসাবে চিহ্নিত । রবীন্দ্রনাথের ‘দেনাপাওনা’ গল্পের নিক্রপমার থেকেও ঐযুগের নিক্রপমাদের অধিক দৈহিক ও মানসিক অত্যাচারের শিকার হতে হয় । ‘নিক্রপমা’র প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর : ‘আমার কি কোনো মর্যাদা নেই ? আমি কি একটি টাকার খলি যে যতক্ষণ টাকা আছে ততক্ষণই দাম । না বাবা ! তুমি টাকা দিয়ে আমার অপমান করো না ।’ —এ যুগের নারীদের মুখে শোনা যায় না বললেই চলে ।

ভারতের সনাতনী শিক্ষাদীক্ষা ও মূল্যবোধ ছাড়াও আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষার শিক্ষিত হয়েছি আমরা । আমাদের সমাজে শিক্ষা ও কর্মসংস্থানের অধিকার আজ আর কেবল ছেলেদেরই নয় বরং তা স্বীকৃত হয়েছে ছেলেমেয়ে নির্বিশেষে সকলের জন্যই । ‘নারীর স্থান কেবল অন্দরে’—এ কথা

মানতে আমরা নারী। কারণ নারী স্বাধীনতা বা নারীমুক্তি আন্দোলনের মতো বেশ কিছু নতুন শব্দ সমৃদ্ধ করেছে আমাদের শব্দ ভাণ্ডারকে। তবে এত কিছুর পরেও আজ নারী ও পুরুষ সমান নয় কেন? কেনই বা নারীপ্রগতির পথে এত প্রতিবন্ধকতা?

নারীসমস্যা, নারীমুক্তি, নারীর বন্ধন কোথায়, কিভাবে—তার আলোচনা নানা দৃষ্টিকোণ থেকে করা হয়। ভিন্ন ভিন্ন পরিস্থিতিতে নারী ভিন্ন ভিন্ন সমস্যায় জর্জরিত। কিন্তু আমাদের দেশে সামগ্রিক দৃষ্টিতে নারীর সমস্যা মোটামুটি একই ধরনের। এখনও পর্যন্ত আমাদের দেশে নারীরা পুরুষের সমান অধিকার বা মর্যাদা পায় না। খুবই পরিভাপের বিষয়, সামাজিক বিধি নিষেধ এবং পুরুষতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠার স্বার্থে নারীর স্থান এবং সম্মান রাষ্ট্রে দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকের মতো। নারীর এই অবমাননাই ভারতের সামগ্রিক উন্নয়নের পথে প্রধান বাধা। স্বামী বিবেকানন্দ বারে বারে আমাদের সচেতন করে দিয়েছেন এই বিষয়ে। ‘শক্তি বিনা জগতের উদ্ধার হইবে না। আমাদের দেশ সকলের অধম কেন, শক্তিহীন কেন? শক্তির অবমাননা সেইখানে বলিষ্ঠা।’

(বাণী ও রচনা—৫ম খণ্ড)

তিনি বলেছেন—‘মেয়েদের পূজা করেই সব জাত বড় হয়েছে। যে দেশে যে জাতে মেয়েদের পূজা নেই, সেই দেশ—সে জাত কখনও বড় হতে পারে নি, কখনকালে পারবেও না। তাদের জাতের যে এত অধঃপতন ঘটেছে, তার প্রধান কারণ এইসব শক্তিমূর্তির অবমাননা করা।’ (বাণী ও রচনা—৯ম খণ্ড) স্বামীজীর এই সর্তকবাণী সত্ত্বেও আমরা এখনও পর্যন্ত যথেষ্ট সচেতন নই। আমাদের সমাজে মেয়েরা এখনও পণপ্রচার বলি। বধূহত্যা, নারীনির্ধাতনের খবর প্রতিদিনের সংবাদপত্রের পাতায় পাতায়।

মায়ের দেহ-মন নির্ধাসে তৈরী সন্তান মায়ের অপত্য-স্নেহ এবং পরিচর্যা একটু একটু করে বড় হয়। অথচ স্কুলে ভর্তির সময় ডাক পড়ে বাবার। সন্তানের সাফল্যের প্রতিটি স্বীকৃতি পাত্রে পিতার নাম। মা সেখানে অচ্ছাৎ। পিতৃ-পুরুষের উদ্দেশে তর্পণ করার অধিকার নেই মেয়েদের। আমাদের সৃষ্ট পতিতালয়ের মায়ের সন্তান সমাজ এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে অবজ্ঞা এবং কট্টকির শিকার। কারণ, তারা পিতৃ-পরিচয়হীন। অথচ ঘরে বাইরে সভা সমাবেশে ঘনিত হয় ‘জননী জন্মভূমিষ্ঠ স্বর্গাদপি গরীমসী’।

কিছুদিন আগে কলকাতায় তনৈক শঙ্করাচার্য ‘নারীদের বেদ পাঠে অধিকার নেই’—এই বিধান দিয়ে বিতর্কের সৃষ্টি করেন। এ বিষয়ে স্বামী বিবেকানন্দ কিন্তু সম্পূর্ণ ভিন্নমত পোষণ করতেন। তিনি বলেছেন—‘কোন শাস্ত্রে এইরূপ উক্তি দেখিযাছ যে নারীর জ্ঞান বা ভক্তিসাথে অধিকার নাই? অবনতির যুগে যখন পুরোহিতেরা ব্রাহ্মণের বর্ণকে বেদপাঠে অনধিকারী বলিষ্ঠা নির্দেশ দিলেন, সেই সময়ে তাঁহারা জীলোকদিগকে সর্বপ্রকার অধিকার হইতে বঞ্চিত করিলেন।...

বৈদিক ও উপনিষদের যুগে দেখিতে পাওয়া যায় মৈত্রেয়ী, গার্গী প্রভৃতি পুণ্যশ্লোক মহিলা ব্রহ্মবিষয়ক বিচারে পারদর্শিতা দেখাইয়া ঋষির স্থান অধিকার করিয়াছেন। সহস্র বৈদবিশারদ ব্রাহ্মণের সভায় দেখিতে পাই, গার্গী, যাজ্ঞবল্ক্য ঋষির সহিত নির্ভয়ে তর্কযুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়াছেন।

(ভারতকল্যাণ—স্বামী বিবেকানন্দ)

সাম্প্রতিককালের নারীর অবস্থার কথা যত কম বলা যায় তত ভাল। কেননা পাঠক-পাঠিকার চাক্ষুস অভিজ্ঞতার নিত্যনৈমিত্ত ঘটে যাওয়া দৃশ্যের স্মৃতি অনেক বেশি জীবন্ত। তাই এবার আসা যাক এই সমস্যাগুলোর সম্ভাব্য সমাধানের আলোচনায়। সর্বপ্রথমে বলা যায়, নারী মুক্তি আন্দোলন শুধুমাত্র মেয়েদের আন্দোলন নয়, পুরুষদেরও আন্দোলন। কিন্তু এক্ষেত্রে পুরুষদের ভূমিকা কেমন হওয়া উচিত এ প্রশ্ন স্বাভাবিকভাবেই মনে জাগে। পুরুষের অনুগ্রহ নয়, প্রয়োজন সহযোগিতার। আজ অনুগ্রহ পরিত্যাগের দিন এসেছে। মনে পড়ে রবীন্দ্রনাথের একটি কথা—
“... ... পরের ভাবনা ভাবা তখনই সত্য হয়, পর যখন আমাদের কাছে ভাবাইয়া তোলে, অনুগ্রহ করিয়া ভাবিতে গেলে কথায় কথায় অন্তর্মুগ হইতে হয় এবং ভাবনাটা নিজের দিকেই বেশি করিয়া যোঁকে।” নারীর সর্বাঙ্গে প্রয়োজন আধুনিক মননশীলতার বিজ্ঞান মনস্ত চিন্তাধারার শিক্ষিত হইবে ওঠা। বর্তমানে প্রাথমিক স্তরে নারীদের অভাব অভিযোগের ভাষা দেবার জন্য কিছু প্রগতিশীল পুরুষের উপর নির্ভর করা অমুচিত হবে না। পাশ্চাত্যে যার ব্যতিক্রম হয়নি।

আমাদের দেশে বেশিরভাগ অশিক্ষিত অর্ধ-শিক্ষিত নারীদের কাছে যে স্বাধীনতার কথা বলা হচ্ছে সেই স্বাধীনতা ভোগ করার জন্য শিক্ষার, সংঘের এবং মানসিক সমৃদ্ধির দরকার। তা না হলে স্বাধীনতা স্বচ্ছাচারিতার পর্যায়ে চলে যাবে, চলে যাচ্ছেও। আজ যারা মাগি-বাঁগি পরে, সাজপোষাকে উদার মনস্ততার পরিচয় দিয়ে নারীমুক্তির হোতা বলে ভাবেন, তাঁদের সামাজিক তথা পারিবারিক অবস্থানটা একবার ভেবে দেখুন। পুলিশের পোষাক কোন চোর পরলে বাহ্যিকভাবে তাকে পুলিশ আখ্যা দেওয়া গেলেও, তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বা কার্যকারণে নয়, তেমনি আধুনিক পোষাক পরলে বাহ্যিক দৃষ্টিতে তাঁরা আধুনিক হলেও মানসিক ভাবে তাঁরা আদিমতন্ত্রেরই বাহক। কেননা, এঁরাই লেডিস্ সীটে বসার জন্য বুদ্ধকে ভুলে দিতে দিখা করেন না।

নারীমুক্তি আন্দোলনের অগ্রগতির সাথে সাথে অনেক ক্ষেত্রেই নারীবাদ পুরুষ বিদ্বেষে পরিণত হচ্ছে। ইদানীং তনৈক নারীবাদী (অবশ্য পুরুষ বিদ্বেষী) বলছেন, পুরুষরা যদি চারটে বিয়ে করতে পারে, মেয়েরা কেন পারবে না? আমার মতে, আমরা তো মানুষ, কুকুর নয়। কুকুর যদি আমাকে কামড়ায়, আমি তাকে কামড়াব না কি? এক্ষেত্রে অধিকার সমান রাখতে পুরুষেরও যেমন চারটে বিয়ে নিষিদ্ধ হওয়া উচিত, মেয়েদেরও তাই।

নারী পুরুষ একে অপরের পরিপূরক। পুরুষ অথবা নারী জীবনের রহস্য, প্রেম, বিরহ কিছুই বুঝত না হুজুন হুজুনকে ছাড়া। পুরুষের প্রেম যদি বন্ধনার আদলে মোড়া হয় তবে, প্রশ্ন করি

শাহজাহানের প্রেমের অমর সৃষ্টি কি ? একটা নিছক সৃষ্টি ? এই স্মৃতিসৌধের কি কোন মূল্য নেই ?

কোনও বিশেষ পুরুষের প্রতি নয়, জেহাদটা হওয়া উচিত পুরুষতান্ত্রিকতার বিরুদ্ধে। তবে একটা কথা মনে নিতে হয়, মেয়েরা পুরুষদের কাছ থেকে যুগ যুগ ধরে খারাপ ব্যবহার পেতে পেতে একটা প্রতিহিংসার মনোভাবও তৈরী হয়েছে। কিন্তু সব পুরুষ সমান নয়। সমগ্র পুরুষ জাতটাকে শত্রু ভেবে আন্দোলন করা ঠিক হবে না। এই পুরুষদের অনেকেই যে নারীকে যথাযোগ্য মর্যাদা দিয়েছেন তার দৃষ্টান্ত বিরল নয়। সতীদাহ প্রথা উচ্ছেদে রামমোহনের অবদান, বিধবা বিবাহে বিজ্ঞাসাগরের ভূমিকা আজ সর্বজনবিদিত। শ্রীধামকৃষ্ণদেবের শ্রীশুক গ্রন্থ, নারীভাব সাধন মাতৃভাব প্রচার নারীর প্রতি যথাযোগ্য মর্যাদার প্রতীক।

আর্থিক স্বনির্ভরতাই নারীমুক্তির প্রথম পদক্ষেপ এ যুক্তি অনেকে মেনে নেন। মহিলাদের উন্নয়ন হচ্ছে—তাঁদের স্বাবলম্বন। শুধু এক একজন বিচ্ছিন্নভাবে নয়। সামগ্রিকভাবে সমাজকে স্বাবলম্বী হতে হবে। মহিলারা যদি পাবলম্বী না হয় তাহলে সমাজের সত্যিকারের উন্নয়ন হচ্ছে বলা যাবে না। কিন্তু একটা প্রশ্ন এখানে তোলাই যেতে পারে—আর্থিক স্বনির্ভর ক'টি নারীর মুক্তি ঘটেছে ? একজন চাকুরীজীবী মেয়ে তাঁর শ্রমলব্ধ অর্থ ব্যয় করার ক্ষেত্রে কতটুকু স্বাধীনতা পান ?

তাই বলা যেতে পারে, নারীমুক্তি ব্যাপারটি অনেকটাই মানসিক। আর্থিক স্বনির্ভর নন, অথচ যথেষ্ট স্বাধীনচেতা, আত্মমর্যাদা সম্পন্ন মহিলার সংখ্যা কম হলেও আছে। নারীমুক্তি বিষয়টি তাঁদের কাছে পরিষ্কার, চাকুরিরতা অধিকাংশ মেয়েই 'নিজের পায়ে' দাঁড়ালেও নিজেদের দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক মনে করেন। এখানেই আসল সমস্যাটা লুকিয়ে রয়েছে। মেয়েরা 'নিজের পায়ে' দাঁড়িয়ে—এই বাক্যটি প্রয়োগ করার মতো সময় সম্ভবত এখনও আসেনি। আর্থিক স্বনির্ভর হলেও তাকে দাঁড়াতে হয় পরের পায়ে। শুধু আর্থিক ক্ষেত্রেই নয়—জীবনের সর্বক্ষেত্রেই নারীকে দাঁড়াতে হয় অন্যের পায়ে। বাল্যে পিতার, যৌবনে স্বামীর, বার্ষিক্যে পুত্রের, যে অবস্থায় তাকে রাখা হয়, তাতে পরমতুষ্ট থাকাই একজন নারীর বেঁচে থাকার মূল শর্ত। সমাজের কাছে, পরিবারের কাছে। কাজেই নারীর আর্থিক স্বনির্ভরতা যেমন প্রয়োজন—তেমনিই প্রয়োজন তার চিন্তার স্বাধীনতা। আর পুরুষদেরও নারীকে সেবাদাসী ভাবার মানসিকতা অবশ্যই ত্যাগ করতে হবে। তাহলেই অর্ধেক সমস্যার সমাধান।

সবচেয়ে বড় কথা, চিন্তার জগতে মুক্তির বড় প্রয়োজন আজ নারীর। সেই মুক্তির কাজ একদিনের নয়। কারণ,—সংস্কার আর চিরচরিত কিছু বিশ্বাসের অক্টোপাস ; অদ্ভুত এক আত্মতৃপ্তি জড়তা। সর্বোপরি ভয়ের পরিমণ্ডলে আজন্ম বেড়ে ওঠা অস্তিত্ব-যুক্তির আলো সেখানে পৌঁছে দেওয়া আশ্বাস সাপেক্ষ। তবে তা অসম্ভব নয়।

সর্বোপরি, একটা কথাই বলা যায় মেয়েদের জীবনে সমস্যা ছিল, আছে, ভবিষ্যতেও হয়তো

থাকবে। প্রকৃতি সমস্তা অতিক্রমের। তারকাত্ত চাই মনের জোর, চাই পারিপার্শ্বিক অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির। সেজন্য শুধু মেয়েরাই নয়, নারী পুরুষ উভয়কেই হাতে হাত ধরে এগোতে হবে। তাই 'নারী পুরুষের লালসার শিকার' এরকম একটা প্রোগ্রাম যেন অল্প বিধানে পর্যবেক্ষিত না হয়। আমাদের শিকারী যেন স্বাধীন মানুষ হিসাবে বড় হয়ে উঠতে শেখে—শুধু নারী বা পুরুষ হিসাবে নয়। যে শিকারীটি ছোটবেলা থেকেই প্রোগ্রামটি শুনে—বড় হয়ে সে হবে হীনমস্ততার শিকার। নরত ঘৃণা করে লড়তে শিখবে। পুরুষদের বিরুদ্ধে তৈরী হবে একটা নতুন শ্রেণী বিভেদ। একটা সমস্তা নিরসনের চেষ্টায় নতুন সমস্তার উদ্ভব হবে। তাই বিষয় নয়—চাই আন্তরিকতা ও শ্রদ্ধা, প্রতিযোগিতা নয় চাই সহযোগিতা। নারী নয়, পুরুষ নয়—শুধুই মানুষ।

সবশেষে কবি নজরুলের সঙ্গে গলা মিলিয়ে গেরে যাই—

“সাম্যে গান গাই
আমার চক্ষে পুরুষ রমণী
কোন ভেদাভেদ নাই।”

প্রখ্যাত সাহিত্যিক বেদুইন-এর

কাল্পনিক বই

পথে প্রান্তরে (সম্পূর্ণ) — ৩৫ টাকা	প্রকাশক	সাহিত্য প্রকাশ
অপরাধ অপরাধী—৩৫ টাকা	"	" "
অন্তঃকিম—৩৫ টাকা	"	" "
সমকালীন ভারতবর্ষ ও পুস্তকচন্দ্র—২৫ টাকা	"	নাথ পাবলিশিং
তৃতীয় পক্ষ বনাম চতুর্থ পক্ষ—১২ টাকা	"	অনিমা প্রকাশনী
সম্মান যুগে যুগে—৩০ টাকা	"	পত্রপুট

LIFE AND DEATH

A. K. SEN

Life and death
are but twin brother,
Born out of same Mother
And at same moment
And follows each other
Till the death
Overtakes the life.

SMILE

A. K. SEN

Smile, smile & smile
For a while
For those who
Likes to see you smile.

Life is short,
Today will be yesterday
When new today will come,
Smile, smile & smile.

For those who are present
Some of them
May for ever be absent
When new tomorrow will come,
Smile, smile & smile.

পদধ্বনী

এ. কে. সেন

জীবনের শেষ প্রান্তে ক্লান্ত শ্রান্ত চরণ যুগল
পথ চলার কন্টকে কন্টকে
কৃত্ত বিকৃত
শেষ যেথা ধরিবার তরে
চলেছি পশ্চিমে
শ্লথ গতি, দুর্বল দেহখানি
টানিতে টানিতে
সেই সময়ে চেয়ে দেখি
পশ্চিম দিগন্তে
রক্তিম রক্তরাগে ভরা
কে যেন দিরাছে ছড়ায়ে
মুঠো মুঠো
ফাগুনের ফাগ

মনে হলো
কে যেন বলিছে ডাকি
“ওরে আর আর
কোন নাহি ভয়
দিগন্তের অন্তরালে
রয়েছে দাঁড়ায়ে
এক নুতন জগৎ
অজানা অচেনা এক
রোমাঞ্চকর ভবিষ্যৎ”

পিছন হ’তে
কে যেন ডাকি কর

“ওরে কোথা যাস্ তুই
হয়নি তো সময়
এখনও আছে কিছু বাকি
হৃৎয যন্ত্রণা কামা হাসি মুখ
কতই না পেরেছিস এখানে
ওজন করে দেখ
কামা হৃৎয বোঝার ভার
আর হাসি আনন্দ
সমতুল, মানদণ্ড সমান্তরাল—
এর চেয়ে আর বেশী কী আছে
ওপারের মানদণ্ডে !”

মনে হল
তাই তো ! এই পরিচিত স্মরণ
ভুবন ছেড়ে
অঙ্ককারে দিতে হবে ঝাঁপ
এই নিরম শৃংখলার
নাহি কোন ভেদাভেদ
যেতে হবে—
স্থান কাল পাত্র সবই অজানা
যাবো কোথায়
সেটাও অজানা ।

তোমার কাছে মোর
নাই তো কিছু গোপন
সবই জান তুমি
সবই তুমি দেখছ স্বচক্ষে ।
কিন্তু আমি জানিনা তো
কিছুই তোমার ।
কে তুমি ! কোথা হতে এলে ?
কেন এলে—

সবই নীরব উত্তর ।
তবুও নিত্য সর্বদা
দেখিতে পাই তোমার
নীরবে দাঁড়িয়ে আছ
মোর প্রতিফলনের প্রতি কার্যের
সাক্ষী হয়ে ।

হে কাল,
বল কোথায় উৎস তোমার
কী কারণ হেতু তুমি
মোর করিছ নীরকণ ?
হে কাল !
তুমি আর আমি
বাঁধা অচ্ছেদ্য বন্ধনে
জন্ম হতে মৃত্যু অবধি
তুমি আছ মোর কাছে
তার পর—
নাহি তব কোন অস্তিত্ব
নাহি কোন প্রয়োজন
ভাঙে ছুঁকার বোঝার মত
থাকিও না মোর স্ফুট
দাও মোরে স্বাধীনতা
ঘন্টা পল—বিপলের বহু উর্দ্ধে
যেখান মহাকালের
নাই কোন স্থান ।

থিয়েটার

তপতী দেবী

অলকেশ নিজের কানকেই যেন বিশ্বাস করে উঠতে পারল না।

বড় জোর বহর খানেক। তার বেশী নয়। শক্ত অশ্বখে পড়ে বাইরে চলে যেতে হয়েছিল। নিজের যা কিছু সম্বল ছিল সব খুইয়েছে। থিয়েটারের মালিকের হাতে পায়ে ধরে সামান্য আগাম, তারও বিশেষ কিছু অবশিষ্ট নেই। এছাড়া আর উপায়ও ছিল না। নিজে দাঁড়ালে তবে তো আর সব।

অবশ্য সংসার আঁকড়ে ধরার মতন ওই একটি মেয়ে। বুকে ক'রে অলকেশ তাকে মানুষ করেছে। নিজে এ পথে নেমেছে কিন্তু মেয়ের গায়ে এসবের সামান্য আঁচটুকুও লাগতে দেখে নি।

অলকেশের ছব সম্পর্কের এক বোনই—সংসার দেখাশোনা করে।

প্রথম প্রথম ছ' একদিন হঠাৎ বাড়ী ফিরে অলকেশ দেখেছে মেয়ে রঙীন শাড়ী জড়িয়ে, মাথায় পাগড়ী এঁটে, হুগালে পাউডার মেখে হাত মুখ নেড়ে যা খুসী বলে যাচ্ছে।

অলকেশ অবাক, এ কিরে রীণা? রীণা হেসেছে, আমি তোমার মতন রাজা সেজেছি বাবা। আমার মতন রাজা? অলকেশ শিউরে উঠেছে। ছুটে গিয়ে মেয়েকে কোলে তুলে নিয়ে গায়ে মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে বলেছে, দরকার নেই মা, আমার মতন রাজা সেজে দরকার নেই।

সত্যিই তাই। শুধু রাজার খোলসটা জড়ালে কি আর রাজত্ব পাওয়া যায়, না রাংতা মোড়া সিংহাসনে বসলে ধরণীর অধীশ্বর হওয়া যায়? পাঁচশো টাকা মাইনের সম্রাট তাও সব মাসে ঠিক সময় এই কটা টাকাও হাতে আসে না, অনেক ঝামেলা। গড়গড়ার নল চুষতে চুষতে মালিক আক্রেপ করেছে, অলকেশ, দিনকাল বড্ড খারাপ যাচ্ছে। বিক্রী একেবারেই নেই, সে তো নিজের চোখেই দেখতে পাচ্ছে। এ মাসে সব টাকাটা দিতে পারব না, কিছু নাও, বুঝলে?

অলকেশ নির্বিবাদে ঘাড় নেড়েছে। তারপর সারাটা মাস সংগ্রাম করেছে, মুদী, গয়লা আর বাড়ীওয়ালার সঙ্গে।

এ থিয়েটারে অলকেশ আছে ত্রিশ বছরেরও ওপর। আঠারো উনিশ বছর বয়সে তামাক সাজার কাজে বহাল হয়েছিল, ইদানীং রাজা উজীর সাজছে। এক সময়ে অলকেশের নামডাকও খুব ছিল। ওর টানে হল উপচে পড়ত লোকে। হাততালির আওয়াজে কান পাতা যেত না। মাঝে মাঝে ফুলের মালাও গলায় জুটত, অবস্থা একটু ঘুরছিল, এমন সময় বিপদ।

বিক্রমজিৎ ভলোয়ার ঘোরাতে ঘোরাতে হঠাৎ ছমড়ি খেয়ে পড়ল স্টেজের ওপর। হৈ চৈ কাণ্ড। ড্রপ পড়ল, সবাই ছুটে এসে অলকেশকে তুলে ধরল।

ডাক্তার বললেন, অত্যধিক পরিশ্রম। কিন্তু অলকেশ বুঝল, আগের দেনা শোধ করে যে তলানিটুকু হাতে থাকে তাতে তিনজন মানুষের গ্রাসাচ্ছাদন চলে না। একজনকে উপোস করতে হয়। পরিশ্রম নয়, অর্ধাহার। সেই সময় অলকেশ বাইরে গেল। বাইরে মানে রাঁচী, কাশিয়াং নয়, নিজের পৈতৃক ভিটে বর্ধমান। ফলে ম্যালেরিয়া বেশ মোক্ষম ভাবেই চেপে ধরল। বছর খানেকের আগে অলকেশ ছাড়া পেল না।

এই এক বছরের মধ্যে থিয়েটার অনেক পালটেছে। মালিকানা হাত বদল করেছে। উঠতি একদল নতুন ধরনের বই খুলে বসেছে। পুরনো মালিকের বহু সুপারিশে অলকেশ স্থান পেল।

সপ্তাহের মাঝখানে পুরনো বইয়ের অভিনয় হল। বিক্রমজিৎ‌র ভূমিকায় অলকেশ। শরীর এখনও দুর্বল। বেশীক্ষণ দাঁড়ালে পা দুটো খরখর কাঁপে। গলার আওয়াজেও আগের বলিষ্ঠতা নেই।

যেখানে প্রজাদের জন্য বিক্রমজিৎ‌র রাজকোষ উন্মুক্ত করে দেন, সেখানে সারা হল যেন মেতে ওঠে। অপূর্ব ভঙ্গীতে রাজকোষের দ্বার উন্মুক্ত করতে করতে জলদগন্তীর কণ্ঠে বিক্রমজিৎ‌র প্রজাদের এগিয়ে আসতে আহ্বান জানান, নিজে সরে দাঁড়ান মঞ্চের একপাশে। আশ্চর্য, এবারেও সেই এক ভঙ্গী, গলার স্বর অবশ্য তত চড়া করতে পারল না অলকেশ, কিন্তু সারা হল হাত তালির আওয়াজ দূরে থাক, বরং তার অক্ষম কণ্ঠের অনুকরণে হুঁ একজন ব্যঙ্গ করে উঠল। মাথা নিচু করে অলকেশ উইংসের আড়ালে আব্রুগোপন করল।

বাড়ী ফিরেও নিস্তার নেই। রীণা বাইরের ঘরে বসেছিল, বাবাকে ফিরতে দেখে বলল, এত দেরী হল বাবা?

এত দেরী হওয়ার কোন কারণ নেই। তৃতীয় অঙ্কেই বিক্রমজিৎ‌র পার্ট শেষ; কিন্তু থিয়েটার থেকে অলকেশ সোজা বাড়ী আসেনি। গলার ধারে গিয়ে বসেছিল মাথার হাত দিয়ে। কেন এমন হল, থিয়েটারের মালিক বদলেছে, দলও বদলেছে, কিন্তু দর্শকরা তো বদলায়নি। তবে কেন, এমন হল?

দর্শকরা বদলায়নি, তাদের রুচি-হয়তো বদলেছে। আগের দিন যাতে হাততালি পাওয়া যেত, আজ তাতে টিটকিরি ছাড়া আর কিছু মেলে না। দিনকাল হঠাৎ এমন বদলে গেল! মাত্র এক বছরে!

দিন দুয়েক পর আবার রীণাই কথাটা বলল মৃণালদা এসছিলেন বাবা।

থিয়েটার ছিল না, অলকেশ একটু বেড়াতে বেরিয়েছিল, চৌকাঠে পা দিয়ে মেয়ের কথাতো চমকে উঠল। মৃণালদা, মৃণালদা কে?

—বারে, মৃণালদাকে চেনো না। নতুন মালিকের ছেলে। তিনিই তো থিয়েটারের সব দেখাশোনা করেন।

ও, তাই বুঝি। নতুন মালিকের সঙ্গে এখনও চেনা জানা হয়নি। শুধু ম্যানেজার হিমাংগু বাবুর সঙ্গে পরিচয় হয়েছে।

কিন্তু মৃণালদা! রীণার সঙ্গে এতটা আত্মীয়তা হ'ল কেমন করে। কিংবা হয়তো ভয়ভীতি করেই এভাবে বলছে রীণা। বয়োজ্যেষ্ঠের সম্মান।

—কি জ্ঞাত এসেছিলেন মৃণালবাবু?

কাল বেলা দশটার মধ্যে তোমাকে একবার দেখা করতে বলেছেন। কি বৃষ্টি নতুন বইয়ের বিহাসাল শুরু হবে।

নতুন বই হবে, একথা অলকেশ শুনছিল, তবে একেবারে কাল থেকেই বিহাসাল শুরু।

মাথা নেড়ে চলে যেতে গিয়েই অলকেশ থমকে দাঁড়াল। রীণা আবার কথা বলছে—সেদিন নাকি তোমার পার্ট ভাল হয়নি বাবা? মাঝে মাঝে তোমার গলা খুব চিরে যাচ্ছিল, আর—

—আর? অলকেশ ফিরে দাঁড়াল।

—আর খুব ছোট্টাছুটি করছিলে স্টেজের ওপর।

খুব আস্তে, খুব অস্পষ্টে গলায় অলকেশ তিক্তাসা করল, এসব কথা কি মৃণালবাবু বললেন?

বাপের মুখ চোখের চেহারা দেখে রীণা একই অপ্রস্তুত হয়ে গেল। কৃষ্টিভাবে মাথা নেড়ে বলল, না ঠিক মৃণালবাবু বলেন নি। সামনের বাড়ীর বেবারা গিয়েছিল, ওরাই বলছিল।

শুধু নতুন বই নয়, নতুন দরদস্তুরও শুরু হল। মৃণালবাবু স্পষ্টই বললেন পুরানো মাইনেতে রাখা সম্ভব হবে না। অভিনয়ের ধারা বদলে গেছে। যাত্রার ঢং এর প্রাকটিং আজকাল কেউ পছন্দ করে না। হু হাঁটুর ওপর মাথাটা রেখে অলকেশ অনেকক্ষণ শুনল। ইতিমধ্যে এদিক ওদিক হু এক জায়গায় খোঁজখবর নিয়েছে। থিয়েটার প্রায় সবই খতম। হু একটা যা আছে, তাদেরও স্তিমিত অবস্থা। সেখানে বিশেষ সুবিধা হবে না। সবাইয়ের যৌক পর্দার আর্টিষ্টদের ওপর। তাদের ছাড়া আজকাল নাকি লোকই হয় না। অলকেশের মুগ্ধ শেষ।

পার্টের দিকেও তাই। রাজা উজীর থেকে নেমে নেমে বাড়ীর গোমস্তার ঠেকল। হু সিন পার্ট। কথাবার্তাও সেই অনুপাতে কম। অভিনেতার প্রায় সবাই নতুন। এদের হাবভাব দেখে সর্বদাই তটস্থ। দাছ বলে ডাকে বটে, কিন্তু ওই পর্যন্ত। মনে মনে বোধহয় অনুকম্পাই করে।

এর ওপর আর এক ঝামেলা, প্রথম কয়েক রাত্রি অভিনয়ের পরে খবরের কাগজে সমালোচনা বেরোল। কয়েকজনের নাম করে খুব প্রশংসা, নাট্যকারদের জয় জয়কার, কেবল অলকেশ আর হু একজনের নামে বক্রোক্তি। অলকেশ সম্বন্ধ বিশেষ করে লিখল, মরা হাতি লাখ টাকা হতে পারে, কিন্তু মরা মানুষের দাম এক কানা কড়িও নয়।

মাস দুই এই ভাবেই চলল। বাড়ীভাড়া বাকি, মূদীর দোকানে ধার, দুধ বন্ধ। ক্রমেই অবস্থা শোচনীয়। রীণার অভিযোগের সীমা নেই।

একদিন বিকেলে বাড়ীতে পা দিয়েই অলকেশ অবাক। বাইরের ঘরে মৃণালবাবু আর রীণা। অলকেশ হঠাৎ এসে পড়াতে হুজনেই যেন একটু বিভ্রত।

অলকেশ একটু ভয়ই পেল। বাড়ী বয়ে আবার কি বলতে এল অলকেশ। আরো কমবে মাইনে, গোমস্তার পার্ট থেকে চাকর বাকরের পার্ট দেবে তাই জানাতে এসেছে।

কিন্তু মৃণাল সে সব কিছু বলল না। হেসে দাঁড়িয়ে উঠে বলল, আশুন অলকেশবাবু, আপনার জগুই অপেক্ষা করছি।

কোণের দিকে লাঠিটা রাখতে রাখতে অলকেশ কাঁপা গলায় বলল, আমার জগু ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, দৈনিক বিচিত্রা আর প্রতাহ কাগজটা দেখেছেন ?

অলকেশ কোন কাগজ রাখে না। পড়শীরাই উপযুক্তক হস্রে দেখিয়ে গেছে। মুখরোচক খবর না দেখাতে পারলে তাদের ঘুমই হতো না।

অলকেশ আস্তে আস্তে ঘাড় নাড়ল।

—বড় মুস্থিলে পড়েছি। বাবা তো সাতভয়ে থিয়েটার দেখতে আসেন না। কিন্তু তাঁর চোখে খবরগুলো পড়েছে।

সামনে তরল অঙ্ককারের স্রোত। কোন রকমে হাতড়ে হাতড়ে অলকেশ তন্তোপোষের ওপর বসে পড়ল। এইবার বুঝি চরম সংবাদ শুনতে হবে।

—আমরা কদিন ধরে একটা কথা ভাবছিলাম।

—কোন উত্তর নয়। অলকেশ অর্থহীন দৃষ্টি মেলে চেয়ে রইল।

—মানে, একটু ইতস্ততঃ করল মৃণাল। একবার অন্দরের দিকে চেয়ে নিল। তারপর বলল, ইয়ে, মানে রীণাকে আমরা নামাতে চাই। শিথিয়ে পড়িয়ে নিতে পারলে মনে হয় ভালই হবে। চলনসই চেহারা আছে, গলাও মন্দ নয়। কি বলেন ? ওরও খুব ইচ্ছে।

অলকেশের মনে হল আস্তে আস্তে সরে যাচ্ছে পায়ে তলার মাটি। অতল গহ্বর। কারা যেন ঠেলে দু হাত দিয়ে নামিয়ে নিয়ে যাচ্ছে তাকে।

—কিন্তু রীণাকে তো আমি নামাব না এ দলে। কণ্ঠস্বর নয় কাতরোক্তি।

—এ ছাড়া আর উপায়ই বা কি আছে বাবা। লেখাপড়াও লেখাওনি যে মাষ্টারী করে তোমাদের সংসার চালাব। খরচ করে বিয়ে দেবে, এখন ওসব না ভাবাই ভাল। তোমার ঐ অল্প টাকায় তিনজনকে না খেয়ে মরতে হবে, এতদিনে এটুকু নিশ্চয় বুঝতে পারছ।

কিন্তু সে যে ভারি নোংরা জায়গা মা। অলকেশ শেষ চেষ্টা করল।

মানুষের অবস্থা যখন চরমে নামে তখন সে ডাষ্টবিন থেকেও খাবার সংগ্রহ করতে দ্বিধা করে না বাবা। বাছাবাছি ওপর তলার মানুষদের সঙ্গে। আমাদের নয়।

তাছাড়া নোংরা জায়গাই বা আপনি বলছেন কেন ! অলকেশ চিবিয়ে চিবিয়ে বলল। সব ভদ্রঘরের ছেলেমেয়েরা এ পথে নেমেছে। আগেকার দিন আর নেই।

হঠাৎ কথাটা শেষ করে অলকেশ ঘড়ির দিকে চাইল, আমার আবার সময় বেশী নেই। আপনার মতটা জেনে থিয়েটারে খবর দিতে হবে।

গ্রন্থ সমালোচনা

দিগন্তর দাশগুপ্ত

বিংশ শতাব্দীর চল্লিশ দশক থেকে এখনো পর্যন্ত বাদে লেখনী বাংলা সাহিত্যে হাশুরসের ধারাটিকে পুষ্ট করেছে এবং আজো প্রবাহমান রেখেছে, সরিৎ শেখর মজুমদার তাঁদের অগুণ্ডম বিশেষতঃ বাঙ্গ রসাত্মক রচনার ক্ষেত্রে তাঁর নাম অবশ্যই উল্লেখ্য। শ্রীমজুমদার মূলতঃ বাঙ্গ-প্রিয় লেখক হলেও তাঁর কলম সর্বমুখিনতার প্রোত্বে প্রান্তে এসেও সত্য সত্য ও সপ্রতিভ। তাঁর রচনার যেমন অফুরন্ত হাক্কি হাসির খোরাক আছে তেমনি আছে অবসর সময়ে পড়ার মতো এবং পড়ে ভাবার মতো গভীর এবং লঘু ; উপাদেয় এবং উপভোগ্য কবিতা-মালা। Infact উত্তরাধিকার সূত্রে (ম্যাগেল সূত্রানুযায়ী) পাওয়া এই হৃদয়দেহী হাশুরস অষ্টার হাশুরস বোধটি তাঁর সমগ্র প্রতিভার যে এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ সে কথার সাক্ষ্য বহন করে সম্প্রতি প্রকাশিত তাঁর রঙ্গ-বাস্তব কবিতা “আসলে নকলে” নামাঙ্কিত তাঁর অষ্টম কাব্য গ্রন্থখানি।

দুই পুস্তানির মধ্যে আবদ্ধ মোট একত্রিশখানি কবিতার শীর্ষভাগ ‘আসল’ অধ্যায়ে হলেও ‘নকলে’-র স্বল্পতা,—শিল্পগত সৌন্দর্যে সংখ্যাগত উন্নতির ক্ষতিপূরণ করতে সক্ষম ও সমর্থ হয়েছে। বিষয় বস্তুর অভিনবত্বে এবং ছন্দের মাধুর্যে ‘আসলের’ প্রতিটি কবিতাই উপভোগ্য। অপর অংশে অর্থাৎ ‘নকলে’ সম্মিলিত এক ডজন কবিতায় কবি পরের রচনার রূপটিকে অক্ষুণ্ন রেখে ভাবটিকে ভাসিয়ে দিয়েছেন এক নির্মল হাসির স্রোতে। ফলে সেগুলি নকলের নামে হয়ে উঠেছে সার্থক প্যারডি বা লালিকা যা বাংলা সাহিত্যে প্যারডির ভাণ্ডারে যোজন্য করেছে এক নূতন মাত্রা। এখানে প্যারডির কবি সরিৎ শেখর মূল কবিদের সুরে যে সব কবিতায় নিজের সুর সংযোজন করে প্যারডির পশরাটি সাজিয়েছেন তন্মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ্য ‘হে মোর চিত্ত পূণ্যার্থীর’ অনুসরণে ‘হে মোর চিত্ত ক্ষুন্নি বুকে জাগো রে ধীরে’—যেখানে রঙ্গ-র বদলে বাঙ্গ নামক বস্তুটিই প্রধান ও প্রকট হয়ে ধরা পড়েছে। তাঁর কবিতাকর ‘মেঘ বলেছে ঘাব ঘাব’-র অনুকরণে ‘পেট বলেছে ঘাব ঘাব’ এবং ‘দুই পাখী’-র প্যারডি মন্তুগুণে পরিণত “লাউ চিংড়ি” শব্দে ছন্দে ও সুরে রবীন্দ্রনাথের আশ্চর্য অনুগতি অথচ ভাবের সম্পূর্ণ পৃথক গতির বিচিত্র সমন্বয়ে সুন্দর রূপ-চিত্রণ করেছেন কবি। এবং তাসের দেশের সেই সুপরিচিত ‘ধরবাসু বায় বেগে’-র প্যারডি প্রকৃত ছান্দসিক ও সুর শিল্পীর পক্ষেই এমন অপক্লপ প্যারডি রচনা করা সম্ভব। ছন্দের নিখুঁত জ্ঞান প্যারডি রচনার একটি অপরিহার্য

শর্ত। তার অসম্মিত প্রমাণ মেলে যখন রবীন্দ্রনাথের 'হুই পাখী' সার্থক জীবন লাভ করে সরিৎ শেখরের প্যারিডি-খাঁচার বন্দী হয়ে।

জীবনানন্দের কবিতা সমূহের মধ্যে 'বনলতা সেনের' খ্যাতি সর্বোচ্চ। স্বাভাবিক ভাবেই বনলতা সেন একাধিক প্যারিডির জন্মদান করেছে। সরিৎ শেখর কৃত 'হ্যালোর মুখ আমি দেখিছাছি' মূল কবিতার কথাগুলি জানা থাকলে প্যারিডির পূর্ণরস অধিগম্য হবে এবং তা প্যারিডি রসিকদের কাছে অবশ্যই প্রশংসার দাবী রাখে। প্রমথ চৌধুরী বলেছিলেন যে প্যারিডি যদি কোনো দর্শন থাকে তবে তা 'দস্তুর দর্শন'। 'আসলে-নকলে'-র নকলগুলি পড়া কালে এ উক্তিটি বিশেষভাবে স্মরণীয়।

আসলে-নকলে : সরিৎ শেখর মজুমদার
মুদ্রপত্র পাবলিকেশন।
৩/২, চন্দ্রনাথ চ্যাটার্জী স্ট্রিট, কলিকাতা-২৫
মূল্য : দশ টাকা

বইমেলা শেষে

অমলন্দু ঘোষ

বইমেলা শেষ হলো আজ, নাকি
উড়ে গেল ছরস্তু এক ঝাঁক পাখী—
আবার আসবে তারা এখানেই,
আগামী শীতের এই মেলাতেই—
হাসি গানে তারা মাতাবে নিভুল,
প্রাণে প্রাণে মেলামেশি বিলকুল ॥

এখানে ছিল না কোনো জাতপাত,
মন্দির মসজিদ হুয়নি তো কাত—
রাম ও রহিম কিংবা মাইকেল,
কেউ তো কারো বুকে মারেনি শেল—
আমরা তো শিখতে পাই এখানেই,

আমাদের বিচিত্র এই সমাজেই—
সহজে কেমন করে বেঁচে থাকা যায়,
কারো পথ কিছুতে না আটকায় ॥

মন্দির মসজিদ এবং গির্জা,
কিংবা গুরুদ্বার, ধর্ম যার যা —
এসব তো স্রেফ ব্যক্তিগত বাপার,
এ বাপারে হস্তক্ষেপ অনাচার —
তাই, সহজে কেমন করে বাঁচা যায়,
কারো পথ কিছুতে না আটকায়—
আমরা তো শিখতে পাই এখানেই,
বিচিত্র বস্তুর এই বইমেলাতেই ॥

— নিয়মাবলী —

লেখকদের প্রতি

- ১। 'আভা'তে প্রকাশের জন্য সমস্ত রচনা নকল রেখে পাণ্ডুলিপি সম্পাদিকার ঠিকানায় পাঠাতে হবে।
- ২। অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য হস্তাক্ষরে উত্তম পৃষ্ঠায় লিখিত রচনা বিবেচনা করা সম্ভব নয়।
- ৩। বাংলা যাদের মাতৃভাষা নয় এমন লেখক বা লেখিকার রচনা প্রকাশের বিশেষ সন্যোগ দেওয়া হবে।
- ৪। জাতীয় সংহতির পরিপ্রেক্ষিতে রচিত যে কোন রচনাকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।
- ৫। নূতন লেখক-লেখিকার প্রকাশযোগ্য রচনা যথাসময়ে প্রকাশিত হবে।
- ৬। মিল ও ছন্দোবদ্ধ কবিতাকে সন্যোগ দেওয়া হবে।
- ৭। অমনোনীত রচনা ফেরৎ দেওয়া হয় না।
- ৮। উপযুক্ত ডাক টিকিট সঙ্গে না থাকলে কোন পত্রের উত্তর দেওয়া সম্ভব নয়।

গ্রাহকদের প্রতি

- ১। গ্রাহকদের এক বৎসরের চাঁদা সডাক ২১ টাকা। আজীবন গ্রাহক চাঁদা সডাক ১৫০ টাকা।
- ২। যে কোন মাস থেকে গ্রাহক হওয়া যায়।
- ৩। ভি. পিতে পত্রিকা পাঠানো সম্ভব নয়। গ্রাহকদের চাঁদা মনি অর্ডার যোগে 'আভা' কার্যালয়ে পাঠাতে হবে।

আভা পত্রিকা কর্তৃক প্রকাশিত বিশেষ বিশেষ সংখ্যা, গ্রন্থ-পঞ্জীসহ

ছাত্র-ছাত্রীদের ও বাংলা ভাষার গবেষকদের সহায়ক।

মূল্য টাকা

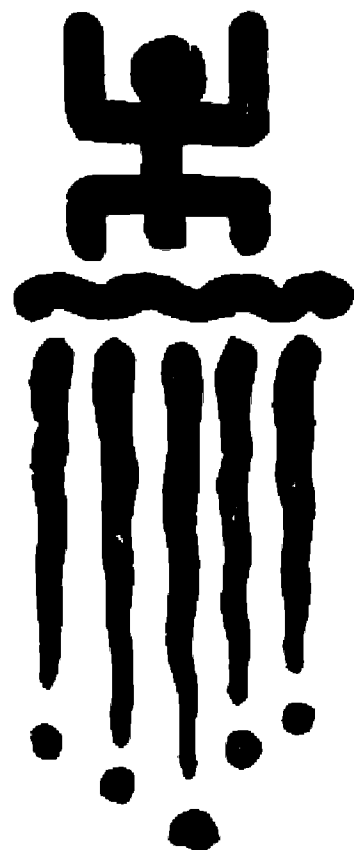
মূল্য টাকা

শরৎ শত-বার্ষিকী সংখ্যা (দ্বিতীয় পর্ব)		আচার্য রমেশচন্দ্র মজুমদার সংখ্যা	৪.৫০
ভাষাস্তরে শরৎ সাহিত্য সহ	৯.০০	প্রেমেন্দ্র মিত্র সংখ্যা	১২.০০
নজরুল স্মরণ সংখ্যা	৩.০০	হীরেন বসু সংখ্যা	৭.৫০
ডাঃ কালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত সংখ্যা	২.০০	আশাপূর্ণা দেবী সংখ্যা	১৫.০০
আচার্য সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় সংখ্যা	৭.৫০	শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব সংখ্যা (নিঃশেষিত)	৭.৫০
ভাষাবিদ হরিনাথ দে জন্ম শতবর্ষ সংখ্যা	৪.৫০	"শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব" সংখ্যা	১২.০০
তরু দত্ত স্মরণ সংখ্যা	৪.৫০	অজিত কৃষ্ণ বসু (অ. কৃ. ব.) সংখ্যা	১২.০০
কবি যতীন্দ্র মোহন বাগচী জন্ম শতবর্ষ সংখ্যা	৬.০০	শ্রীঅরবিন্দ সংখ্যা	৬.০০
বনকুল শ্রদ্ধার্ঘ্য সংখ্যা	৬.০০	শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী সংখ্যা	৯.০০

"দাদামশাই" কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সংখ্যা ১২.০০ টাকা

প্রাপ্তিস্থান : "আভা" কার্যালয়, ৭৩সি, শরৎ বসু রোড, কলিকাতা-৭০০ ০২৬

শারদীয়ার প্রীতি ও শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন :—



সংগীত জগতের ঐশ্বর্য্যে ও সমৃদ্ধি ভরিয়া তোলার জন্য কে. কে. রেকর্ডস্
উপস্থাপিত করতে চলেছে ভিন্ন স্বাদের ক্যাসেট সম্ভার—

- | | |
|------------------|-----------------|
| ● উষা উথুগ | ● মিস্ ববি |
| ● কুমার শানু | ● মিস্ ববি |
| ● নির্মালা মিশ্র | ● ইন্দ্রাণী জেন |

কে. কে. রেকর্ডস্

১৫, বীরেন রায় রোড (ইষ্ট), কলিকাতা-৭০০ ০০৮

ফোন : ৪৭৮-৮০৩৬



মূল্য ১২'০০ টাকা
Price Rs. 12'00

শারদীয়া

আভা—ABHA

Regd No. WB/SC 73
R. N. 18638/72

সং-আখিন—১৪০১

July-August-September—1994

With best compliments from :



MUKHERJEE & ALLIANCES (I) PVT. LTD.

JABAKUSUM HOUSE

34, CHITTARANJAN AVENUE, 2nd FLOOR

CALCUTTA-700 012

Phone : 27-3123

ALL SORTS OF CARGO

CLEARING FORWARDING AGENT (Customs House)

&

CONSULTANT CIVIL ENGINEERS.

প্রকাশক :—শ্রীমতী রেখা চট্টোপাধ্যায়, ৭৩সি, শরৎ বসু রোড, কলিকাতা-২৬।

মুদ্রক :—কৃষ্ণ আর্ট প্রেস, ৩১, শ্রীমন্তোষ মুখার্জী রোড, কলিকাতা-৭০০০১০।

ফেরৎ পাঠাতে হলে প্রকাশকের ঠিকানায় পাঠাবেন।